বিষপাথর

রূপক সাহা

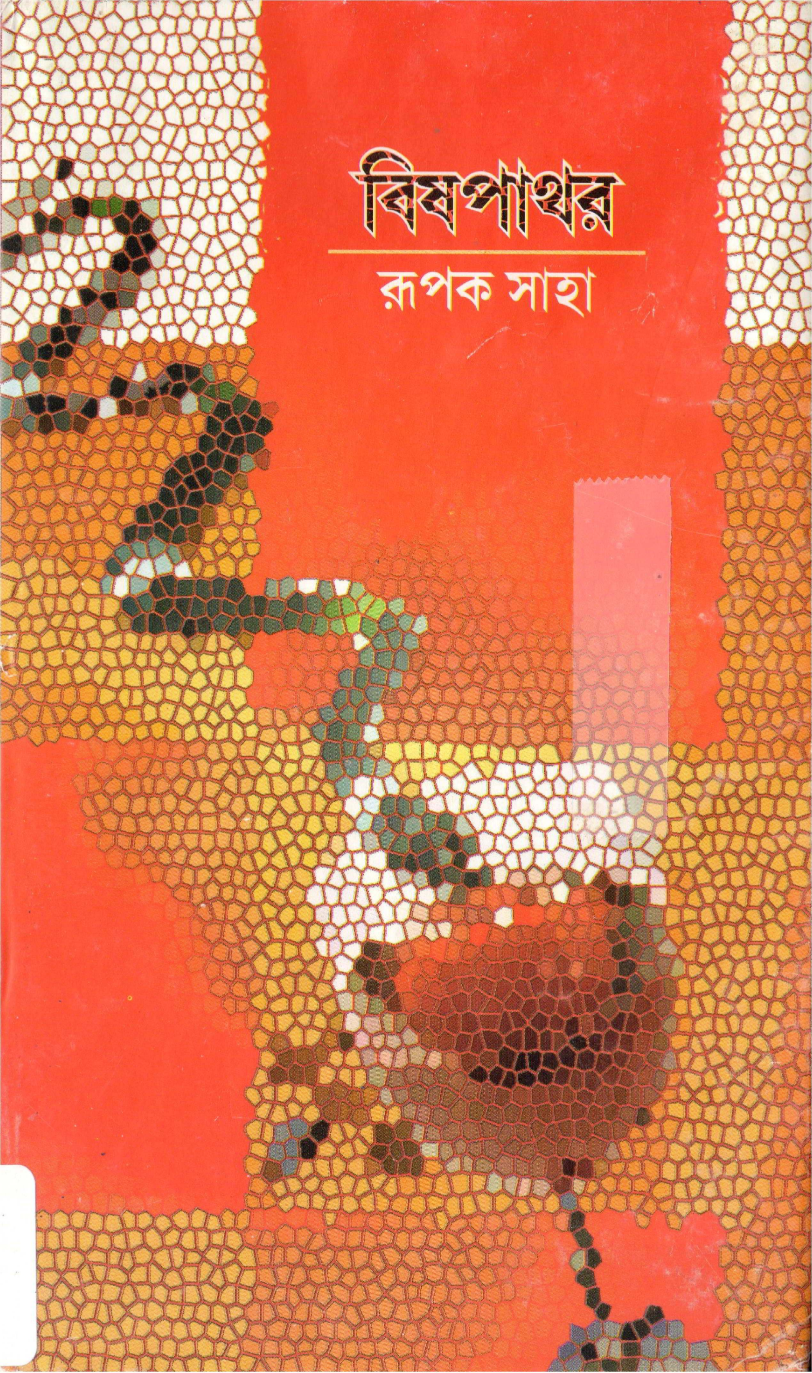

এক

দোকানে ঢুকতেই বাবা ডাকল, 'টুম্পাই, এ দিকে এক বার আয় তো।'

গলার স্বর শুনেই বুঝলাম, ভয়ের কিছু নেই। বাবা দাঁড়িয়ে আছে স্টোন সেকশনে শো-কেসের উল্টো দিকে। সামনে এক ভদ্রলোক। বোধহয় কিছু কিনতে এসেছে। স্টোন সেকশনে কাজ করে সুভদ্রা, অবন্তী আর রিমিতা বলে তিনটে মেয়ে।

এদের ইনচার্জ বিষ্ণুকাকা। সুভদ্রার হাতে আধখোলা একটা কাঠের শৌখিন বাক্স। কোনও কাস্টমার কিছু কিনতে এলে ওই বাক্স থেকেই স্টোন বের করে তাঁকে দেখানো হয়। ভদ্রলোক সম্ভবত বাবার খুবই পরিচিত। না হলে নিজের মেজেনাইন ফ্লোরের অফিস থেকে বাবা নীচে নেমে আসত না।

ঘণ্টা দুয়েক ক্যারাটে প্র্যাক্টিস করে আমি সবে জোড়াবাগান থেকে ফিরেছি। সারা গা ঘেমেনেয়ে একসা। অন্য দিন প্র্যাক্টিসের পর ক্লাবেই স্নান-টান সেরে একেবারে ফ্রেশ হয়ে তার পর দোকানে ঢুকি। কিন্তু আজ বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বউদি এমন একটা কাজ ধরিয়ে দিল, না করতে পারলাম না। সেই কাজ সেরে জোড়াবাগানে গেছি। বউদির জন্য এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রায় সাতটা। এত দেরিতে দোকানে ঢোকা বাবার চোখে অপরাধ। বাবা অবশ্য দোকান বললে চটে যায়। বলে শো-রুম। সব সময়ে সেটা মনে থাকে না।

বাবার ডাকে শো-কেসের সামনে দাঁড়াতেই চোখ গেল বিষ্ণুকাকার দিকে। বিষ্ণুকাকা আমার ঠাকুর্দার আমলের লোক। খুব বিশ্বস্ত। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমার ঠাকুর্দা গোরাচাঁদ দত্ত যখন জুয়েলারি ব্যবসা শুরু করেন, বিষ্ণুকাকা সেই তখন থেকে আমাদের এই দোকানে। ঠাকুর্দার দত্ত জুয়েলার্স এখন কলকাতার সেরা পাঁচ জুয়েলারি দোকানের একটা। দত্ত জুয়েলার্সের তিন তিনটে ব্রাঞ্চ। দুটো নর্থ ক্যালকাটায়— এই বিবেকানন্দ রোড আর বিধান সরণিতে। আর একটা গড়িয়াহাটার মোড়ে। বিষ্ণুকাকা আমাকে খুব ভালবাসে। আমার উপর বাবা যখন খুব চোটপাট করে, তখন এই বিষ্ণুকাকাই সামলায়।

বিষ্ণুকাকার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পারি, বাবার মেজাজ কেমন আছে। এই যেমন বুঝলাম, উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। বাবা বেশ ভাল মেজাজেই। অন্য দিন দেরি হলে বাবা আমাকে দেখেই প্রথমে বলে, 'তোর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, টুম্পাই?' শুরু করে এই ভাবে, কিন্তু তার পর বক্তব্যটা গিয়ে যা দাঁড়ায়, তাতে মনে হয়, আমার মতো অপদার্থ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আমার রিকশা টানা অথবা

নতুন বাজারে গিয়ে ঝাঁকামুটের কাজ করা উচিত। বারো-তেরোজন কর্মচারীর সামনে বাবা যাচ্ছেতাই কথা শোনায়। ফলে আমার কোনও প্রেস্টিজ নেই। মালিকের ছেলে বলে কেউ আমায় মানে না। ব্যতিক্রম শুধু বিষ্ণুকাকা। ওই লোকটার জন্যই এখনও আমি রোজ দোকানে আসি।

ভদ্রলোককে বাবা নীলা দেখাচ্ছে। রক্তমুখী নীলা। শো-কেসের আলোয় বেগুনি আভা ফুটে বেরচ্ছে। নীলার খুব দাম। বাবার হাতে যে টুকরোটা ধরা আছে, সেটা শ্রীলঙ্কান নীলা। এক এক ক্যারাট পঁচিশ হাজার টাকা। বাবা সেই টুকরোটাই গছানোর চেষ্টা করছে ভদ্রলোককে। চোখাচোখি হতেই আমায় বলল, 'টুম্পাই, বাবা দ্যাখ তো, এই স্টোনটার একজ্যাক্ট ওজন কত হবে?' বলেই পাথরটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, সেটা বাবাও জানে— যে কোনও স্টোন হাতে নিয়েই আমি বলে দিতে পারি, সঠিক ওজন কত। কোথাকার স্টোন—আসল না নকল। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমি নিয়মিত দোকানে আসি। তখন থেকেই স্টোন ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার অভ্যেস। ঠাকুর্দা আমায় এই স্বাধীনতাটুকু দিয়েছিল। আমার মধ্যে তাই এই ক্ষমতাটা এসে গেছে। ওজন এক সেন্টও কম-বেশি হবে না। বাবার কাছ থেকে নীলার টুকরোটা নিয়ে হাতের তালুতে রেখে, ওজন আন্দাজ করে আমি বললাম, 'দশ ক্যারাট, তিন সেন্ট।'

বাবা বলল, 'ঠিক বলছিস তো? গিরিজাবাবুর কিন্তু দরকার ঠিক দশ ক্যারাট।'

আমি নিশ্চিত। বললাম, 'মেপে দেখে নাও না!'

ভদ্রলোক আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। আমি হাসলাম। আমাকে হাসতেই হবে। বাবার ট্রেনিং। দোকানে কাস্টমারদের সঙ্গে সব সময় হেসে কথা বলতে হবে। একটুও বিরক্ত হলে চলবে না। আমাদের কারবার হিরে-চুনি-পান্না-জহরত নিয়ে। যাঁরা কিনতে আসেন, তাঁরা বেশ উচ্চবিত্ত। তাঁরা যেন কোনও কারণেই ক্ষুণ্ন না হন। দোকানের সব কর্মচারীর ওপরেই বাবার কড়া নির্দেশ। কাস্টমার নতুন হলে তো কথাই নেই। তাঁর জন্য আরও খাতির।

আমাদের এই দোকানে যাঁরা আসেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই আমি চিনি। কিন্তু বাবা যাঁকে গিরিজাবাবু বলে উল্লেখ করল, তাঁকে আগে কখনও আমি দেখিনি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সৌম্যকান্তি। উজ্জ্বল গায়ের রঙ। পরনে ফিনফিনে চুনোট করা ধুতি আর হাফহাতা পাঞ্জাবি। গলায় দুটো ছোট বড় সোনার চেন। গিরিজাবাবুর ডান হাতের মধ্যমায় হিরের আংটি। বেশ জ্বলজ্বল করছে। এক পলক তাকিয়েই বুঝে গেলাম, দু'ক্যারাটের। দাম দু'লাখ টাকার মতো হবে। এত দামের আংটি যাঁর হাতে,

PATHAGAR

তিনি অবশ্যই খুব ধনী। বোধহয় এই নর্থ ক্যালকাটারই কোনও বনেদি পরিবারের হবেন। এঁরা কেউ একা আসেন না। ভদ্রলোককে একা দেখে তাই একটু অবাকই লাগল।

অবন্তী স্টোন মাপার মেটলার মেশিন এনে দিয়েছে। প্রায় লাখ টাকা দাম। কাচের বাক্সে ঢাকা। সামান্য বাতাসেও যাতে ওজনের তারতম্য না ঘটে, তার জন্যই কাচের ঘেরাটোপ। বাবা রক্তমুখী নীলার টুকরোটা মেটলার মেশিনে তুলে দিতেই মনে মনে হাসলাম। ডিজিটাল নম্বর ফুটে উঠল। ঠিক দশ ক্যারাট, তিন সেন্ট। সেটা দেখে বাবা আমাকে বলল, 'তুই ঠিক বলেছিস রে, টুম্পাই। তোর আন্দাজই ঠিক।'

ঠিক হতেই হবে। একটা সময় চ্যালেঞ্জ করে দাদাকে আমি হারিয়ে দিতাম। দোকানে বসে ঠাকুর্দা তখন মিটিমিটি হাসত। হেরে গেলেও দাদা কখনও রাগ করত না। উল্টে শর্মার দোকান থেকে রাবড়ি এনে আমাকে খাওয়াত। দাদা এখন গড়িয়াহাটের দোকানে বসে। স্টোন নিয়ে কোনও সমস্যায় পড়লে ফোনে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। দাদা কিন্তু সব্বাইকে বলে আমার এই ক্ষমতাটার কথা। আরও বলে, মন দিয়ে ব্যবসাটা করলে না কি আমি এক নম্বর জহুরি হতে পারতাম। বাবাও কথাটা মনেমনে জানে। কিন্তু কখনও প্রকাশ্যে বলে না। শুধু আজই দেখলাম গিরিজাবাবুর সামনে আমার গুণপনা দেখাল। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। সেই কারণটা কী, সেটা আপাতত বুঝতে পারছি না।

এই সব ভাবার মধ্যেই, বাবা গিরিজাবাবুকে বলল, 'দাদা, এ আমার কনিষ্ঠ পুত্র কুন্তল। আমাদের এই শো-রুম এ-ই দেখাশুনো করে।'

শুনেই আমি চমকে উঠলাম। মাই গড! বাবার হলটা কী? আমার সর্ম্পকে এত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে? একে তো কোনও দিন বাবা-বাছা বলে না। তার ওপর মিছে কথা? এই দোকান আমি মোটেই দেখাশুনো করি না। এই দোকান চালায় বাবা নিজে। বাবাই সব। আমার স্টেটাস ওই সুভদ্রা, অবন্তীদের থেকেও নীচে। ওরা সারা মাস কাজ করার জন্য মাইনে পায়। আমার কপালে তাও জোটে না। বাবা মনে করে দোকান চালানোর পিছনে আমার কোনও অবদান নেই। আমি হাতখরচ পাওয়ারও যোগ্য নই। ভাগ্য ভাল, আমার বউদি খুব দরাজ। টাকা পয়সার দরকার হলে আমি বউদির কাছে হাত পেতে দাঁড়াই। না হলে জোড়াবাগানে ক্যারাটে ক্লাব আমি চালাতে পারতাম না।

বাবার কথাটা শুনে তাই বেশ অবাক হয়েই বিষ্ণুকাকার দিকে তাকালাম। বাবার সামনে বেশি কথা বলার উপায় নেই। বিষ্ণুকাকার সঙ্গে আমার একটা অন্য রকম বোঝাপড়া আছে। চোখে চোখে কথা বলা। আমার হিটলার টাইপের বাবার সামনে কখন কী করতে হবে, সেটা বিষ্ণুকাকাই চোখের ইশারায় আমাকে বলে দেয়।

এই যেমন এখনই কী যেন বলল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। চোখে চোখে ফের প্রশ্নটা করতেই বুঝলাম, গিরিজাবাবুকে প্রণাম করতে বলছে। কথাটা মাথায় ঢোকা মাত্র আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। টিপ করে প্রণামটা সেরে ফেললাম। বিষ্ণুকাকা নিশ্চয়ই ভদ্রলোককে চেনে। এবং এই মুহূর্তে ওঁকে প্রণামটা করলে যে বাবা খুশি হবে, সেটা জানে।

গিরিজাবাবু আর্শীবাদ করে বললেন, 'থাক, বাবা থাক।'

বাবা বলল 'থাকবে কেন, দাদা? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। আপনার আশীর্বাদ ওর দরকার।'

গিরিজাবাবু খুব প্রসন্ন গলায় বললেন, 'আজকাল ও সব কেউ মানে না। তা বাবা, পড়াশুনো কদ্দুর এগোল?'

প্রশ্নটা করলেন আমাকে। কিন্তু আমি উত্তর দেবার আগেই বাবা বলল, 'এই তো গ্র্যাজুয়েট হল। ফিজিক্সে অনার্স। আরও পড়ার ইচ্ছে ছিল। আমিই মানা করলাম। ব্যবসা আর পড়াশুনো—দুটো একসঙ্গে চলে না। আমার বয়স হয়ে গেছে। এ বার রিটায়ার করতে চাই। ছেলেদের হাতে ব্যবসা তুলে দিয়ে, ভাবছি এ বার বেন্দাবন চলে যাব।'

বেন্দাবন! বাবার মুখে নর্থ ক্যালকাটার টান! তাজ্জব ব্যাপার। কথাবার্তায় বাবা খুব মার্জিত। কখনও করলুম-গেলুম, নেবু-নঙ্কা বলে না। মা কখনও বলে ফেললে বাবা ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। আমার সেই বাবার মুখে 'বেন্দাবন'? ভাবাই যায় না। বৃন্দাবনে অবশ্য আমাদের একটা বিরাট বাড়ি আছে। দাদুর আমলে কেনা। ওখানে আমাদের গৃহদেবতা রাধেশ্যাম জিউর মন্দিরও আছে। সম্বৎসর সেখানে পুজোআচ্চা হয়। বাবার এক দূর সর্ম্পকের পিসিমা সেখানে থাকেন। আমার সেই ঠাক্‌মা ফি বছর দুগ্গা পুজোর সময় আসেন কলকাতায়।

এই কদিন আগেই বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় এসেছিল ব্রজবিহারী পাণ্ডা। আমি নিজের কানে শুনেছি, বাবা তাকে বলছে, 'ভাল একটা খদ্দের দেখুন তো আপনি। বৃন্দাবনের বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চাই।' বৃন্দাবনে সম্পত্তি রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই বাবার । তা সত্ত্বেও এখন বলছে, 'রিটায়ার করে বেন্দাবন চলে যাবে।' গিরিজাবাবুর সামনে বাবার কথাবার্তা, হাবভাব আজ হঠাৎই বদলে গেছে। ভদ্রলোক কে, তা জানার জন্য প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে।

আমার সেই ঠাক্‌মার কথা ভেবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। হঠাৎ কানে এল, বাবা বলছে, 'এই টুম্পাই, দাদাকে আমার ঘরে নিয়ে যা। আমি বউঠানকে নিয়ে আসছি।'

কে বউঠান, তিনি এখন কোথায়। তা জানার অধিকার আমার নেই। পালটা

প্রশ্ন বাবা একদম পছন্দ করে না। করলে মান-সম্মান আর রাখবে না। কড়া চোখে তাকিয়ে থাকবে, অথবা ধমকে উঠবে। তার চেয়ে যা করতে বলল, তাই করা ভাল। গিরিজাবাবুকে তাই বললাম, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

মেজেনাইন ফ্লোরে বাবার ঘরে যাওয়ার জন্য একটা কাঠের সিঁড়ি আছে। কয়েকটা ধাপ উঠতে হয়। গিরিজাবাবুকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসালাম। আমাদের শো-রুম প্রায় সাড়ে তিন হাজার স্কোয়্যার ফিটের। পুরোটাই এয়ার কন্ডিসন্ড। খুব সুন্দর সাজানো গোছানো। শুধু আমার বসার জায়গাটাই সব থেকে খারাপ। কাঠের সিঁড়ির নীচে এক ফালি জায়গায় ছোট্ট টেবিল আর একটা চেয়ার। বাবা ইচ্ছে করেই ওই জায়গাটা আমায় দিয়েছে। যাতে উঠতে নামতে আমাকে সর্বদা চোখে পড়ে। দোকানে ঢোকার মুখে বন্দুক হাতে দু'জন গার্ড বসে থাকে। একজনের নাম রামাদীন, অন্যজনের নাম কৈলাস। তাদের বসার ব্যবস্থাও আমার থেকে ভাল।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গিরিজাবাবু বললেন, 'তোমার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আজ অবাক হলুম, বাবা। হাতে নিয়েই নীলার ওজন বলে দিলে ! কারও কাছে ও গপ্প করলে তো বিশ্বেসও করতে চাইবে না!'

বললাম, 'ও কিচ্ছু না। অভ্যেস হয়ে গেছে।'

—এটা অভ্যেসের জন্য হয় না বাবা। এ প্রতিভা। শুনেছি তোমার ঠাকুর্দাও পারতেন।

—আমার ঠাকুর্দাকে আপনি চিনতেন?

—চিনব না? আমারা হলুম গে পোস্তার রায় ফ্যামিলি। তোমার ঠাকুর্দা মশাই....মানে গোরাচাঁদ বাবু মশায় আমাদের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। আমার বাবার সঙ্গে দাবা খেলতেন। একটা সময় খুবই সম্পক্ক ছিল। তোমার বাবার সাথে আমার এক বোনের বিয়েও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু দর্জিপাড়ার নগেনবাবু তাঁর মেয়েকে গছানোর জন্যে কী যে প্যাঁচ মারলেন, আমার বোনের সাথে সে বিয়ে আর হল না।

নগেনবাবু মানে নগেন্দ্রপ্রসাদ শীল। আমার মায়ের বাবা। মা-কে গছানোর জন্য দাদু কেন প্যাঁচ মেরেছিলেন, আমার বোধগম্য হল না। মা দাদুর একমাত্র সন্তান। দাদুর মৃত্যুর পর ও দিককার সব সম্পত্তি মা-ই পেয়েছে। কিন্তু সেই সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে আমার দাদু মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বলে আমার মনে হয় না। বেনে বংশের অনেক পাঁচালি। ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। গিরিজাবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে কথা ঘোরালাম।

—রক্তমুখী নীলাটা কি আপনার জন্য কিনছেন?

—হ্যাঁ বাবা। তোমাদের অ্যাস্ট্রোলজার মানে তো বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী ! আমি যাকে জ্যোতিষী বলেই মানি না। ঠাকুর্দার আমলে আমাদের এই দোকানে বসতেন

নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য। জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল ভদ্রলোকের। দত্ত জুয়েলার্সের রমরমার পিছনে আমার তো মনে হয়, ওঁর অবদানই সব থেকে বেশি। ওঁর কাছে আমিও প্রচুর শিখেছি। বিকেল চারটের সময় এই দোকানে এসে বসতেন। কাস্টমারদের লাইন পড়ে যেত। ঠিক আটটার সময় উনি উঠে পড়তেন। নকুলেশ্বর বাবু ছিলেন কালীসাধক। শক্তিসাধনা করার ফলে আলাদা একটা ক্ষমতা পেয়েছিলেন বলে আমার মনে হত। কোষ্ঠীবিচার করার সময়ে উনি দরদর করে ঘামতেন। চোখ বন্ধ করে বসে থাকতেন কিছু ক্ষণ। তার পর যাকে যা বলতেন, সব মিলে যেত।

নকুলেশ্বর বাবু মারা যাওয়ার পর বাবা বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। এই ভদ্রলোক মাঝেমাঝে ভুলভাল গণনা করেন। আরও খারাপ, শাস্ত্রীজির একটাই উদ্দেশ্য—দোকানের স্টোন কোনও রকমে কাস্টমারদের গছিয়ে দেওয়া। যা আমার একেবারেই পছন্দ না। বেশ কয়েক বার এ নিয়ে আমার সঙ্গে ওঁর তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। উনি আমার সম্পর্কে কমপ্লেন করেছেন বাবার কাছে। কাস্টমারদের ভাল করতে গিয়ে আমি মাঝখান থেকে ঝাড় খেয়েছি বাবার কাছে।

মাঝেমাঝে প্রচণ্ড রাগ হয়ে যায় শাস্ত্রীজির ওপর। এ তো পরিষ্কার চিটিং। লোক ঠকানো। সেই সঙ্গে কাস্টমারকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। ভুল রত্ন ধারণ করলে কাস্টমারের ক্ষতি হতে পারে। দু'চারজনের হয়েওছে। আমার কিছু করার নেই। বাবার অন্ধবিশ্বাস শাস্ত্রীজির ওপর। নড়ানো যাবে না। বাবা যেদিন নিজে বিপদে পড়বে, সে দিন বুঝবে। দত্ত জুয়েলার্সের গুডউইল সে দিন শূন্যে নেমে আসবে।

এই যেমন গিরিজাবাবুকে শাস্ত্রীজি রক্তমুখী নীলা ধারণ করতে বলেছেন। মারাত্মক ভুল। ভদ্রলোক চন্দ্রের জাতক। চেহারা দেখেই সেটা আন্দাজ করছি। কর্কট রাশি। রক্তমুখী নীলা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকারক। ভদ্রলোক দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে পারেন। মোট কথা, জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে, যদি নীলাটা পরেন। জেনেশুনেও ওঁকে আমি সাবধান করতে পারব না। কানে গেলে, বাবা ফের আমার ওপর চোটপাট করবে। রক্তমুখী এই নীলাটার দাম প্রায় আড়াই লাখ টাকা। গিরিজাবাবুর জীবনের মূল্য তার থেকে অনেক কম বাবার কাছে।

এই সব ক্ষেত্রে আমি বিবেকের তাড়নায় ভুগি। কেবলই মনে হয়, লোকটাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। আজও হয়তো কিছু বলে ফেলতাম। কিন্তু তার আগেই বাবা এসে পড়ল। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা আর আমার থেকে দু'তিন বছরের ছোট একটা মেয়ে। স্পষ্ট দেখলাম, মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে এক বার মুচকি হাসল। কয়েক সেকেন্ড যেন আমাকে জরিপ করে নিল। বাবার সামনে কোনও মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবই না। তাই চোখ ফেরালাম ভদ্রমহিলার দিকে।

হাতে লাল রঙের ছোট একটা প্যাকেট। তার মানে উনি কোনও সোনার গয়না কিনেছেন। গিরিজাবাবু তাহলে একা আসেননি। উনি যখন নীলা দেখায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে আমাদের অর্নামেন্ট সেকশনে।

চেয়ারে বসেই বাবা হুকুম করল, 'এদের জন্য ঠান্ডার ব্যবস্থা করো।'

শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উফ্, এ বার বাইরে বেরনো যাবে। আমাদের দোকানে কাস্টমারদের ঠান্ডা সরবত খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। ঠাকুর্দার আমলে দেওয়া হত ডাবের জল আর কড়াপাকের সন্দেশ। বাবা মালিক হওয়ার পর আতিথেয়তার ধরন বদলেছে। আমাদের দোকানের বাইরে একটা গাড়িবারান্দা আছে। তার পাশে পাঁড়েজি বলে একজন সরবতের একটা দোকান দিয়েছে। মাসকাবারি ব্যবস্থা। দিনে প্রায় দুশো-আড়াইশো গ্লাস শরবত লাগে আমাদের। চিরকুট পেলে পাঁড়েজি পাঠিয়ে দেয়। চার গ্লাস অর্ডার দিয়ে আমি গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে বেরোলেই আয়েস করে আমি একটা সিগারেট ধরাই। এই অভ্যেসটা আগে ছিল না। ধরিয়েছে ক্লাবের কোচ বিতান। দিনে চারটে করে সিগারেট আমি খাই। চারবেলায় চারটে। শেষ সিগারেট এই ডিনার করার পর, বাড়ির ছাদে লুকিয়ে। লুকিয়ে কথাটা বললাম বটে, কিন্তু একজন সেটা জানে। আমার বউদি। এক দিন ধরা পড়ে গেছিলাম। সে দিন থেকে বউদি ব্ল্যাকমেল শুরু করেছে। কোনও কাজ করতে বললে সেটা যদি না করি, তা হলে না কি বাবাকে সব বলে দেবে।

আমার ধূমপান অবশ্য দোকানের কারও চোখে পড়েনি। কেন না সিগারেট খাওয়ার সময় আমি খুব সতর্ক থাকি। গাড়িবারান্দার আড়ালে চলে যাই। আজও আড়ালে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছি। বাবাকে বিশ্বাস নেই। গিরিজাবাবু না কে, তাঁকে গুডবাই জানানোর জন্য ফুটপাথ অবধি নেমে আসতেও পারে। কয়েক টান মারার ফাঁকেই হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল। উল্টো দিকের রাস্তায় পর পর তিনটে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। ভেতরে বেশ কয়েকটা ছেলে। ভাড়া দিয়ে নেমে যাবার কোনও উদ্যোগই নেই। উল্টে দেখলাম, আমাদেরই দোকানের দিকে তাকিয়ে ওরা যেন কী বলাবলি করছে।

দিন কয়েক আগে মেনকা সিনেমার সামনে সেনকো জুয়েলার্সে ডাকাতি হয়েছিল। কেন জানি না হঠাৎ সেই ডাকাতির কথা মনে পড়ে গেল। ওদের ওখানেও ডাকাতরা এসেছিল তিনটে ট্যাক্সি করে। সিগারেট টানতে টানতেই ট্যাক্সিগুলোর দিকে নজর রাখলাম। প্রথম ট্যাক্সির চারটে ছেলে বেরিয়ে এসেই পজিশন নিচ্ছে রাস্তায়। সেই ট্যাক্সি সামান্য এগিয়ে টার্ন নিয়ে আমাদের দোকানের কাছেই এসে দাঁড়াল। মাঝের ট্যাক্সির তিনটে ছেলে মুখ ঢাকার জন্য মাঙ্কি ক্যাপ গলিয়ে নিয়েছে। সঙ্গেসঙ্গে

ওদের ইচ্ছেটা ধরে ফেললাম আমি। উদ্দেশ্যটা খুব খারাপ। ভাবতেই সারা শরীরে স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল। সর্বনাশ। আর একদম সময় নেই। এক্ষুনি দোকানে ঢুকে রামাদীন আর কৈলাসকে অ্যালার্ট করতে হবে।

আধখাওয়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমি প্রায় লাফিয়েই দোকানের ভিতর এসে ঢুকলাম।

দুই

চোখ খুলে প্রথমে বুঝতেই পারলাম না, আমি কোথায়? দৃষ্টি ঝাপসা। কয়েক সেকেন্ড পর কুয়াশাটা আস্তে আস্তে সরল। তখনই আমি দেখতে পেলাম টোটা-কে। আমার পায়ের সামনে দাঁড়িয়ে। টোটা আমার বন্ধু। খুবই ঘনিষ্ঠ, একেবারে স্কুলের সময় থেকে। আমরা দুজনে তখন সিকদার পাড়ার সিটি জুবিলি স্কুলে পড়তাম।

ওর সঙ্গে আজই আমার যাওয়ার কথা ছিল সিকদার পাড়ায়। তপন সিংহদের বাড়িতে । ধ্যান করার জন্য। কাল বিকেলে টোটা বলেছিল, ধ্যান করলে না কি মনে প্রশান্তি আসে। আজ তপন আর আমাকে ওর ধ্যান শেখানোর কথা ছিল।

চোখের পাতা ভারী লাগছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি না ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঘুম থেকে ওঠার পর রোজ খুব তরতাজা লাগে নিজেকে। সে রকম লাগছে না। উল্টে সারা শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। উঠে বসার চেষ্টা করতেই মাথার ডান দিকটা কেমন চিনচিন করে উঠল। সঙ্গেসঙ্গে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, 'শুয়ে থাক বাবা, এখন উঠতে হবে না।'

ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়ল মাকে। চোখ ফোলা ফোলা। একটু আগে মা কাঁদছিল না কি? এমনিতেই মায়ের একটু কান্নাবিলাস আছে। সামান্য কারণেই কেঁদে ফেলে। বাবা মেজাজ দেখালে কাঁদে। না দেখালেও কাঁদে। তখন বলে—তোর বাবার হল কী বল তো? গুম হয়ে আছে, কথা কইছে না। বাবা হয়তো বিজনেসের কথা ভাবছে। মা সে সব ভাববেও না। মায়ের অবশ্য কোনও দোষ নেই। আমার বাবার মতো হাজবেন্ড যার, হাসিমুখে থাকা তার পক্ষে সম্ভবই না। যাক সে কথা।

দু'হাত তুলে মা কপালে ঠেকাল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল! কেন শরীরটা ভাল লাগছে না, কেনই বা শুয়ে আছি আমি—কিছুই বুঝতে পারছি না। সামনে তাকিয়ে দেখলাম, টোটা মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে। দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করা। চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও কোনও কথা বলল না। খুব সিরিয়াস হয়ে গেলে টোটা স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইল নেয়। আমি অবশ্য জানি, কেন নেয়। ওর একমাত্র আর্দশ পুরুষ, স্বামীজি। ওর ইচ্ছে, জীবনটা স্বামীজির পথ অনুসরণ করেই কাটাবে।

শুয়ে শুয়েই বললাম, 'তপন সিঙ্গিদের বাড়িতে যাবি না?'

ঘাড় নেড়ে টোটা জানাল, না। মুখে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ থাকতে বলল। আর তখনই ডান পাশে আমি দেখতে পেলাম ওর বোন লালিকে। দেখেই আমি চমকে উঠলাম। অবাক কাণ্ড! দু'দিন আগে লালি আমাকে বলেই দিয়েছিল, আর কোনও দিন আমাদের এই দত্তভিলায় পা দেবে না। আমার মতো 'সত্যবাদী যুধিষ্ঠির'কে ওর কোনও প্রয়োজন নেই। সে দিন ওর একটা মিথ্যে কথা আমি ধরে ফেলেছিলাম। হাতেনাতে প্রমাণও দিয়েছিলাম টোটাকে। কিন্তু টোটা বলল, মাফ করে দে। বোনের কথা আর কোনও দিন বিশ্বাস করিস না। টোটা বলল বলেই আমি লালিকে মাফ করে দিয়েছি। মেয়েরা একটু-আধটু মিথ্যে বলেই। কিন্তু লালি এ ব্যাপারে ডক্টরেট। ওর কী এমন দরকার পড়ল এখন এ বাড়িতে? ওর মুখচোখই বা এত ফোলা ফোলা কেন? বাড়ির সবাই আজ কান্নার কম্পিটিশনে নেমেছিল না কি?

লালিকে অবশ্য আজ দারুণ লাগছে। ড্রেস করেছে এম টিভি মার্কা। ইদানীং সাজগোজের দিকে খুব নজর দিচ্ছে। রামজয় শীল স্কুলে যখন পড়ত, তখন স্রেফ মল্লিকবাড়ির মেয়ে বলে মনে হত। মাথা নিচু করে স্কুলে যেত। টোটার বন্ধুদের...মানে আমদের সামনে কদাচিৎ আসত। কিন্তু বেথুন কলেজে ঢোকার পর থেকেই মেয়েটা একেবারে বদলে গেল। না কি টোটার বাবা মারা যাওয়ার পর? আমি সিওর না। আসলে বছর দুয়েক আগে সুয়োদুয়ো পুজোয় ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে, লালিকে আমার খুব ভাল লেগে যায়। তার আগে ওকে তেমন লক্ষই করিনি।

বেশ শীতশীত করছে। চোখ বুজতে যাব, এমন সময় বাবার গলা শুনতে পেলাম, 'জ্ঞান ফিরেছে?'

টোটা বলল, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু, এইমাত্র। আমাকে চিনতে পারল।'

বাবা বলল, 'তা হলে ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার সাহা তো নার্সিং হোমে দিতে বলছিল। দিলে একগাদা খরচা হয়ে যেত। ওকে বাড়ি নিয়ে আসার ডিসিশনটা তা হলে ঠিকই নিয়েছি। কী বলো, টোটা?'

—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—এখানে আনার পর টুম্পাই বমি-টমি করেনি তো?

—না, তেমন টেনডেন্সি তো দেখিনি।

—গুড। যাই তাহলে ডাক্তারবাবুকে এক বার ফোন করে আসি। মাথায় সেলাই হওয়ার সময় তো ভালমতোই কথা কইছিল। অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় দেখি নির্জীব হয়ে গেছে।

টোটা বলল, 'সে তো হবেই জ্যাঠামশাই। অত রক্ত বেরিয়ে গেছে। টুম্পাই স্ট্রং ছেলে বলে সামলে নিয়েছে। অন্য কেউ হলে...'

ঠিক এই সময়ে মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাবার সামনে ঘোমটা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। মায়ের মুখটা তাই দেখতে পেলাম না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। যদ্দিন না আমি উঠে দাঁড়াব, সময়-অসময়ে মায়ের ফোঁপানি চলবেই। মাকে দেখে বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছেলেটাকে আরও নার্ভাস না করে দিলেই নয়? ঠিক আছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিচ্ছি। এসে এক বার উনি না হয় দেখেই যান।

অত চিন্তার কী আছে?'

টোটা বলল,

'জ্যাঠামশাই, মাথার একটা স্ক্যান করিয়ে নিলে ভাল হত না? মাথায় চোট তো! সাবধান থাকা ভাল।'

বাবা বলল, 'কথাটা মন্দ বলোনি, টোটা। নাহ্ এই ডাক্তারকেও দেখছি পাল্টাতে হবে। স্ক্যান করার কথা তখন বললই না। বললে উমা পলি ক্লিনিক থেকে একেবারে স্ক্যান করেই টুম্পাইকে বাড়ি নিয়ে আসতাম।'

হনহন করে বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাবার সামনে ইচ্ছে করেই চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম, যাতে কোনও কথা বলতে না হয়। বাবা দরজার দিকে এগোতেই চোখ খুললাম। গেস্টরুমে শুয়ে আছি। আমার ঘরটা তিনতলায়। বাড়িতে এসে বাবা আমাকে তিনতলায় তোলার ঝুঁকি আর নেয়নি। উঠে বসার চেষ্টা করতেই মা বলল, 'ফের উঠছিস? উফ্ তোকে নিয়ে আমার যত্ত জ্বালা!'

ফের শুয়ে পড়লাম। তখনই দেখতে পেলাম, মুখোমুখি সোফায় দাদা আর বউদি বসে। মোবাইলে দাদা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। একটু উত্তেজিত। দাদার শেষ কথাটা আমি শুনতে পেলাম, 'মাফ করবেন, ডাকাতি নিয়ে আর একটা কথাও আমি বলতে পারব না। যা জানার আপনারা পুলিশের কাছে জেনে নিন।'

'ডাকাতি' কথাটা শোনা মাত্র আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে মাথার ডান দিকটা চিড়িক দিয়ে উঠল। মাথায় হাত দিতেই বুঝলাম ব্যান্ডেজ হয়েছে। দোকানের সামনে গাড়িবারান্দার নীচে নীল জিনস পরা যে ছেলেটার ওপর আমি শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, সে পিস্তলের বাঁট দিয়ে তখন আমার মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছিল। তবুও ছেলেটাকে আমি ছাড়িনি। আমি না ঝাঁপালে রামাদীনকে ও এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। মাথায় চোটটা লাগার পরই আমি চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। জানি না, শেষ পর্যন্ত দোকানে ডাকাতি হয়েছিল কি না।

মা বিছানার ওপর উঠে বসেছে। আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বললাম, 'মা, আমাদের দোকান ঠিক আছে?'

—দোকানের কথা রাখ। তুই যে ঠিক আছিস, এতেই আমরা খুশি। আজ যা করেছিস, জীবনেও আর করতে যাস না বাবা। ডাকাতদের খবর শোনা ইস্তক আমার

বুকে ব্যথা উঠে গেছে।

সোফা ছেড়ে উঠে এসে দাদা বলল, 'কে তোকে এত রিস্ক নিতে বলল? কেন তুই ডাকাতদের সঙ্গে ফাইট করতে গেলি? ওরা তোকে ছাড়বে ভেবেছিস? গ্যাঙের তিনটে ছেলে পালিয়ে গেছে। ওরা পরে তোকে ঠিক টার্গেট করবে।'

দাদাকে সাহস দেওয়ার জন্য বললাম, 'ধুস, তোমরা ফালতুই ভয় পাচ্ছ। কিচ্ছু হবে না।'

দাদা বলল, 'কিচ্ছু হবে না? তুই বললেই আমি শুনব? এই তো একটু আগে ডাকাতদের ফোন এসেছিল। ওরা থ্রেট করছিল। বলল, তোর লাশ নামিয়ে দেবে। ভাই, তোর এই এক দোষ। বড্ড একগুঁয়ে। বড়দের কথা শুনিস না।'

শুনে আমি অবাকই হলাম। ডাকাতরা ফোন করেছিল? অসম্ভব। জিজ্ঞেস করলাম, 'ফোনটা কে ধরেছিল?'

—লালি। ও তো কেঁদেকেটে একসা। ভয় পেয়ে তখুনি পোস্তা থানায় আমি ফোন করে দিয়েছি। থানা থেকে লোক এই এল বলে।

ফোনটা লালি ধরেছিল, শুনে মারাত্মক হাসি পেয়ে গেল। দাদা তো জানে না, লালি কী চিজ! কোন রেঞ্জে মিথ্যে বলতে পারে ও! আমি জানি আর জানে টোটা। লালি ঠিক সময়ে একটা গপ্পো ছেড়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে এই সময়ে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য। সত্যি কথাটা বললে কেউ এখন বিশ্বাস করবে না। টোটার পাশে লালি দাঁড়িয়ে আছে। ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদা যা বলছে, ঠিক?'

লালি বলল, 'বিশ্বাস করা না করা তোমার ওপর।'

—কী বলল, ফের বলো তো।

—ওই তো—আমি মুম্বই থেকে বলছি। ইয়াকুব ভাই। কুন্তল দত্ত আছে? আমি বললুম, না। তখন বলল, ওকে বলে দেবেন, তিন দিনের মধ্যে আমি ক্যালকাটায় যাচ্ছি। ওর লাশ ফেলে দেব। কেউ আটকাতে পারবে না।

হা হা করে হেসে উঠব কি না ভাবছিলাম কিন্তু মায়ের ফোঁপানি শুনে চুপ করে গেলাম। লালি পারেও বটে। কোত্থেকে ইয়াকুব ভাই বলে একজনকে আমদানি করেছে! মজা করার জন্যই বললাম, 'কথাটা কী ভাষায় হল, উর্দু না ফারসিতে?'

শুনে দাদা চটে উঠল, 'ঠাট্টা করিস না ভাই। ও যা বলছে, সত্যি।'

'আমি তো জানি, কী সত্যি। মনে মনে হাসলাম। দু'চারদিনের মধ্যে আমার শরীর থেকে যে রক্তপাত হবে—তা আমি জানতাম। মঙ্গল দ্বাদশে। রক্তক্ষরণ অবধারিত। কিন্তু বৃহস্পতির দৃষ্টি আছে বলে গুরুতর কিছু হবে না। আজ হয়ওনি। কিন্তু বিছানার চারপাশে আমার খুব নিকটজনেরা দাঁড়িয়ে আছে। আমার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। পরিবেশটা হালকা করা দরকার। তাই বললাম, 'মোবাইলে তখন

তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে দাদা, এই একটু আগে?'

—আরে, খবরের কাগজের রিপোর্টারের সঙ্গে। কাজ নেই, কম্ম নেই। বিরক্ত করে যাচ্ছে। একটু আগে টিভি থেকেও লোক এসে হাজির। বলে, তোর ইন্টারভিউ নেবে। বললুম, মাইরি আর কী! আমার ভাইটাকে আপনারা টিভি-তে দেখান। ডাকাতগুলো আরও চিনে ফেলুক। আস্পদ্দার বলিহারি...!

দাদা আমাকে আরও কী বলতে যাচ্ছিল, বউদি সামনে এসে দাঁড়াল, বউদির চোখমুখও বেশ ফোলা। করুণ মুখে বলল, 'এখন কেমন বোধ করছ ভাই?'

—ভাল।

—মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

সামান্য হচ্ছে, তবুও বললাম, 'না।'

—একটু গরম দুধ এনে দেব?

—দাও। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে।

বউদি পাশ ফিরে বলল, 'লালি, যা না ভাই। মতির মাকে বল, যেন এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আসে।'

লালি দ্রুত পায়ে ভেতর বাড়ির দিকে চলে যেতেই বউদি বলল, 'আজ সক্কাল থেকেই মনে কুডাক দিচ্ছিল, মা। কোনও একটা অঘটন ঘটবে। সক্কাল বেলায় একটা কাক ডেকেই যাচ্ছে আমার ঘরের জানলায় বসে। মতিকে বললাম, কাকটা তাড়িয়ে দে। ওমা! যত বার তাড়ায়, তত বার ঘুরে আসে। কাল সকালেই আমি ঠনঠনের কালীবাড়ি যাব। পুজো দিয়ে আসতে হবে...'

বউদির কথা শুনে হেসে ফেললাম। অন্য সময় হলে ঠাট্টা করতাম। কিন্তু এখন পিছনে লাগা যাবে না। দাদা সামনেই আছে। আমার থেকে দাদা সাত বছরের বড়। আমাকে খুব ভালবাসে। ছোটবেলায় এক বার আমার টাইফয়েড হয়েছিল। মায়ের কাছে শুনেছি, দাদা না কি স্কুল কামাই করে তখন আমার বিছানার পাশে বসে থাকত। আমার দাদাটা খুব ভিতু টাইপের। জীবনে একটা মশা পর্যন্ত মারেনি। গেল বছর জোড়াবাগানে আমাদের ক্যারাটে টুর্নামেন্ট দেখতে গেছিল। লাথালাথি দেখে খুব ঘাবড়ে যায়। ফিরে এসে খুব হম্বিতম্বি করেছিল আমার ওপর। ও সব ডোম-বাগদিদের খেলা। তুই খেলবি কেন?

দাদাকে কে বোঝাবে এখন, ওই ডোমবাগদিদের খেলাটা যদি আমি আজ না জানতাম, তা হলে এতক্ষণে বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত। বিবেকানন্দ রোডের ওই দোকানে দেড় থেকে দু'কোটি টাকার মাল আছে, সব লুঠ হয়ে গেলে ওই দোকান আর কাল খুলতে হত না। ডাকাতির পর সেনকো জুয়েলার্সের দোকানটা আর খোলেইনি। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম. আমি যদি ডাকাতদের চার-পাঁচ মিনিট

আগে দেখে না ফেলতাম, তাহলে কী হত! সওয়া সাতটার সময় দোকানে জেম্‌স আর অর্নামেন্ট—দু'সেকশনেই বেশ ভাল ভিড়। বিয়ের মরশুম। অন্তত পনেরো থেকে কুড়িজন কাস্টমার তো তখন ছিলই। ডাকাতদের অত্যাচারে প্রত্যেকেই সব কিছু খোয়াত। আর তখনই প্রশ্ন উঠত, অত নামী দোকানের সেফটি ব্যবস্থা এত ঢিলেঢালা কেন?

চোখ বুজতেই ছবির মতো সব ভেসে উঠল। ডাকাতদের দেখতে পাওয়ার পরই লাফ মেরে দোকানের ভেতর আমি ঢুকে পড়েছিলাম। কাস্টমাররা যাতে কিছু বুঝতে না পারে, সে জন্য রামাদীন আর কৈলাসকে ফিসফিস করে বলেছিলাম, 'বাইরে ডাকাত। তোরা বাইরে বেরিয়েই ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার কর। আমি শাটার ফেলে দিচ্ছি। তার পর পিছনের দরজা দিয়ে ফের বাইরে বেরচ্ছি।'

পলকের মধ্যে রামাদীন আর কৈলাস বন্দুক বাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি বোতাম টিপে তখনই শাটার ফেলে দিলাম। শাটারের ঘরঘর শব্দ ছাপিয়ে তখনই বাইরে আর একটা বিকট শব্দ হল। শুনেই বুঝতে পারলাম, ডাকাতরা অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে। একটা বড়সড় বোমা ফাটিয়েছে। এ বার নিশ্চয়ই দোকানের কাছে এসে আরও বোমা ফাটাবে। রাস্তার মানুষজনের মধ্যে প্যানিক ছড়িয়ে দেবে। দোকানের গেটের দুপাশে কাচের শোকেস গুঁড়িয়ে গেলে সর্বনাশ! সেখান দিয়েও ওরা ঢুকে পড়তে পারে।

ভেতরে কাস্টমাররা প্রথমে কিছুই টের পায়নি। কিন্তু রামাদীন ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করার পর আর একটা শব্দ হতেই ওরা বুঝতে পেরে যায়, বাইরে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে। বাবা মেজেনাইন ফ্লোর থেকে নেমে এসেছে। পিছনে পিছনে গিরিজাবাবু, ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে। বাবা খুব কড়া মেজাজে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে রে?'

ডাকাতদের কথা বললে কাস্টমারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে যাবে। তাই বললাম, 'তেমন কিছু না। অ্যান্টিসোশ্যালদের ভেতর মারপিট। এখুনি থেমে যাবে।

বাবা বলল, 'শাটার দেওয়া আছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি পোস্তা থানায় ফোন করে দাও। যাতে এখুনি ফোর্স পাঠিয়ে দেয়। আমি বাইরে যাচ্ছি।' বলেই পিছনের গেট দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাস্তার আলো নিভে গেছে। গাড়িবারান্দার নীচেটায় বেশ অন্ধকার। মেনগেটের সামনে দু'তিনটে ছায়ামূর্তি। দেখেই বুঝে গেলাম, ডাকাতরা তৈরি হয়েই এসেছে। অ্যাকশনের শুরুতেই ওরা রাস্তার আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

গাড়িবারান্দার থামের আড়ালে কৈলাস হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুক বাগিয়ে পজিশন নিয়েছে। ফায়ার করলে আর দেখতে হবে না। এই রেঞ্জ থেকে ফায়ার করলে যার শরীরে লাগবে, গুলি তার শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। আমি ডান

দিকে সরে গেলাম, যাতে ও গুলি ছুঁড়তে পারে। অন্য থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, রামাদীন রাস্তায় নেমে গেছে। গুলি করে রাস্তার মধ্যেই ফেলে দিয়েছে একটা ছেলেকে। হেডলাইট জ্বালিয়ে দ্রুতবেগে একটা ট্যাক্সি চলে গেল। সেই আলোতে দেখলাম, মাঝরাস্তায় ছেলেটা শুয়ে কাতরাচ্ছে।

জীবনে কখনও এই পরিস্থিতিতে পড়িনি। ক্যারাটেতে আমি স্টেট চ্যাম্পিয়ন। দু'তিনজন ছেলেকে একাই পেড়ে ফেলতে পারি। ডাকাতদের কার হাতে কী অস্ত্র আছে, সে সব না ভেবে লাফ দিয়ে গাড়িবারান্দার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সামনে একটা ছায়ামূর্তি। বাঁ পায়ে সারা শরীরের ভর দিয়ে প্রায় তিনশো ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ডান পা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারলাম ছেলেটার পাঁজর লক্ষ করে। সঙ্গেসঙ্গে 'ওয়াক' শব্দ। ওই ছেলেটা ছিটকে পড়ল দশ হাত দূরে। দু'পায়ে ভর দিয়ে ফের দাঁড়াতেই দেখি, লম্বা মতো একটা ছেলে রামাদীনকে তাক করে পিস্তল বাগিয়েছে। ট্রিগার টিপে দিলে রামাদীনকে আর বাঁচানো যাবে না। সঙ্গেসঙ্গে লাফিয়ে জাপটে ধরলাম ওকে। তার পর কী হয়েছে, জানি না।

...কপালে কার যেন হাত। ঠান্ডা আর নরম। চোখ খুলে দেখলাম, বউদি। বলল, 'একটু উঠে বোসো তো ভাই। দুধটা খাইয়ে দিই।'

উঠে বসলাম। গ্লাসটা হাতে নিয়ে দুধে চুমুক দেওয়ার পর সত্যিই আরাম লাগল। আমার কী হয়েছে, তা জানা দরকার। বাবা বলে গেল, সেলাই হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'ক'টা সেলাই হয়েছে গো, বউদি?'

—দশটা।

—আমি তো টেরই পাইনি।

—পাবি কী করে? দাদা বলল, 'বিষ্ণুকাকার জন্যই তুই এ যাত্রায় রেহাই পেলি। ডাকাতরা যখন টায়ারের দোকানের ও দিক থেকে বোম চার্জ করছিল, তখন গাড়িবারান্দার নীচে তোকে পড়ে থাকতে দেখে বিষ্ণুকাকা বাঘের মতো লাফিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। তার পর তোকে তুলে নিয়ে দৌড়ে চলে যায় ডাক্তার সাহার চেম্বারে।'

—কেউ ধরা পড়েনি?

—দু'জন। তুই যাকে জাপটে ধরেছিলি... সে আর ইনজিওর্ড ছেলেটা। টায়ারের দোকানের মুটেওয়ালা বলছিল, থার্ড একটা ট্যাকসিও না কি এসেছিল। সে ট্যাকসি থেকে ছেলেগুলো না কি নামেইনি। একটা ফাঁড়া গেল বটে আজ! ইউসুফ ভাই জয়পুর থেকে আজই ষাট লাখ টাকার মাল পাঠিয়েছে। জানিস ভাই, মনে হয়, ডাকাতদের কাছে খবর ছিল। সে জন্য আজকেই অ্যাটেম্পট করল।

শুনে আমি উঠে বসলাম। ইউসুফ ভাই হিরের ব্যবসায়ী। আমাদের সঙ্গে লাখ

লাখ টাকার কারবার। দাদা যা বলছে, তা হতেও পারে। এই লোকটাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। এক বার আমাদের সঙ্গে দু'নম্বরি করেছিল। বড়বাজারের সোনাপট্টিতে ওর লোকজন আছে। কখনও সখনও তারাই মাল দিয়ে যায়। হয়তো তাদেরই সঙ্গে ডাকাত দলের যোগাযোগ আছে। অসম্ভব কিছু না।

ইউসুফ ভাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎই একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। আরে...মাস দু'য়েক আগে কলকাতায় এসে ইউসুফ ভাই তো এক বার ইয়াকুব বলে একজন দালালের কথা আমাকে বলেছিল! লোকটা না কি জিনা হারাম করে দিচ্ছে ইউসুফ ভাইয়ের। এও বলেছিল, লোকটা খুব খতরনাক। দুবাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

কথাটা মনে হতেই ঠান্ডা একটা স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া দিয়ে। লালি তা হলে মিথ্যে বলেনি। ইয়াকুবের নাম ও জানবে কী করে?

তিন

দুপুরবেলায় লাঞ্চ টেবলে এসে বসতেই দাদা বলল, 'কোথায় ছিলি, ভাই? রাতে ঘুম হয়েছিল?' দাদার এই এক বদ অভ্যাস। কখনও একটা প্রশ্ন করে না। এক সঙ্গে এমন দু'টো প্রশ্ন করবে, এক কথায় যার উত্তর হয় না।

ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লাম। যা বুঝে নেওয়ার, দাদা বুঝে নিক। সকালবেলাতেই দাদা গড়িয়াহাটের দোকানে চলে যায়। বাড়ি আসে একটা-দেড়টার সময়। লাঞ্চ সেরে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে ফের বেরিয়ে যায় তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ। রাতে স্টক মিলিয়ে দোকান বন্ধ করে কখন ফিরবে, তার কোনও ঠিক নেই। বাবারও এক রুটিন। তবে আমাদের বাড়ির কাছেই বিবেকানন্দ রোডে দোকান। তাই সকালে গঙ্গায় স্নান সেরে এসে, নিজের হাতে বাজার করে আনার পর বাবা একটু দেরিতে দোকানে যায়। রাতে ফেরেও তাড়াতাড়ি। ন'টার মধ্যে।

লাঞ্চ টেবলেই বাবা আর দাদা রোজ ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা সেরে নেয়। সে সব শোনার সৌভাগ্য আমার হয় না। কারণ, ইচ্ছে করেই ওদের লাঞ্চের সময় আমি বাড়ি থাকি না। এর পিছনে দু'টো কারণ আছে। প্রথমত, আমার খাওয়াদাওয়ার বাঁধা সময় আছে। সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর। এই অভ্যাসটা আমার আগে ছিল না। আমাদের গজুকাই ক্যারাটে শেখানোর জন্য হোক্কাইডো থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ব্ল্যাকবেল্ট হোল্ডার মি. কাওয়াসাকি। তখন তিনিই এ উপকারিতা বুঝিয়ে যান।

জাপানিরা না কি আজকাল দিনে পাঁচ বার করে খান। অবশ্য প্রতি বারই অল্প অল্প করে। এতে ভাল হজম হয়। পেট ভাল থাকে। মি. কাওয়াসাকির মুখে সে সব

কথা শোনার পর আমার মাথায় ঢুকে গেছে, আমাদের মানে, কাঙালিদের খাওয়ার অভ্যাসটা যাচ্ছেতাই। তেল-ঝাল-মশলা দেখলেই আমার এখন ভয় করে। আমাদের বাড়িতে খাবার টেবলে আবার তেল-ঝাল-মশলার রান্না ছাড়া কারও মুখে ভাত ওঠে না। বাবা, দাদারা সে সব গোগ্রাসে খায়। দেখেই আঁতকে আঁতকে উঠি। ওদের সঙ্গে লাঞ্চ টেবলে না বসার এটাই দ্বিতীয় কারণ।

আমি লাঞ্চ সেরে নিই বেলা এগারোটা-সাড়ে এগারোটার মধ্যে। নড়চড় হলে মাথায় রাগ উঠে যায়। বউদি সেটা জানে বলে, রোজ মতির মাকে তাড়া দিয়ে আমার জন্য বিনা মশলায়, কম তেলে রান্না করিয়ে রাখে। বউদি, 'রামের সুমতি'র সেই নারায়ণী বউদির চেয়েও ভাল! দু'জনের মধ্যে তুলনা করে দেখেছি। আমি নিশ্চিত। কিন্তু এই বউদির কথা কোনও বইয়ে লেখা থাকবে না। শরৎচন্দ্রের মতো লেখক এখন আছে না'কি?

টেবলে বসতেই দরজার পাশ থেকে এগিয়ে এসে বউদি বলল, 'ভাই, তোমাকে তেল-ঝাল খেতে হবে না। তোমার জন্য আমি আলাদা রান্না করিয়েছি।'

রোজই করায়, তবুও বউদি এত বুদ্ধিমতী যে, কথাটা আগে বাবাকে শুনিয়ে রাখল। আমাকে আলাদা খাবার দেওয়া হচ্ছে দেখলে বাবা নিশ্চয়ই ভ্রু কুঁচকে তাকাত। এক যাত্রায় পৃথক ফল নয়। বাবা হচ্ছে সেই মানসিকতার মানুষ। আমার কোনও আবদার কোনও দিন সহ্য করেনি। ছোট বেলায় আমার একটা আইসক্রিম খাওয়ার ইচ্ছে হলেও, না। মা তো ভয়ে কাঁটা হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিল। এই যেমন এখন দাঁড়িয়ে আছে, দরজার পাশে। একমাথা ঘোমটা দিয়ে। এই নারীবাদের যুগে আমার মা-টা কেন যে এত দাসত্ব করে বুঝি না !

আমাদের বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যেই নতুন বাজার। সকালে বোধহয় মন দিয়ে বাবা বাজারটা করেছে। সর্ষে ইলিশ, গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর রসুন দিয়ে পাবদা মাছ—এক বিঘত সাইজের। এই ষাট বছর বয়সেও বাবা ও সব আইটেম খাবে। তবুও দিব্যি আছে। ব্লাড প্রেশার নেই, সুগার নেই। বাজার করতে যাওয়ার সময় বাবা কখনও হাতে থলি নিয়ে যায় না। সঙ্গে ঝাঁকামুটে নিয়ে ফেরে। দাদুও ফিরত, শুনেছি আমার দাদুর বাবারও না কি এই অভ্যাসটা ছিল। ঝাঁকামুটের মাথায় বাজার নিয়ে না ফিরলে না কি লোকে মনে করবে, দত্তদের অবস্থা পড়ে গেছে।

বাবা আর দাদা খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ঘি আর ভাজা ইলিশ দিয়ে। আমিও মুগের ডাল দিয়ে ভাত মাখতে লাগলাম। ঠিক সেই সময় বাবা বলল, 'গিরিজাবাবু আজ একটু আগে ফোন করেছিলেন।' দাদা খাওয়া বন্ধ করে বাবার দিকে তাকাল। কেন, কথাটা বলার সাহস দাদারও নেই। বউদিই জিজ্ঞেস করল, 'কেন বাবা?'

—খুব ইচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে করে।

প্রবল কৌতূহলে দাদা বলেই ফেলল, 'কুটুম্বিতে.... মানে?'

—এই মানে... ওঁর ছোট মেয়েকে আমাদের বাড়িতে দিতে চান। কাল বউঠান আর মেয়েটাকে নিয়ে গিরিজাবাবু আমাদের দোকানে এসেছিলেন। টুম্পাইকে দেখে ওঁদের খুব পছন্দ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ ! বাবা বলে কী? খাওয়া আমার ডকে উঠল। বাবারও ডেফিনিটলি ইচ্ছে আছে। তাই কাল দোকানে ভদ্রলোকের সামনে আমার গুণপনা ব্যাখ্যা করছিল। এই বার বুঝতে পারলাম, বাবা কেন তখন বলেছিল, আমার এই ছেলেই এই শোরুম দেখাশোনা করে। মা বা বউদির প্রতিক্রিয়া কী, তা দেখার জন্যও মুখ তোলার অধিকার আমার নেই। টের পেলাম বুকে ঢপঢপ শব্দ হচ্ছে। ঠিক জুরাসিক পার্কে ডাইনোসরের পায়ের শব্দ। বউদি যদি এখন বলে বসে 'এ তো খুব ভাল কথা', তা হলে আমি গেলাম। টোটার কাছে আমার মুখ থাকবে না। এই ক'দিন আগেও আমি আর টোটা বেলুড়ে গিয়ে, গঙ্গার ধারে বসে প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে বিয়ে করব না। স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্রহ্মচর্য পালন করব।

বউদি জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা কী পড়াশোনা করে বাবা?'

বাবা বলল, 'বেথুন কলেজে পড়ে। ফাইনাল ইয়ার। পড়াশোনায় তেমন না। তবে দেখতে লক্ষ্মী পিতিমের মতো।'

—ওর তো একটা দিদি আছে, তাই না বাবা?

—হ্যাঁ। তার বিয়ে হয়ে গেছে।

—কোথায় হল?

—এই তো হাটখোলার দত্তবাড়িতে। গিরিজাবাবু তাকে খুবই দিয়েছে থুয়েছে। এ মেয়েকেও ঢেলে দেবে। দুই মেয়ে ছাড়া তো আর কেউ নেই। পোস্তার অত বড় সম্পত্তি না কি এ মেয়ের নামেই করে রেখেছে।

আড়চোখে বাবার মুখের দিকে তাকালাম। মনে হল, ভাজা ইলিশ খেতে খেতে যেন একটা ডাইনোসর কথা বলছে। পোস্তার ওই সম্পত্তি গিলে খাবে। পরক্ষণে মায়ের দিকে তাকালাম। চিনতেই পারলাম না। কাল গিরিজাবাবু ওঁর এক দিদির কথা বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে না কি আমার বাবার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সেই ভদ্রমহিলাকে আমি দেখিনি। এই মাত্র দেখে ফেললাম। মায়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে থাকার কথা অবশ্য ছিল সেই ভদ্রমহিলারই । মাঝখান থেকে প্যাঁচ মেরে আমার দাদু নগেন্দ্র শীল সব ভেস্তে দিয়েছেন।

আমার গলা দিয়ে ভাত নামতে চাইছে না। বউদি কী প্রশ্ন করে তা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। বাবা যে ধরনের লোক, সম্পত্তির লোভে খুব শিগগির লক্ষ্মী পিতিমের সঙ্গে আমার বিয়েটা ঠিক করে ফেলবে। নাহ্ আজ আমার কোষ্ঠীটা

নিয়ে বসতেই হবে। দেখতেই হবে শিগগিরই বিয়ের যোগ রয়েছে কি না। আমার কোষ্ঠী করেছিলেন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য। যা লিখেছেন, এখনও পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে মিলছে।

—মেয়েটার নাম কী বাবা? বউদি বলল।

—ভাল নামটা তো জানা হয়নি। ওঁরা ডাকেন বুলবুল বলে। খুব মিষ্টি মেয়ে। দেখলেই তোমাদের পছন্দ হয়ে যাবে।

ওহ, মেয়েটার নাম, তা হলে বুলবুল। সে কি এই সম্বন্ধের কথা জানে? মনে হয়, জানে। তাই কাল বাবার ঘরে ঢুকে আমাকে খুব করে দেখছিল। এই বার বুঝেছি। নাহ, আমার বোধহয় কলকাতায় থাকা সম্ভব হবে না। এ বাড়ির পাট তুলতে হবে। বাবা যদি ঠিক করে থাকে, তা হলে এ বিয়ে দেবেই। বাবার মুখের উপর আমি না বলতে পারব না। আমি কেন, এ বাড়ির কেউই পারবে না। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, লাঞ্চ শেষ করে উঠেই নিজের ঘরে গিয়ে টোটাকে এক বার ফোন করব। এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত, ওর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। আজ ও কোর্টে যায়নি। সেটা আমি জানি।

বউদি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল আমার পাতে তুলে দিচ্ছে। করুণ চোখে এক বার বউদির মুখের দিকে তাকাতেই মুচকি হাসল। তার পর বলল, 'আরও একটা মাছ কিন্তু আছে। ভাই, সাততাড়াতাড়ি যেন উঠে পোড়ো না।'

চুপচাপ খেতে লাগলাম। বউদি গলদা চিংড়ি পরিবেশন করছে বাবার থালায়। গোটা তিনেক পাতে পড়ার পর চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এই বয়সে খাচ্ছে, খাক। আমার কী? টোটার বাবা দিবাকর মল্লিকও খুব খেত। মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। মারা গেল। এই তো দু'বছর আগের কথা। এক সময় কলকাতা শহরে টোটাদের চোদ্দোটা বাড়ি ছিল। ভাল ভাল জায়গায়। ওর বাবা একটা করে বাড়ি বিক্রি করত। আর সেই পয়সা ওড়াত চব্যচোষ্য খেয়ে। সারাটা জীবন কোনও রোজগারই করল না লোকটা। মল্লিকবাড়ির ছেলে চাকরি করবে? ছিঃ।

টোটাদের অবস্থা এখন খুব পড়ে গেছে। পাথুরেঘাটায় ওদের বসত বাড়িটা অবশ্য আছে। কিন্তু টাকা-পয়সা বলতে কিচ্ছু নেই বললেই চলে। আমি জানি। গত পনেরো বছর ধরে ওদের বাড়ি যাতায়াত করার জন্যই জানি। ওর বাবা যেদিন মারা গেল, সে দিন দাহ করার টাকাও টোটার কাছে ছিল না। আমাকে অবশ্য সে পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে না। টাচ্ উড্ আমার বাবার অনেক টাকা।

বাবা আর দাদা লক্ষ্মী পিতিমের কথা ভুলে গেছে। এখন ব্যবসার আলোচনা চালু করে দিয়েছে। পটেলভাইকে নিয়ে কথা হচ্ছে। আর মাস দুই আড়াই পরেই

পুজো। দোকানে ভাল বিক্রিবাট্টার সময়। চলবে সেই বিয়ের সিজন পর্যন্ত। আমাদের বিবেকানন্দ রোডের দোকানে প্রচুর অবাঙালি কাস্টমার। ধনতেরাস-এর সময়ে ওরা সোনার জিনিস কিছু না কিছু কিনে রাখবেই। অনেকে আবার হিরের জিনিসও কেনে। আমাদের হিরে সাপ্লাই দেন সুরাতের পটেলভাই। তাঁর কোটি কোটি টাকার কারবার। মুম্বইয়ের জাভেরি বাজারেও ভদ্রলোকের বিরাট শো-রুম আছে। ফি-বছর উনি এক বার করে কলকাতায় আসেন। এসে ওঠেন তাজ বেঙ্গলে। সেই সময় বাবা আমাকেই কথাবার্তা বলতে পাঠায়।

ভদ্রলোককে বাবাই বোধহয় এক সময় কথায় কথায় বলে ফেলেছিল, আমি ভাল হাত দেখতে জানি। কোষ্ঠীবিচার করতেও। গত বছর উনি আমাকে হাত দেখিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, এক মাসের মধ্যেই খুব কাছের একজন ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাঁর গায়ের রঙ হবে কালো। মাঝারি হাইট। চোখে গোল্ডেন কালারের চশমা পরে। পটেলভাই তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার কথা। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই হঠাৎ এক দিন ফোন করে বললেন, আমার ভবিষ্যদ্বাণী একশো পার্সেন্ট মিলে গেছে। তার পর থেকে পটেলভাইয়ের অন্ধ বিশ্বাস আমার ওপর। লোক মারফত ছক পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাঝেমধ্যে কোনও সমস্যায় পড়লেই মুম্বই থেকে উনি আমাকে ফোন করেন।

খেতে খেতে বাবার কথা শুনছি। বাবা বলল, আমার মনে হয় পটেলভাইকে এক বার ফোন করা উচিত, বুঝলি বুবাই।

দাদার ডাকনাম বুবাই। দাদার নামের সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম রাখা হয়েছিল টুম্পাই। দাদা বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে, বাবা। ইউসুফের জন্য আমরা কেন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব? ইয়াকুব লোকটাকে আমার খুব ডেঞ্জারাস বলে মনে হচ্ছে।'

দাদার মুখে ইয়াকুব নামটা শুনে কান খাড়া করে রাখলাম। এই লোকটা কাল রাতে লালিকে হুমকি দিয়েছে, কলকাতায় এসে তিন দিনের মধ্যে আমার লাশ ফেলে দেবে। প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ছক তো আমি জানি। তিন দিনের মধ্যে আমার লাশ হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমি প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত বাঁচব; আমার মৃত্যু আজেবাজে কোথাও হবে না। হবে কোনও তীর্থক্ষেত্রে।

বাবা বলল, 'আমার কী মনে হচ্ছে, জানিস? ইউসুফ এ বার যে পুরিয়াটা পাঠিয়েছে, তাতে দু'নম্বরি কোনও মাল আছে।'

পুরিয়া মানে কাপড়ের ছোট্ট থলে। ব্যাপারিরা ওই পুরিয়ায় ভরে হিরে নিয়ে আসে আমাদের দেখাতে। দেখলে বোঝাই যাবে না—এমন মহার্ঘ রত্ন সঙ্গে নিয়ে ওরা ঘুরছে। হিরে ব্যবসা পুরোটাই চলে বিশ্বাসের ওপর। খুচরো মালে কোনও

লেখাপড়া থাকে না। অনেক সময় অনেক হাত ঘুরে দালাল মারফত সেই মাল আমাদের কাছে আসে। হাত ফেরতা হওয়ার সময় দু'একটা ক্ষেত্রে দু'নম্বরি মাল ঢুকে যায়। সেটা নিয়েই হয় যত সমস্যা। ইউসুফের পুরিয়া নিয়ে ঠিক কী গন্ডগোল হয়েছে, তা শোনার জন্য কান পেতে রইলাম।

দাদা বলল, 'মাল নেওয়ার সময় তুমি দেখে নাওনি?'

—না, সে সময় আমি দিগিন শীলের বাড়ি গেছলাম। বিষ্ণু দেখেছে।

—পরে আর ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলনি?

—চেষ্টা করেছি। ফোনে ওকে পাচ্ছি না।

—ওর বড়বাজারের লোকটাকে ধরো না। মতিয়া...না কী যেন নাম— মতিয়াকে আজ বিষ্ণু ডেকে এনেছিল। সে তো এমন ভান করল, আমাদের দোকানের ডাকাতির কথা শোনেইনি। পুরিয়ায় আট পিস মাল ছিল। একটা দেখলাম চটিওঠা। মনে হয়, ওই পিসটা নিয়েই গন্ডগোল। চটিওঠা মানে, গোলকোণ্ডা কাট হিরে। দক্ষিণ-আফ্রিকার হিরে নয়। যে হিরের তলার দিকটা পয়েন্টেড নয়, চলতি কথায় সেটাকে আমরা বলি, চটিওঠা। বাবার কথা শুনে মনে হল, ঠিকই ধরেছে। এই ধরনের গোলকোণ্ডা কাট হিরে এখন আর খনিতে পাওয়া যায় না। হিরের প্রায় পুরো ব্যবসাটাই হয় দক্ষিণ আফ্রিকার হিরে নিয়ে। কিন্তু অনেক সময় দালাল মারফত গোলকোণ্ডা কাট হিরে ব্যাপারিদের কাছে আসে বিক্রির জন্য। অবশ্যই সেটা কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। ইয়াকুব বলে লোকটা মনে হয় দালাল। কেউ হয়তো ওকে হিরেটা বিক্রির জন্য দিয়েছিল। ইউসুফভাই নিশ্চয়ই ওকে দামে ঠকিয়েছে। সেই রাগে ও এখন হিরেটা ফেরত চায়। বোধহয় কানে গেছে, হিরেটা আমাদের দোকানে ডেলিভারি হয়েছে। সেই কারণেই ডাকাতির অ্যাটেম্পট।

মনে মনে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে শুনলাম, দাদা বলছে, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, বাবা। ইয়াকুব বলে লোকটা ভাইয়ের নাম জানল কী করে? ভাইয়ের ওপর ওর রাগ হল কেন?'

—আমারও তো সেটা মাথায় ঢুকছে না। এখান থেকে কেউ নিশ্চয়ই মুম্বইতে খবর দিয়েছে। ওদের নেটওয়ার্ক অনেক বড়, বুঝলি বুবাই। নইলে অত তাড়াতাড়ি সব জেনে যায়?

—পোস্তা থানা থেকে আজ কেউ এনকোয়ারিতে আসেনি?

—এসেছিল। লালির সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। আলাদা করে। মুম্বইয়ের ফোনটা নিয়ে কী জিজ্ঞেস করবে। বলছিল, মেয়েটাকে থানায় এক বার নিয়ে আসুন। বললাম, অসম্ভব। আপনাদের যা জানার, ওর বাড়িতে গিয়ে জেনে আসুন। মেয়েটাকে অনর্থক টানাহ্যাঁচড়া করবে। আমার কী মনে হচ্ছে জানিস, মেয়েটার কথায় অনেক

জল মেশানো আছে।

শেষ কথাটা শুনে বাবার দিকে এক বার আড়চোখে তাকালাম। ঠিকই আন্দাজ করেছে। আমারও তাই ধারণা। বাবা লালির সম্পর্কে খুব বেশি জানে না। দিবাকর মল্লিকের মেয়ে, টোটার বোন হিসেবে আমাদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসে বলে লালিকে ওপর ওপর চেনে। ও যে মারাত্মক মিথ্যে কথা বলে, বাবার তা জানার কথা নয়। তা সত্ত্বেও কোথাও বাবার মনে খটকা লেগেছে। যে লোকটা এত বড় একটা বিজনেস চালায়, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। তবুও, একটা ব্যাপারে আমি এখনও ধন্ধে আছি। লালি ইয়াকুবের নামটা জানল কী করে?

ব্যবসা ছাড়া আর কোনও ব্যাপার দাদা অত তলিয়ে দেখে না। লালি সম্পর্কে দাদা কোনও প্রশ্নই করল না। জিজ্ঞাস করল, 'ডাকাতদের সম্পর্কে পুলিশ কিছু বলল?'

—থার্ড ডিগ্রি দিয়েছে। এমন মেরেছে, দু'টো ছেলেই স্বীকার করেছে, ওরা ডাকাতি করতে এসেছিল। একজন থাকে মোমিনপুরের দিকে। অন্যজন কিষাণগঞ্জের। যে ক'টা ছেলে পালিয়েছে, তারা গাজিয়াবাদে থাকে। ডাকাতি করে এদের পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল নেপালে।

টুম্পাইকে তুমি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা। আমার ভাল লাগছে না। দিন কয়েক ও বাইরে গিয়ে থাকুক।

দরজার পাশ থেকে মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাবা সে দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল,—ব্যস, অমনি শুরু হয়ে গেল। শান্তিতে লাঞ্চ করব, তার উপায় নেই।

অমনি মা চুপ করে গেল। কান্নার পুরো সিস্টেমটা মা কী করে যে এত তাড়াতাড়ি সুইচ-অন সুইচ-অফ করে, আমি বুঝতে পারি না। অসাধারণ কন্ট্রোল। এই যেমন এখনই চোখে পড়ল, মা বউদিকে ইঙ্গিত করছে, বাবার পাতে আরও একটা পাবদা মাছ দেওয়ার জন্য। বউদির সঙ্গে মায়ের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ আছে, মনে হয়। বউদি যখন পরিবেশন করে, তখন ঠিক বুঝতে পারে, মা কী চায়।

লাঞ্চ টেবলে বাবা আর দাদার মধ্যে কথা শুরু হয়েছিল, লক্ষ্মী পিতিমেকে নিয়ে। তার পর পটেলভাই আর ইয়াকুব ঘুরে এখন আলোচনা চলছে, পুজোর সময় কাস্টমারদের কী গিফ্‌ট দেওয়া যায়, তাই নিয়ে। পাতে এক একটা নতুন আইটেম পড়ছে, আর প্রসঙ্গ বদলাচ্ছে। দাদার পাতে ইলিশ মাছ তুলে দিচ্ছে বউদি। বেশ বড় একটা পেটি। আর তখনই দাদা বলল, 'গেল বার চন্দ্ররা ভাল স্কিম করেছিল বাবা। এ বার আমাদের সে রকম কিছু করলে ভাল হয়।'

চন্দ্ররা...মানে পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স। আমাদের রাইভাল। কিছু দিন আগে ওরা এলগিন রোডে একট ব্রাঞ্চ খুলেছে দেখে দাদার খুব ইচ্ছে, আমরাও একটা দোকান

নিই ওই দিকে। চন্দ্রদের ওই শো-রুম দেখাশোনা করে অমিতাভ চন্দ্র। দাদার ব্যাচমেট। এক সঙ্গে এম বি এ করেছে লন্ডন থেকে। দু'জনের মধ্যে যে বেশ রেষারেষি আছে, সেটা টের পাই মাঝেমধ্যে দাদার কথাবার্তা থেকে। এলগিন রোডে নেতাজির বাড়ির কাছে আমাদের একটা বাড়ি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মায়ের নামে বাড়ি। দাদুর দেওয়া। এই ক'দিন আগেই দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, ওই বাড়িতে শো-রুম করলে কেমন হয় রে, টুম্পাই? তুই কি দায়িত্ব নিতে পারবি? বল, তা হলে বাবাকে বলে দেখি। আমি অবশ্য হ্যাঁ বা না কিছুই বলিনি।

কাস্টমারদের গিফ্ট দেওয়া নিয়ে বাবা আর দাদা গভীর আলোচনায় মেতে গেছে। আমার মন জুড়ে শুধুই ইয়াকুব। সত্যিই কি লোকটা ফোন করেছিল? নিজে এক বার পোস্তা থানায় যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখন যদি বাড়ি থেকে বেরনোর চেষ্টা করি, তা হলে আমার হিটলার বাবা মারাত্মক রেগে যাবে। থানার ও সি প্রতাপ বিশ্বাস অবশ্য আমাকে খুব ভাল মতো চেনেন। আমাদের ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বার দু'য়েক প্রাইজ দিতেও এসেছেন। ভদ্রলোককে ফোন করলেই ডাকাতদের সম্পর্কে বাড়তি অনেক কিছু জানা যাবে। এদের সঙ্গে মুম্বইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডের কোনও সম্পর্ক আছে কি না। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, দুপুরের দিকে ভদ্রলোককে এক বার ফোন করতে হবে।

বাবার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পাতে জল ঢেলে ওঠার সময় হঠাৎ বলল, 'তা হলে বউমা, আজ বিকেলের মধ্যেই তোমরা আমায় ঠিক করে জানিও।'

বউদি বলল, 'কী বাবা?'

—এই...গিরিজাবাবুর মেয়েকে তোমরা ঠিক কবে দেখতে যাবে। আমার তো ইচ্ছে, এই অগস্টেই বিয়েটা লাগিয়ে দেওয়া। শাস্ত্রীজি কাল বুলবুলের কোষ্ঠী বিচার করেছেন। আজ সকালে বললেন, রাজযোটক হবে টুম্পাইয়ের সঙ্গে।

শাস্ত্রীজির নাম শুনে প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল আমার। বাবা বেসিনে হাত ধুতে যাবার সময়ই মনটা শক্ত করে নিলাম। বিয়েতে ভাঙচি দিতেই হবে।

চার

সন্ধ্যেবেলায় নিজের ঘরে বসে টিভি দেখছি, এমন সময় মতি এসে বলল, 'টোটা দাদাবাবু এসেছে। ওপরে আসতে বলব?'

বললাম, 'ও এখন কোথায় রে?'

—দোতলায়। বউদিমণির সঙ্গে কথা বলছে।

—ওপরে আসতে বল।

না বললেও টোটা ওপরে আসবে। অন্তত পনেরো মিনিট সময় নেবে ওপরে

আসতে। বউদির সঙ্গে কথা বলবে। তার পর ওকে ধরবে মা। এ বাড়িতে ওর অবারিত দ্বার। সবাই ওকে ভালবাসে। এমনকী বাবাও। স্কুল লাইফে বাবা আমাকে অন্য কারও সঙ্গে মিশতে দিত না। কিন্তু টোটার সঙ্গে কোথাও গেলে কখনও বকাবকি করত না। এর কারণ, স্কুলে হয় ও ফার্স্ট হত, না হয় আমি। মাধ্যমিকে ও আমার থেকে দশ নম্বর বেশি পেয়েছিল। দিবাকর মল্লিকের কাছে বাবার মাথা হেঁট হয়ে গেছিল।

উচ্চ মাধ্যমিকে আমার জন্য চারজন মাস্টারমশাই রেখেছিল বাবা। আমি টোটার থেকে অনেক বেশি নম্বর পেয়েছিলাম। মাস্টারমশাই রাখার ক্ষমতা টোটার বাবার ছিল না। আমিই সব নোটস ওকে দিতাম। সে কথা জানলে বাবা আমাকে আস্ত রাখত না। ল' পাস করে টোটা এখন হাইকোর্টে যাতায়াত করছে। প্রশান্ত মল্লিকের জুনিয়র। তবে ও যে প্রকৃতির ছেলে, ল'ইয়ার হিসাবে কতটা সফল হবে আমার সন্দেহ আছে। ওর ছক এক বার আমি দেখেছিলাম। পঁয়তিশ বছরের পর ও পুরোপুরি আধ্যাত্মিক লাইনে চলে যাবে।

টোটার অবশ্য এখনই ওই লাইনে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু ও প্রতিজ্ঞা করেছে, জ্ঞাতিদের হাত থেকে ওর বাবার সম্পত্তি উদ্ধার না করা পর্যন্ত হাইকোর্ট যাওয়া ছাড়বে না। একই সঙ্গে আটটা মামলা ও চালাচ্ছে। মাঝেমাঝে সেই মামলার কথা ও আমায় বলে। মাঝে এক দিন বলল, গোয়াবাগানে একটা বাড়ি প্রায় হাতে এসে গেছে। বাড়িটা পেলে ও সেটা বিক্রি করে দেবে। সেই টাকায় পার করবে লালিকে।

আজ দুপুরে লাঞ্চ টেবল থেকে উঠে এসেই টোটাকে ফোন করেছিলাম। এতক্ষণে আসার সময় পেল। সারা বিকেলটা একা একা কাটিয়েছি। অন্য দিন ওই সময়টা ক্যারাটে ক্লাবে কাটাই। প্র্যাকটিসে কোথা থেকে সময় কেটে যায়, টের পাই না। খুবই বিরক্ত লাগছিল শুয়ে থাকতে। একটা সময় শেষে টিভি চালালাম। আমি বা টোটা কেউই এখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আর ডিসকভারি ছাড়া অন্য কোনও চ্যানেল দেখি না। টোটাই বারণ করে দিয়েছে। অন্য চ্যানেলগুলোতে এমন সব প্রোগ্রাম হয়, যা শরীর ও মনে উত্তেজনা ছড়ায়।

তাই এত দিন জানতামই না, টিভিতে দু'একটা চ্যানেলে ইদানীং জ্যোতিষচর্চা শুরু হয়েছে। চ্যানেল সার্ফ করতে করতে হঠাৎ দেখি, আমাদের শাস্ত্রীজি। পরনে লাল রঙের পাঞ্জাবি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দাড়িগোঁফ নিয়ে শাস্ত্রীজিকে বেশ সাধক সাধক দেখাচ্ছে। এক মিনিট পর্দায় চোখ রাখতেই বুঝতেই পারলাম, 'এখন ফোনে' বলে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। লোকে ফোন করে নানা সমস্যার কথা বলছে। আর শাস্ত্রীজি জন্মতারিখ আর গ্রহনক্ষত্রের পজিশন জেনে নিয়ে ফটাফট তার প্রতিকারের কথা বলে দিচ্ছেন। আরে বাহ্! জ্যোতিষশাস্ত্রটা এত সস্তা না কি? মিনিট পনেরো প্রোগ্রামটা

দেখে মারাত্মক হাসি পেয়ে গেল। লোকে জন্ম সময়টা বলছে না, দশা অন্তর্দশা জানাচ্ছে না। তা হলে? অত জোর দিয়ে শাস্ত্রীজি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন কী করে?

এ তো পরিষ্কার বুজরুকি! অবশ্য শাস্ত্রীজির মতো জ্যোতিষীর পক্ষেই সম্ভব। এক একটা প্রেডিকশন শুনে আমার হাসি পেতে লাগল। বরানগরের একজন মহিলাকে বললেন, আপনার কালসর্প যোগ আছে। এখনই প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন। সঙ্গেসঙ্গে অ্যাঙ্কর মেয়েটা বলল, শাস্ত্রীজির সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে চান, তা হলে প্রতি সোম, বুধ, শুক্র গড়িয়াহাটে, আর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি বিবেকানন্দ রোডে শাস্ত্রীজির চেম্বারে যেতে পারেন। আগে থেকে ফোনে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। দিনে দশজনের বেশি ক্লায়েন্ট উনি নেন না। ফোন নম্বরটা পর্দায় দেখে নিন।

দত্ত জুয়েলার্সের নামটা পর্দায় দেখে আমি নড়েচড়ে বসলাম। তা হলে এটা আমাদের দোকানের বিজ্ঞাপন। কে জানে, বাবা-ই টিভি-র টাইম স্লটটা কিনে শাস্ত্রীজিকে বসিয়েছেন কি না! অ্যাঙ্কর মেয়েটার দিকে এক নজর তাকাতেই মনে হল—একে আমাদের দোকানে এক দিন দেখেছি। হ্যাঁ, বেশ সেজেগুজে এসেছিল। মেয়েদের দিকে খুঁটিয়ে তাকানোর অভ্যাস আমার নেই। তবুও এই মেয়েটাকে আমার মনে আছে। শাস্ত্রীজিকে একেবারে গাছে তুলে দিচ্ছে। কেন জানি না মনে হল, যাঁরা ফোন করছেন—তাঁরা শাস্ত্রীজিরই চেনাশুনা। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। ভাবলাম, ফোন করে ভণ্ড লোকটার মুখোশ খুলে দিই। কিন্তু ঠিক তখনই টোটা এসে ঘরে ঢুকল।

টিভি বন্ধ করে বললাম, 'আসতে এত দেরি হল তোর?'

একটা চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসে টোটা বলল, 'কী করে আসব, বল? বোনকে নিয়ে বিকেলে থানায় যেতে হয়েছিল।'

লালির সেই মুম্বইয়ের ফোন। বললাম, 'কী বলল রে, পুলিশ?'

—বোনকে তো তুই জানিস। সঙ্গে গিয়ে আমি এমব্যারাসিং সিচুয়েশনে পড়ে গেলাম। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল, বোন উত্তরই দিতে পারে না। ওরা যা বোঝার বুঝে ফেলল। পুলিশকে মিসলিড করার অর্থ কী জানিস? পানিশমেন্ট হয়ে যেতে পারে।

—আমারও তাই মনে হয়েছিল। লালি ইয়াকুব বলে লোকটার কথা বানিয়ে বলেছে। কিন্তু ও লোকটার নাম জানল কী করে ?

—সেটা বাড়িতে ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলাম। ভাঙল না।

—লালি কিন্তু তোকে এক দিন মারাত্মক বিপদে ফেলে দেবে টোটা। মিথ্যে কথা বলা একটা রোগ।

—ঠিক বলেছিস। এই ক'দিন আগে কলেজের এক বন্ধুকে ও বলে এসেছে,

আমি না কি হাইকোর্টের জজ। সেই মেয়েটা আবার আমার সিনিয়রের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। স্যারের কাছে আমার কথা ও জানতে চেয়েছিল। কী বিশ্রী ব্যাপার বল তো? স্যার মনে হয়, মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। সে দিন হঠাৎ আমায় বললেন, ভাল ল'ইয়ার হতে গেলে রুদ্রনীল, নিজের ইমেজ ক্লিন রাখতে হবে।

—লালিকে তুই কিছু বললি না কেন?

—কী বলব? যখন জিজ্ঞেস করলাম, তখন বলল, আর ক'দিন পরে তো তুই জজ হবিই। কী হয়েছে, কথাটা আমি আগাম বলেছি বলে?

—তুই জজ হওয়ার পরীক্ষায় বসবি না কি?

—স্যার এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি পরীক্ষায় বসতে চাই কি না। বাড়িতে এসে আমি মাকে সেই কথাটাই বলেছিলাম। আর তা শুনে বোন চতুর্দিকে ওই সব বলে বেড়াচ্ছে। ছাড়, বোনের কথা। তোর মাথায় আজ যন্ত্রণা হয়-টয়নি তো?

—না রে, ঠিক আছি।

—আমাকে ডেকেছিস কেন?

বাবা, গিরিজাবাবু ও বুলবুলের কথা সব খুলে বললাম। শুনে টোটা উঠে দাঁড়াল। তার পর জানলার কাছে গিয়ে কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বরাবর দেখেছি, ও যখন কোনও ব্যাপারে গভীর চিন্তা করে তখন খুব শান্ত হয়ে যায়। কিছু ক্ষণ জানলার সামনে গিয়ে পায়চারি করে। তার পর ফিরে এসে ফের কথা বলতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। জানলার কাছ থেকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে টোটা বলল, 'কুন্তল, গৃহী অবস্থাতেও ঈশ্বরচিন্তা করা যায়। রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন। তা হলে তোর রাস্তা একটু বদলে যাবে, এই যা। আগে বল তো, তুই কী চাস?'

বললাম, 'এটা একটা প্রশ্ন হল?'

—হুঁ। বুঝতে পারছি, বিয়েতে তোর মত নেই। তা হলে এক কাজ কর। কাকাবাবুকে সেটা জানিয়ে দে।

—তোর মাথা খারাপ? বাবাকে তো তুই চিনিস।

—তুই যদি বলতে না পারিস, বউদিকে দিয়ে বলা।

—তাতে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না।

—কিন্তু সত্যিটাকে তো এক দিন না এক দিন ফেস করতেই হবে তোকে। সত্যি হচ্ছে, তুই সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে চাস। স্বামীজি কী বলে গেছেন, তোর মনে নেই? এই তো বেলুড়ে সে দিন পরমানন্দজি মনে করিয়ে দিলেন। সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। কত বড় কথা, ভাব তো? আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়, যখন ভাবি।

—কী করা যায়, বল তো ভাই। একটা ক্রাইসিসে পড়েছি।

চিন্তিত মুখে সোফায় এসে বসল টোটা। তার পর বলল, 'তুই তো ছকটক দেখতে জানিস। নিজের ছকটা এক বার দ্যাখ না। বিয়ের যোগ আছে কি না?'

—আজ দুপুরেই দেখেছি। আছে। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তার বাড়ি এক কিলোমিটারের মধ্যেই। বনেদি বাড়ির মেয়ে। গৌরবর্ণা, পানপাতার মতো মুখ হবে। স্বভাবে আমার ঠিক বিপরীত। কিন্তু ...

টোটা ভ্রু কুঁচকে তাকাল। তার পর বলল, 'কিন্তু কীসের?'

—যোগটা আছে ডিসেম্বর অবধি। এই সময়টা যদি কোনও রকমে পার করে দিতে পারি, তা হলে অন্তত তিনটে বছর নিশ্চিন্তে কাটানো যেতে পারে।'

—এ রকম হয় না কি?

—হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র তাই বলে। যাক সে কথা, ও সব কথা থাক। আমি এখন কী করি, তুই বল তো?

—বুলবুল... না কী যেন নাম মেয়েটার... তাকে জানিয়ে দে, তুই বিয়ে করতে চাস না।

—কোনও লাভ হবে তাতে? কথাটা তা হলে গিরিজাবাবুর মারফত ঠিক পৌঁছে যাবে বাবার কানে। একটাই উপায় আছে—এ বিয়েতে ভাঙচি দেওয়া।

—কীভাবে?

—সেটাই তো ভাবছি। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে সাপ মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। তুই সেই লাইনেই কিছু ভাব।

—একটা কথা বলব, কুন্তল? আমার মনে হয়, তা হলে লালির সঙ্গে এক বার আলোচনা করা উচিত। ওর সাংসারিক বুদ্ধিটা আমার থেকে বেশি। ঠিক একটা না একটা রাস্তা বের করে ফেলবে।

বিয়ে নিয়ে লালির সঙ্গে পরামর্শ করার ব্যাপারটা আমার ঠিক মনঃপূত হল না। লালিকে বিশ্বাস নেই। ভাঙচি দিতে গিয়ে ও হয়তো এমন একটা মিথ্যে কথা বলে বসবে যে, তখন হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। আরও একটা উপায় অবশ্য আছে। খোদ গিরিজাবাবুকেই জানিয়ে দেওয়া, আমার রোজগার টোজগার বলে কিছু নেই। বাবার চোখে আমি একটা অপদার্থ ছেলে। এই রকম একটা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অর্থ, মেয়েটার সর্বনাশ করা।

টোটা সোফায় বসে গালের নরম দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। দেওয়ালে ঝোলানো স্বামীজির ছবিটার দিকে তাকিয়ে। এটা ওর চিন্তায় ডুব দেওয়ার আর এক লক্ষণ। নিশ্চয়ই ভাবছে, স্বামীজি যদি এই সমস্যায় পড়তেন, তা হলে কী করতেন? আমি জানি, ও যখন সমস্যায় পড়ে, তখন নিজেকে স্বামীজির জায়গায় দাঁড় করায়।

স্বামীজি কী করতেন, সেটা আন্দাজ করেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা নেওয়ার চেষ্টা করে। ওর ঘরেও ঠিক এই রকম একটা ছবি আছে। একই দিনে আমরা স্বামীজির দুটো ছবি কিনেছিলাম, দক্ষিণেশ্বরের একটা দোকান থেকে। জোর করে দামটা দিয়েছিল টোটা। শুধু দামই দেয়নি, আমার ঘরে এসে এমন জায়গায় ছবিটা টাঙিয়ে দিয়ে গেছিল, যাতে রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই আমি স্বামীজির মুখটা দেখতে পারি।

নিচে বাবার ঘরে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক আছে। সেই ঘড়িতে ঢংঢং করে সাতটা বাজল। আওয়াজটা শুনে টোটা যেন বাস্তব জগতে ফিরে এল। এক বার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই ও বলল, 'এই রে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি উঠি। বাড়িতে একজন মক্কেলের আসার কথা আছে।'

ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে পড়লাম। এক বার ছাদে যাওয়া দরকার, আজ সারাদিনে এক বারও সিগারেট খাইনি। আমাদের বাড়িতে ছাদটা হল সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ওখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে ধূমপান করা যায়। ঘরের বাইরে বেরোতেই টোটা বলল, 'থাক, তোকে আর নীচে নামতে হবে না। দু'একটা দিন সময় দে আমায়। সমস্যাটা নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করি। তার পর একটা ডিসিশন নেওয়া যাবে।'

টোটা নিচে নেমে যাওয়ার পরই আমি ছাদে উঠে গেলাম। আমাদের ছাদে গোলাকার একটা ঘড়িঘর আছে। আগে সেই ঘড়ি ঠিকঠাক চলত। অনেক দিন হল, ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সেই ঘরে পায়রার বাসা। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। তাই উল্টো দিকের কার্নিশে এসে দাঁড়ালাম। নিচেই ট্রাম লাইন। ব্যস্ত চিৎপুর রোড। বাঁ দিকে চলে গেছে বাগবাজার পর্যন্ত। ডান দিকে জোড়াসাঁকো। বাঁ দিকে তাকিয়ে আমি আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালাম। আমাদের বাড়ি থেকে কোম্পানিবাগানটা দেখা যায়। চোখে পড়ল, বিরাট একটা প্যান্ডেল হয়েছে। চিৎপুরে প্রচুর দল যাত্রার। সবাই মিলে বছরের একটা সময় উৎসব করে। যাত্রার সেই উৎসবের জন্যই প্যান্ডেল কি না, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সিগারেটে দুটো টান মারার পরই পুরনো চিন্তাটা মনের মধ্যে ফিরে এল। বিয়ের চিন্তা। নাঃ, বিয়ে করার ইচ্ছে আমার একবিন্দুও নেই। কোনও রকমে ডিসেম্বর মাসটা কাটিয়ে দিতে হবে। একটা উপায় আছে, বাইরে কোথাও চলে যাওয়া। আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা দাদা আজ বলছিল বটে বাবাকে। কিন্তু বাড়ি থেকে কোথাও পাঠালে, আমি জানি, বাবা আমাকে পাঠাবে দেশের বাড়িতে। ব্যান্ডেলের কাছে। ওখানে গিয়ে আমার অন্তত কোনও লাভ হবে না। কেননা বাবা ফিরে আসতে বললেই আমায় সুড়সুড় করে ফিরে আসতে হবে। তার চেয়ে ভাল, বাড়িতে না জানিয়ে অনেক দূরে কোথাও হাপিশ হয়ে যাওয়া।

আমাদের বাড়ি থেকে কেউ কোনও দিন পালিয়ে কোথাও গিয়েছে বলে আমি কখনও শুনিনি। গেলে কার কী প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাই মনে মনে ভাবতে লাগলাম। মা কান্নাকাটি করে নিশ্চয়ই শয্যাশায়ী হবে। বউদিও ভীষণ কষ্ট পাবে। দাদা হয়তো খবরের কাগজে 'কুন্তল ফিরে আয়' বলে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ভাবলেও ভাবতে পারে। কিন্তু সেটা বাবার কাছে বলার সাহস পাবে না। বাবা অবশ্যই মারাত্মক চটবে আমার ওপর। গুম হয়ে বাড়িতে এমন ফতোয়াও জারি করতে পারে, 'ওই আহাম্মকটার নাম আমার সামনে কেউ করবেই না।'

সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, নাঃ, এ বাড়িতে আর থাকা চলবেই না। কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যাওয়াটাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তার চেয়ে এমন কিছু করা যাক, যাতে বাবা আমার ওপর খুব চটে। খুব দুর্ব্যবহার করে। তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। পালিয়ে যাওয়া আর অভিমানে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। কথাটা মাথায় ঢোকা মাত্রই সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিয়ে ফেললাম।

বেরিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক করে ফেলার পরই প্রশ্ন জাগল, কোথায় যাব? কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে উঠলে বাবা আমায় আর কোনও দিন বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। দরকার নেই। তা হলে আর কে আছে? ছাদে পায়চারি করতে করতেই হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলাম। মুম্বইয়ের পটেলভাই। হ্যাঁ, ওটাই আমাদের জায়গা। একমাত্র লোক, যার সঙ্গে বাবা খাপ খুলতে পারবে না। আমি গেলে পটেলভাই আদর করে রাখবে। অনেক বারই যেতে বলেছে। স্বচ্ছন্দে চার-পাঁচটা মাস মুম্বইয়ে কাটিয়ে আসা যায়।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলার পরই অন্ধকার ছাদে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, ইয়েস। দ্যাট ইজ দ্য প্লেস। সঙ্গেসঙ্গে ছক কষে ফেললাম। নীচে গিয়ে আগে পাঁজিটা দেখা দরকার। একটা ভাল সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এর পরের কাজ গীতাঞ্জলিতে একটা টিকিট কেটে ফেলা। হাজার পাঁচেক টাকা সঙ্গে নেওয়া দরকার। সে টাকা অবশ্য জোগাড় হয়ে যাবে, হাতের আংটি আর গলার সোনার চেন বিক্রি করে দিলেই। টাকাটা বউদির কাছে চাইলে হয়তো দিয়ে দিত। কিন্তু তা হলে জানাজানির একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থেকে যাবে। বউদির কাছে আমি অন্তত মিথ্যে বলতে পারব না। আমি মিথ্যা কথা বলিই না। গত বারো বছর আমি কখনও কোনও মিথ্যে কথা বলিনি। এখন আমার একটাই কাজ, বাবার বিরাগভাজন হওয়া। কীভাবে সেটা হওয়া যায়, ভাবতে লাগলাম। মাথাটা পরিষ্কার কাজ করছে। এখনই সব ভেবে ফেলা দরকার। মাথার সেলাইটা কাটতে দিন সাতেক সময় নেবে। এই ক'দিন বাড়ি থেকে বেরনো যাবে না। কিন্তু যা কিছু প্ল্যান এই

সময়েই করে ফেলতে হবে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে হল, গিরিজাবাবুর সঙ্গে বাবার একটা ঝামেলা লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? একটা কারণ তো আছেই। সেই নীলা ধারণের পরামর্শটা? গিরিজাবাবুকে যদি বলি, বাবার জ্যোতিষী আপনার ক্ষতি করার জন্যেই আপনাকে নীলা ধারণ করতে বলেছে, তা হলে ভদ্রলোকের মনে একটা সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। এই সব বয়স্ক লোকেরা এমনিতেই খুব সন্দেহপ্রবণ হন।

কথাটা মনে হওয়া মাত্রই নিজেকে গুছিয়ে নিলাম। তার পর নীচে নেমে এলাম। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়েই মনে পড়ল, এই রে, ভদ্রলোকের ফোন নম্বর তো আমার কাছে নেই।

পাঁচ

আজ দুদিন হল, বাবা আমার সঙ্গে কথা বলছে না। বাবার সঙ্গে এমনিতে আমি আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাই না। আমার সঙ্গে কথা বললে তবে উত্তর দিই। এবং সেই কথাবার্তার বেশির ভাগটাই হয় দোকানে। এখনও আমার মাথায় চোটের সেলাই কাটা হয়নি। তাই দোকানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এই দুদিনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অথবা নামতে, যখনই বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে, দেখলাম বেশ রাগ রাগ মুখ। দশ দিন আগে এই ব্যাপারটা হলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আজ হচ্ছে না। বাবা আমার ওপর রেগে যাক, আমি এটাই চাইছিলাম। তা হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে আমার সুবিধা হবে। মনে হয়, আমার প্রথম চালটা কাজে লেগে গেছে।

আজ সকালে জলখাবার দিতে এসে বউদি অনেক ক্ষণ আড্ডা মারল আমার সঙ্গে। কথা বলতে বলতে একটু মন খারাপও হয়ে গেছিল। ইস, আমার এত ভাল বউদিটাকে ছেড়ে মুম্বই চলে যেতে হবে? তখনই হঠাৎ বউদি জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বলো তো ভাই? আজ তোমার কথা উঠতেই বাবা কেন গুম মেরে গেলেন?'

উত্তরটা জানি না। তাই আমি তখন চুপ করে রইলাম।

বউদি ফের বলল, 'ভাই, বাবার সঙ্গে তোমার কি কিছু হয়েছে?'

বললাম, 'না তো।'

'লাঞ্চ করার সময় তোমার দাদা এক বার জিজ্ঞেস করল টুম্পাইয়ের ব্যাপারে কী ঠিক করলে? মানে.... তোমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। বাবা তখন কোনও কথাই বললেন না। একটু চুপ করে থেকে তার পর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।'

'বাবাকে তুমি জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

'সুযোগ পাচ্ছি না।'

'তাহলে সুবিধা মতো জানতে চেও।' কথাটা বলেই আমি ওমলেটে কামড় দিলাম। তার পর কয়েক বার চিবিয়ে নিরাসক্ত ভাবে বললাম, 'বাবা কী বলল, আমায় কিন্তু জানিও।'

বউদির চোখে সন্দেহ। এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার কে জানে? এই সে দিন হঠাৎ তোমার বিয়ে নিয়ে মেতে উঠল। তার পর আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। ভাবছি, গিরিজা কাকাবাবুকে আমি এক বার নিজেই ফোন করব।'

'ভদ্রলোককে তুমি চেনো?'

'চিনব না কেন? উনি তো আমার পিসির শ্বশুরবাড়ির তরফের রিলেটিভ হন।'

'তাহলে বলে দাও, মেয়েকে যেন জলে না ফেলেন,'

'কেন? এ বিয়েতে কি তোমার মত নেই?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'ওহ, কথাগুলো তাহলে তোমারও কানে গেছে?'

শুনেছি আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, 'কী কথা?'

'এই যে... বুলবুল ওদের পাড়ারই একটা মারোয়াড়ি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে।'

'তুমি শুনলে কোত্থেকে?'

'লালির মুখে। টোটা যে-দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সে-দিন ওর সঙ্গে লালিও এখানে এসেছিল। কথায় কথায় বুলবুলের প্রসঙ্গ উঠল। বেথুন কলেজে তো ওরা একসঙ্গেই পড়ে। লালি বলে গেল, প্রায় দিনই না কি হেদোর সামনে মারুতি নিয়ে এসে ওই ছেলেটা ওয়েট করে বুলবুলকে তুলে নিয়ে যায়।'

লালি বলেছে, শুনে আমার মারাত্মক হাসি পেল। ডাহা মিথ্যে কথা। আমি জানি। ও যা বলে আমি ঠিক তার উল্টোটা ধরে নিই। তার মানে বুলবুল মেয়েটা খুবই ভাল। কিন্তু বউদিকে সেটা জানিয়ে আমার কোনও লাভ নেই। লালি অর্ধেক কাজ করে দিয়ে গেছে। আমি যা চাই, তার বাকি অর্ধেকটা করে দেবেন গিরিজাবাবু।

'ভাই, তুমি এই খবরটা জানতে?'

মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস আমার নেই। তাই মুচকি হাসলাম। বউদি যা বোঝার বুঝে নিক। তার পরই ওমলেটে মন দিলাম। আমার তরফে বিয়ের আলোচনায় আর কোনও উৎসাহ না পেয়ে বউদি উঠে পড়ল। যাওয়ার আগে শুধু একটা কথাই বলে গেল, 'প্রেম করার কথা কাকাবাবু যদি জানতে পারেন, তাহলে

কিন্তু ওকে গলা টিপে মেরে ফেলবেন।'

সকালে সেই যে বউদি নেমে গেল, তার পর থেকে আর ওপরে উঠে আসেনি। পাছে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাই আমিও নীচে নামিনি। এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। এ বার চান করতে যাওয়া দরকার। মাথায় চোট পাওয়ার পর থেকে এই তিন দিন আমি চান করিনি।। মাথায় জল দেওয়ার প্রশ্ন নেই। জ্বর-টর হয়ে যাওয়ার ভয়ে গায়ে সাবানও দিইনি। সারা গা ভাল করে শুধু স্পঞ্জ করে নিচ্ছি। আলনা থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে চানঘরে ঢুকে পড়লাম। তেতলায় এই চানঘরটা বানানো হয়েছিল আমার ঠাকুরদার জন্য। তখন ঠাকুরদা তেতলাতেই থাকত। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর আমি একতলা থেকে তেতলায় উঠে এসেছি। তাই এই চান ঘরটা এখন আমার জন্য বরাদ্দ। এখানে একটা খুব সুন্দর বাথটব আছে। অনেক দিন আগেকার। শ্বেতপাথরে কারুকার্য করা। পার্ক সার্কাসের কোনও এক সাহেবের বাড়ির জিনিসপত্তর নিলাম হচ্ছিল। ঠাকুরদা না কি তখন কিনে এনেছিল।

চানঘরের দরজা বন্ধ করে আমি পাজামা আর পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললাম। নিয়মিত ব্যায়াম করি বলে আমার শরীর বেশ পেশীবহুল। সপ্তাহে চার দিন ম্যাসাজ করাই। ক্যারাটে প্রাক্টিস করার পর আমাকে ম্যাসাজ করে দেয় গবা বলে একটা ছেলে। রোজ কুড়ি টাকা করে নেয়। একেবারে ফেদার টাচ। ছেলেটার হাত এত ভাল যে, শরীর খুব ঝরঝরে লাগে। তিন দিন ক্লাবে যাইনি বলে, কাল গবা খোঁজ করতে এসেছিল। ওরা জানতই না ডাকাত ধরতে গিয়ে আমার এই অবস্থা হয়েছে।

শাওয়ার খোলার আগে আমি ল্যাঙট খুলে নিলাম। আন্ডারওয়ার বলতে আমি আগে পরতাম জাঙ্গিয়া। এখন পরি ল্যাঙট। এখন ল্যাঙট পরার চল উঠে গেছে। কিন্তু টোটা বলার পর থেকে আমি ল্যাঙট ব্যবহার করি। সাধু-সন্ন্যাসীরাও না কি করেন। কীভাবে ল্যাঙট পরতে হয়, সেটা টোটাই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। ল্যাঙট পরলে না কি বীর্যবান হওয়া যায়। আর ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য অতি অবশ্যই আমাদের বীর্য রক্ষা করা দরকার। চান করার আগে আমি রোজই নিজের হাতে যত্ন করে ল্যাঙট কাচি। তার পর চানঘরের জানালার সামনে হ্যাঙারে সেটা শুকিয়ে নিই। ভুল করে এক বার ছাদে ল্যাঙট শুকোতে দিয়েছিলাম। বউদির চোখে পড়ে যায়। মনে হয়, আগে কোনও দিন দেখেনি। বউদি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'এটা কী গো ভাই?' লজ্জায় আমি কোনও কথা বলতে পারিনি। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছিলাম। তার পর থেকে ল্যাঙটের ব্যাপারে আমি খুব সাবধান।

ল্যাঙট কেচে হ্যাঙারে টাঙিয়ে দেওয়ার পর শাওয়ারটা খুলে শরীর ভেজাতে লাগলাম। ঠান্ডা জল কাঁধ বেয়ে নামার সঙ্গেসঙ্গে শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে সাবানদানি থেকে সাবান নিতে গিয়ে দেখলাম নেই। আমি আবার গন্ধওয়ালা

দামি সাবান গায়ে মাখি না। টোটা বলেছে, সুগন্ধী মানুষের কাম প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এই বয়সে কৃচ্ছ্র সাধন করা দরকার। ও লাইফবয় সাবান ব্যবহার করে, দেখাদেখি আমিও। সত্যি টোটার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।

চান করতে করতেই হঠাৎ আমার বুলবুলের কথা মনে হল। বেচারা। এ বাড়িতে বউ হয়ে ঢোকার যা-ও সম্ভাবনা ছিল, সেটা ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেছে লালি। সত্যি কথাটা বউদিকে আমি বলে দিতে পারতাম। তা হলে বুলবুল হয়তো ভাল মেয়ে হয়ে থাকত, কিন্তু বাঁশ হয়ে যেত আমার। একটা মেয়েকে সারাজীবন ঘাড়ে বইবার কোনও মানে হয় না।

সত্যি কথা বলার খেসারত আমাকে আরও অনেক দিতে হয়েছে। কী আর করা যাবে? এটা একটা ব্রত হিসাবে নিয়েছি, বারো বছর আগে আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তারই রেশ আমি টেনে যাচ্ছি। তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। সে দিন দুপুরে কী একটা কারণে স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছিল। বাড়িতে না ফিরে আমি বিবেকানন্দ রোডের দোকানে গেছিলাম। গিয়ে দেখি, ঠাকুরদার সামনে লম্বা-চওড়া এক সাধু বসে। মাথায় জট, মুখে ছাইমাখা। গলায় বড় একটা রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ে নতুন একটা কম্বল জড়ানো।

গঙ্গাসাগরের সময় আমাদের অঞ্চলে প্রচুর সাধুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায়। মারোয়াড়িদের বাড়িতে তারা আসা-যাওয়া করে। অনেক সময় দোকানে দোকানেও টাকা চাইতে আসে। কিন্তু ঠাকুরদার সামনে বসা সাধুবাবাকে দেখে একটা অনরকম মনে হয়েছিল। আমাকে দেখেই সাধুবাবা হিন্দিতে বললেন, 'আয় বেটা, আমার কাছে বোস।'

কাছে যেতেই আমার মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুজে সাধুবাবা বিড়বিড় করতে লাগলেন। তার পর চোখ খুলে ঠাকুরদাকে বললেন, 'এটা তোর কে হয় রে?'

'আমার নাতি।'

'ভাল ছেলে। তোর বংশের নাম ও ছেলেই উজ্জ্বল করবে।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন বাবা।'

'আমি করার কে?' ওপরের দিকে হাত তুলে সাধুবাবা বললেন, 'এ ছেলের ওপর স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে।'

আগে কখনও সাধুবাবাকে দোকানে দেখিনি। ঠাকুরদার সঙ্গে পরিচয় হল কী করে সেটা বুঝতে পারছিলাম না। ঠাকুরদা বেশ সম্মান করেই কথা বলছে। তার মানে ভণ্ড সাধু নন। ভণ্ড হলে ঠাকুরদা তাঁকে দোকানেই ঢুকতে দিত না। সাধুবাবার গা দিয়ে চন্দনের গন্ধ বেরচ্ছে। খুব কাছে বসে থাকার জন্য সেটা টের পাচ্ছিলাম। সাধুবাবা ভগবানের কথা বলতে শুরু করলেন। অর্ধেক কথাই আমার মাথায় ঢুকছিল

না। ঢোকার মতো বয়সও অবশ্য তখন আমার হয়নি।

কথা বলতে বলতেই হঠাৎ সাধুবাবা আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'এই কেটা, তুই একটা ব্রত রাখতে পারবি?'

বললাম, 'কী?'

'বারো বছর ধরে কিন্তু সেটা পালন করতে হবে।'

'কেন?'

'তা হলে তোর মধ্যে একটা আশ্চর্য শক্তি জন্মাবে। তুই ভালমন্দ বুঝতে পারবি। কোন লোক ভাল, কোন লোক মন্দ...। তখন তুই মুখ দিয়ে যা বলবি, সব অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে।'

তা হয় না কি? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় আমি। বললাম, 'ব্রতটা কী?'

'এই বারোটা বছর তোকে সত্যি কথা বলতে হবে। যত কঠিন অবস্থাতেই পড়িস না কেন। ভগবান তোকে বার বার পরীক্ষায় ফেলবেন। তবুও, তুই মিথ্যে কথা বলবি না। কী রে পারবি?'

আমি হ্যাঁ কি না বলব...বুঝতে পারছিলাম না। ঠাকুরদার দিকে চোখ যেতে দেখলাম, আমাকে হ্যাঁ বলতে বলছে। সঙ্গেসঙ্গে আমি ঘাড় নেড়ে দিলাম।

খুব খুশি সাধুবাবা। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস বেটা। আমি এটাই আশা করেছিলাম। তোকে একটা কথা শিখিয়ে দিই। যদি কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়িস, সত্যি কথাটা বলতে পারছিস না, তাহলে তখন চুপ করে থাকবি। কখনও মিথ্যে বলবি না। এক বার মিথ্যে কথা বললেই, তোর শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ফের বারো বছর তোকে এই ব্রত পালন করতে হবে। খুব কঠিন বেটা, খুব কঠিন।'

সে দিন কিছু না ভেবেই ফের ঘাড় নেড়েছিলাম।

সাধুবাবা বললেন, 'আজ তোকে একটা জিনিস দিয়ে যাব। সেটা তুই কোমরে বেঁধে রাখবি। বারো বছর পর আমি আবার ফের আসব। তোর এই ঠাকুরদা কিন্তু তখন থাকবে না। বেটা, তখন আমাকে চিনতে পারবি তো?'

বললাম , হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাহলে আজ আমি উঠি।' বলেই শূন্যে দু'বার হাত ঘুরিয়ে ডান হাত মুঠো করেছিলেন সাধুবাবা। তার পর মুঠো খুলে আমাকে একটা মাদুলি দিয়েই উঠে পড়েছিলেন।

দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে। উঠে দাঁড়িয়েই সাধুবাবা 'ব্যোমশঙ্কর' বলে একটা হুংকার ছেড়েছিলেন। তার পর দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেছিলেন দরজার দিকে। হুংকার শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। কাচের দরজা ঠেলে সাধুবাবা বেরনোর পরই ঠাকুরদার হুঁশ হয়েছিল, ওঁকে প্রণামি দেওয়া হয়নি। আমার হাতে একটা একশো

টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিল, 'শিগগির যা, বাবাকে এই টাকাটা দিয়ে আয়।'

দৌড়ে দরজার বাইরে গিয়ে দেখি, কোথায় সাধুবাবা। কেউ নেই। সাধুবাবা কোত্থেকে এসেছিলেন, চোখের নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেছিলেন, এখনও আমার কাছে সেটা রহস্য। পরে অনেক সময় মনে হয়েছে, সত্যিই কি সাধুবাবা সে দিন এসেছিলেন? না এলে আমার কোমরে বাঁধা মাদুলিটা পেলাম কী করে? বারোটা বছর আমি ব্রত পালন করেছি। সত্যি বলতে কী, এখন লোক দেখলেই চিনতে পারি। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে দেয়। এই দোকানের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামা কয়েকটা ছেলেকে দেখেই সে দিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, খারাপ উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে, সেটাও ওই শক্তির জন্য। সাধুবাবার কথা একমাত্র জানত ঠাকুরদা। এই কিছু দিন আগে জানিয়েছি টৌটাকে।

...চান শেষ করে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আমি বেরিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি, মতি। বলল, 'ছোটবাবু, পুলিশ এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। কী, ওপরে নিয়ে আসব?'

নিশ্চয়ই পোস্তা থানার ও সি প্রকাশ বিশ্বাস। কাল সন্ধেবেলায় ভদ্রলোককে এক বার ফোন করেছিলাম। ডাকাতদের সম্পর্কে খবর নেওয়ার জন্য। কিন্তু তখন উনি সোনাপট্টিতে রাউন্ডে গেছিলেন। সেকেন্ড অফিসারকে বলে রেখেছিলাম, ও সি ফিরলেই যেন আমাদের বাড়িতে ফোন করেন। কাল রাতে হয়তো ফোন করার সময় পাননি। আজ নিজেই চলে এসেছেন।

মতি দাঁড়িয়ে আছে আমার উত্তর শোনার জন্য। ভদ্রলোককে ওপরে ডেকে নিলে ভাল হত। কিন্তু মন বলল, বাবা নাও পছন্দ করতে পারে। বাড়িতে মেয়েরা আছে। পুলিশকে অন্দরমহলে ডেকে আনাটাই তখন আমার অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে নীচের বৈঠকখানায় বসে কথা বলাই উচিত। মতিকে বললাম, 'লোকটাকে ওয়েট করতে বলো। আমি ড্রেস করে নামছি।'

নীচে নেমে দেখি, প্রকাশ বিশ্বাস নন, সোফায় বসে অচেনা এক ভদ্রলোক। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার কুন্তলবাবু। আমি দিব্যেন্দু পাল। ডি ডি থেকে এসেছি।

ডি ডি... মানে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। শুনে একটু অবাকই হলাম। ডাকাতির তদন্ত করছে পোস্তা থানা। লালবাজার থেকে ডিটেকটিভ আসার দরকার কী? উল্টো দিকের সোফায় বসে বললাম, 'বলুন'।

ডাকাতির প্রসঙ্গই তুললেন না দিব্যেন্দুবাবু। বৈঠকখানা ঘরের চার পাশে এক বার নজর বুলিয়ে বললেন, 'আমি...এই কাছেই রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটে থাকি। শুনেছি, আপনার পরিবার খুব বনেদি। বাড়িতে ঢুকে দেখছি, যা ভেবেছিলাম, তার

চেয়েও বেশি। এই স্ট্যাচু, ফ্ল্যাওয়ার ভাস, ফার্নিচার, আয়না...এগুলো যে এত দিন আপনারা প্রিজার্ভ করে রেখেছেন, তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

শুনে মুচকি হাসলাম। এ সব প্রশংসা করার জন্য নিশ্চয়ই ভদ্রলোক আসেননি। কী জন্য এসেছেন, সেটা আগে শোনা দরকার। তাই চুপ করে রইলাম। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আট ফুট বাই ছয় ফুট একটা আয়না আছে। বেলজিয়াম কাচের, ফ্রেম বার্মিজ টিক-এর। মাথার দিকে খুব সুন্দর কারুকাজ করা দুটো পরি আছে। সে দিকে তাকিয়ে দিব্যেন্দুবাবু বললেন, 'এই আয়নাটা মার্বেল প্যালেসেও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। রাজেন মল্লিকরা আমাদের রিলেটিভ হন। ওঁদের বাড়িতেও এ রকম একটা আয়না আছে। আমার ঠাকুরদা আর রাজেন মল্লিক একই সঙ্গে আয়না দুটো কিনেছিলেন।'

'খুব সুন্দর জায়গায় আয়নাটা রেখেছেন কিন্তু আপনারা। সদর দরজা দিয়ে কে ঢুকছেন বা বেরোচ্ছেন, সেটা এখান থেকে বসেই মনিটর করা যায়।' শুনে মনে মনে তারিফ করলাম ভদ্রলোকের। ঠিকই ধরেছেন। আয়নাটা বৈঠকখানা ঘরে ওই কারণেই রাখা হয়েছে। 'যাক গে, যে কারণে এলাম, আগে সেটা নিয়েই কথা বলি। এর মধ্যে আপনি কি আর কোনও থ্রেট কল পেয়েছেন ফোনে?'

'ডাকাতদের কাছ থেকে? না তো।'

'আপনার বাড়ির অন্য কেউ?'

'না। পেলে নিশ্চয়ই শুনতাম।'

'আশ্চর্য। আপনার বাবা আপনাকে কিছু বলেননি?'

'না। কী হয়েছে বলুন তো?

'পরশু দিন উনি আমাদের সি পি-র সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দুজনের মধ্যে কী কথা হয়েছে, আমি জানি না। আপনার বাবার আশঙ্কা, ডাকাত দলের কেউ আপনার ওপর হামলা করতে পারে। কাল থেকে আপনাদের বাড়ির সামনে দুজন ওয়াচারকে রেখে দিয়েছি। আপনার সিকিউরিটি দেখার দায়িত্ব আমার।'

বাবা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছে শুনে সঙ্গেসঙ্গে সর্তক হয়ে গেলাম। সি পি সুহাস সেনের সঙ্গে বাবার খুব হৃদ্যতা আছে। দাদার বউভাতে সি পি নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন। কিন্তু কী এমন হল, বাড়ির কাউকে না জানিয়ে বাবা লালবাজারে দৌড়ল? নিশ্চয়ই গত দু-তিনদিনে এমন কিছু ঘটেছে, যার জন্য বাবা খুব ডিস্টার্বড। সেই কারণেই হঠাৎ গুম মেরে গেছে। নাহ দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে খুব সাবধানে কথা বলতে হবে।

দিব্যেন্দুবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কথাটা শোনার পর আমার

মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হল কি না, তা লক্ষ করছেন। সেটা বুঝেই বেপরোয়াভাবে বললাম, 'আপনি ফালতু সময় নষ্ট করছেন। আমার সিকিউরিটির কোনও প্রয়োজন নেই। কেউ আমার ওপর হামলা করতে আসবে না।'

'যা ভাবছেন, তা নয় কুন্তলবাবু।' দিব্যেন্দুবাবু বললেন, 'কাল রাতে মুম্বই পুলিশ আমাদের অ্যান্টি রাউডি সেকশনকে জানিয়েছে, ওখান থেকে ইয়াকুব নামে একজন নটরিয়াস ক্রিমিনাল আজ সকালে কলকাতায় আসছে। এই লোকটার সঙ্গে আর্মস ডিলারদের ভাল যোগাযোগ আছে। লোকটার ওপর নজর রাখার জন্য মুম্বই পুলিশ আমাদের রিকোয়েস্ট করেছে। আমাদের ধারণা, এই লোকটাই... আপনাদের বাড়িতে সে দিনই থ্রেট কল করেছিল।'

দিব্যেন্দুবাবুর কথা শুনেই, বুকের ভেতরটা যেন হঠাৎ খালি হয়ে গেল। লালি সে দিন যা বলেছিল, তাহলে সেটা সত্যি।

ছয়

পটেলভাই... হ্যাঁ, একমাত্র পটেলভাই-ই পারেন এই সংকট থেকে আমাকে আর আমার বাড়ির লোকেদের উদ্ধার করতে। সারাটা দুপুর ভেবে শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। মুম্বইয়ে পটেলভাইয়ের অনেক ক্ষমতা। প্রশাসনে যেমন যোগাযোগ আছে, তেমনই আন্ডারওয়ার্ল্ডে। উনি নিশ্চয়ই ইয়াকুবকে চিনবেন।

পটেলভাইয়ের ফোন নম্বর আমার মোবাইল সেট-এ রাখা আছে। তেতলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি মোবাইলেই পটেলভাইকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু যত বারই করি, শুনি ওঁর সেট সুইচ অফ করা আছে। হয়তো কোনও মিটিংয়ে ব্যস্ত। কোটি কোটি টাকার ব্যাবসা চালান। ব্যস্ত থাকতেই পারেন। বার পাঁচেক চেষ্টা করে শেষে একটা ভয়েস মেল করে দিলাম। যাতে গলা শুনে সঙ্গেসঙ্গে উনি আমাকে ফোন করেন।

দিব্যেন্দুবাবু যাওয়ার আগে বাড়িতে প্যানিক সৃষ্টি করে গেছেন। আমাদের সারা বাড়িতে ছোটবড় মিলিয়ে ছেচল্লিশটা জানলা-দরজা। দিব্যেন্দুবাবুর নির্দেশে সব ক'টাই এখন বন্ধ। যে-কোনও জায়গা থেকে না কি গুলি ছুটে আসতে পারে। আমার ছাদে যাওয়া বন্ধ। বারান্দায় দাঁড়ানোও। দিব্যেন্দুবাবু বলে গেছেন, কোনও অচেনা লোককে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেওয়া চলবে না। মাত্র দু'একটা দিন। আমাকে ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হবে। এর মধ্যেই ইয়াকুব লোকটাকে না কি ওঁরা ধরে ফেলবেন।

অনেক ভাবা সত্ত্বেও দুটো ব্যাপার এই ক'দিন আমার মাথায় ঢুকছিল না। এক, মুম্বই থেকে ইয়াকুবরা কেন আমাদের দোকানটাকেই টার্গেট করল?

দুই, আমার ওপর হঠাৎ ওদের রাগ হল কেন? দিব্যেন্দুবাবু দুটো প্রশ্নেরই

উত্তর দিয়ে গেছেন। পুলিশ কাস্টডিতে মারের মুখে একজন ডাকাত না কি বলেছে, জামনগরের মহারানির একটা অতি মূল্যবান হিরে কয়েক হাত ঘুরে কয়েকদিন আগেই আমাদের দোকানে এসেছে। মূল্যবান বলতে, দামে নয়, অ্যান্টিক ভ্যালুর দিক থেকে। ওই হিরেটা না কি রানি ভিক্টোরিয়া বহু বছর আগে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন জামনগরের রাজবংশের কোনও একজনকে। সেই হিরেটাই ইয়াকুবের চাই। দাম প্রায় তিন কোটি টাকা।

রানি ভিক্টোরিয়া সেই সময় নেটিভ কোনও রাজাকে হিরে উপহার দেবেন, এই গল্পে আমি বিশ্বাস করিনি। ওঁরা তখন পেতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ইংরেজ আমলে ভারত থেকে যে কত মূল্যবান রত্ন তখন ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে গেছে, তার কোনও হিসেব নেই। অ্যান্টিক ভ্যালু বাড়ানোর জন্য জামনগরের হিরের গল্প কেউ বানিয়েছে। হিরে ব্যবসায় এটা খুব হয়। দালালদের হাতে হিরে ঘোরে বলে প্রচুর প্রতারণার ঘটনাও ঘটে। আমি নিজে এক বার বাবাকে বাঁচিয়েছিলাম। নকল হিরেকে আসল বলে চালাতে এসেছিল সুরাতের এক দালাল। গল্প করেছিল, ভাবনগরের রাজবাড়ির লোকেরা বিক্রি করার জন্য দিয়েছে। হিরেটা না কি ঔরঙ্গজেব এক সময় ব্যবহার করতেন। নকল বোঝার পর দালালকে আমি হিরেটা ফেরত দিয়ে দিই। বলি, অত দাম দেওয়ার সামর্থ আমাদের নেই।

দিব্যেন্দুবাবু বলে গেলেন, 'আপনার ওপর ইয়াকুবের রাগ হয়েছে কেন জানেন? সে দিন ডাকাতির সময় আপনি যাকে ধরেছিলেন, সেই ছেলেটা ওর শালা...মানে ওর তৃতীয় বউয়ের ভাই। এই ছেলেটার ফিল্ড অব অপারেশন গাজিয়াবাদের দিকে। বেচারা ভাবতেই পারেনি, কলকাতাতেও মরদের বাচ্চা আছে।'

বলেই দিব্যেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। আমিও পাল্টা হাসলাম। প্রশংসা শুনলে কার না ভাল লাগে! ইয়াকুব সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহে বললাম, 'ছেলেটার নাম কী বলুন তো?'

—জামাল। তিন তিনটে বউ থাকা সত্ত্বেও ইয়াকুবের নিজের কোনও ছেলেপুলে নেই। জামালকে ও ছেলের মতো দেখে। মুম্বই পুলিশের ধারণা, ইয়াকুবের সাম্রাজ্য ভবিষ্যতে ওই জামালই না কি চালাবে। ও ধরা পড়েছে শুনে মুম্বই পুলিশের দু'জন এখানে আসার জন্য রওনা হয়েছে। ইন্টারোগেশন করতে চায়।

—ইয়াকুব আসলে করে কী?

—আগে ও দাউদ ইব্রাহিম আর বলিউডের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের লিয়াজোঁর কাজ করত। ভরত শাহ-র কেসটার পর ওই লাইন থেকে সরে গেছে। এখন ওর ফিল্ড অফ অপারেশন জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি লাইন। সেই সূত্রেই ইললিগাল আর্মস ডিলারদের সঙ্গেও দোস্তি। বিরাট ব্যাপার। বাড়িতে আমার

সিকিউরিটির ব্যবস্থা সেরে দিব্যেন্দুবাবু বেলা একটার সময় চলে যাওয়ার পরই মা আর বউদি ওপরে উঠে এসেছিল। ভেবেছিলাম, মা খুব ঘাবড়ে যাবে। আশ্চর্য, মা কিন্তু বলল, 'তোর কিচ্ছু হবে না। মাথার ওপর রাধেশ্যাম জিউ আছেন। কেউ তোর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

মায়ের কথা শুনে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। মাকে বরাবর আমি ভিতু বলে জানি। বাবার ভয়ে সব সময় কাঁটা হয়ে থাকা মানুষ। তার মধ্যে যে এতটা সাহস আছে, কোনও দিন টেরই পাইনি। ইয়াকুব লোকটা কে, কতটা খতরনাক, সে সম্পর্কে মায়ের কোনও আন্দাজ নেই। আন্দাজ থাকলে রাধেশ্যাম জিউর ওপর ভরসা করত কিনা সন্দেহ। আমার মা বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনও খবরই রাখে না। কাগজ পড়ে না, টিভি-তে উত্তম-সুচিত্রার বই ছাড়া আর কিছু দেখে না। মা কোনও দিন খিলাত ঘোষ লেন দিয়ে হেঁটে কোথাও যায়নি। মায়ের জগৎ আমাদের সুবর্ণ বণিক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শুনেছি, নকশাল আমলে হাত-কাটা অমল নামে এক বিপ্লবী বাবার কাছে তোলা তুলতে এসেছিল। বাবা তখন বাজারে। সেই হাত কাটা অমলকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে মা সন্দেশ আর রসগোল্লা খাইয়েছিল। মা না কি জানতই না, নকশাল কাকে বলে!

আমাদের মাথার ওপর যে কেউ একজন আছেন, আমিও অবশ্য সেটা বিশ্বাস করি। তবে তিনি মায়ের রাধেশ্যাম জিউ কি না, জানি না। জ্যোতিষশাস্ত্র শেখানোর সময় নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রায়ই আমাকে একটা কথা বলতেন, 'তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটবে—তা সব আগে থেকে ঠিক করা আছে।.ওপরে একজন আছেন, যিনি তোমার জীবনের চিত্রনাট্য আগেই সব লিখে রেখেছেন। একচুল এ দিক ও দিক হওয়ার উপায় নেই বাবা।' নকুলেশ্বরবাবুর এই কথাগুলো যে কতটা সত্যি, তা তো আমি জানি। লোকের কোষ্ঠীবিচার করার সময়ই তা টের পাই। চোখের সামনে আমি তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।

মা আর বউদি নিচে নেমে যাওয়ার পরই মোবাইলটা বেজে উঠল। সুইচ অন করতেই ও প্রান্তে পটেলভাইয়ের গলা, 'গডব্রাদার, বলো জরুরি তলব কেন?'

জ্যোতিষীগিরি করে বেশ কয়েকবার পটেলভাইকে আমি বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। তাই আমাকে উনি গডব্রাদার বলে ডাকেন। অনেক দিন পর ওঁর গলাটা শুনে ভাল লাগল। বললাম, 'আপনি এখন কোথায়?'

—মুম্বই এয়ারপোর্টে। এই মাত্র সুরাতের প্লেন থেকে নামলাম।

—একটা প্রবলেম হয়েছে। বলেই খুব সংক্ষেপে ডাকাতি আর ইয়াকুবের কথা বললাম। শুনে পটেলভাই খুব হাসতে লাগলেন। তার পর বললেন, 'তুমি এক কাজ করো গডব্রাডার, ফার্স্ট অ্যাভেলেবল ফ্লাইটে তুমি মুম্বই চলে এসো। তোমার

ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার দায়িত্ব আমার।'

বললাম, 'বাড়ি থেকে বেরনোর উপায়ই নেই। যাব কী করে?'

—সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। কলকাতায় আমার প্রচুর লোক আছে। তোমাকে সেফলি এখানে আমার কাছে পৌঁছে দেবে।

—আপনি ঠাট্টা করছেন পটেলভাই?

—আরে না না। তুমি আমার গডব্রাদার। তোমাকে বাঁচিয়ে না রাখলে তো আমি নিজেই মরে যাব ভাই। আসলে তোমাকে আমার খুব দরকার।

—কেন, আপনার আবার কী হল? এখন তো আপনার সময় খুব ভাল। আগামী সাড়ে চার মাস আপনি যাতে হাত দেবেন, সব সোনা হয়ে যাবে।

—ঠিক বলছ তো ভাই? গুজরাতের চিফ মিনিস্টার আমাকে পার্লামেন্ট ইলেকশনে নামার জন্য অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছেন। কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না! তাই তোমার একটা ওপিনিয়ন নেওয়ার কথা ভাবছিলাম। আমার ছকটা তো তোমার কাছে আছে। এক বার দেখে রাখবে গডব্রাদার?

—ইলেকশন কবে?

—আর মাস আড়াই আছে।

—তাহলে নেমে যান। কিন্তু কোন জায়গায় দাঁড়াবেন, সেটা আমার জানা দরকার।

—সেটা তো জানি না। এখনও ঠিক হয়নি।

—আপনি যেখানে থাকেন, জায়গাটা তার উত্তর দিকে হওয়া চাই।

—মানে? তোমার কথা বুঝলাম না।

—মানে... আপনার কন্সটিট্যুয়েন্সিটা আপনার বাড়ির উত্তর দিকে হওয়া চাই। পশ্চিম বা পূর্ব দিকে যেন কোনও মতেই না হয়। তাহলে কিন্তু আপনি ইলেকশনে জিততে পারবেন না। আর দক্ষিণে হলে চান্স ফিফটি-ফিফটি।

—মাই গড। তাহলে তো ইলেকশনে নামতেই হচ্ছে আমাকে। ধরে নাও, এম পি হয়ে গেছি। আমি থাকি মুম্বইয়ে। ইলেকশনে নামছি সুরাতের কাছাকাছি কোনও জায়গায়। উত্তর দিক হল কি না?

হেসে বললাম, 'তা তো হল। কিন্তু আমার কী হবে?'

PATHAGAR

—ডোন্ট ওরি। আমাকে সময় দাও গডব্রাদার। তোমার ব্যাপারটা আমি দেখছি। বাড়ি থেকে বেরিও না। টেনে ঘুম দাও। আমি রিং ব্যাক করছি। পটেলভাই লাইন ছেড়ে দেওয়ার পর আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ওঁর হাত অনেক লম্বা। নিশ্চয়ই একটা কিছু করবেন আমার জন্য। ওঁর ছক মাঝেমাঝে দেখি বলে জানি, এই ধরনের মানুষ বারফাট্টাই করেন না। শুক্রের জাতক। বৃষ রাশি।

আপাতদৃষ্টিতে খুব নরম-সরম মনে হলেও, আসলে এঁরা মোটেই তা নন। ভীষণ কঠিন মনের। লক্ষ্যে স্থির থাকেন। যা করবেন বলে মনে করেন, সেটা করে তবে ক্ষান্ত হন। শুক্রের জাতকদের পক্ষে এই সময়টা খুব ভাল। রবির ভাল দৃষ্টি আছে। আমি নিশ্চিত ইলেকশনে নামলে, পটেলভাই জিতবেন। কিন্তু রাজনীতিতে নামার কারণেই আটমাস পর মারাত্মক এক সমস্যায় পড়বেন। সেটা ইচ্ছে করেই আর ওঁকে বললাম না।

মনটা হালকা হওয়ার জন্যই ঘুমঘুম পেতে লাগল। বাড়িতে থাকার অভ্যেস নেই। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না। চার-চারটে দিন বাড়িবন্দি হয়ে আছি। আমাদের মতো ছেলের পক্ষে কি কোথাও আটকে থাকা সম্ভব? বিছানায় টানটান হয়ে শুতেই টোটার কথা মনে পড়ল। ও বলে, মন যখন খুব চঞ্চল হবে, তখন জপ করবি। দেখবি, মন তখন শান্ত হয়ে গেছে। এক টুকরো কাগজে একটা জপমন্ত্রও টোটা লিখে দিয়েছিল। কালী কৃষ্ণ হরি রাম। এই চারটে শব্দ জপ করলে না কি এক ধরনের ভাইব্রেশন হবে। তখন ধীরে ধীরে স্নায়ুগুলো নিস্তেজ হয়ে আসবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কত বার জপ করতে হবে রে?' টোটা বলেছিল, 'যত ক্ষণ না মনে প্রশান্তি আসবে। সাধুসন্তরা তো দিনে এক লক্ষ বার জপ করেন।' টোটার কথা মতো চেষ্টা করে দেখলে হয়। কথাটা ভেবে, চোখ বুজে আমি জপ করতে লাগলাম।

কত ক্ষণ জপ করেছি জানি না, হঠাৎ খুট করে শব্দ। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম, বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে অচেনা একটা লোক। হাইট বেশি না, পাঁচফুট চারের মতো হবে। গায়ের রং বাদামি। মাথার চুল ছোট, তবে খাড়া। লোকটার পরনে দামি স্যুট। হাতে রোলেক্সের ঘড়ি। চোখাচোখি হতেই আমি উঠে বসলাম। কে এই লোকটা? তেতলায় এলই বা কী করে?

আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে লোকটা হিন্দিতে বলল, 'আমাকে দেখে নিশ্চয়ই একটু অবাক হয়েছ, তাই না? আমার নাম ইয়াকুব।'

আমার হাইট পাঁচফুট এগারো। বেঁটে লোকদের আমি মোটেই ভয় পাই না। ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট বলে আমার একটু আত্মবিশ্বাসও আছে। চান্স পেলে একটা কিক-এ আমি এদের মতো লোককে ছিটকে দিতে পারি। কিন্তু যে-লোকটা পুলিশের সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে আমাকে মারার জন্য আমাদের বাড়ির তেতলায় উঠে আসতে পারে, সে নিশ্চয় ডেঞ্জারাস টাইপের। তবুও এর সামনে ভয় পেলে চলবে না। চোখে চোখ রেখে বললাম, 'তোমার সাহস তো কম নয়, ওপরে উঠে এলে কী করে?'

—কেন সিঁড়ি দিয়ে । আমি একা আসিনি। আমার সঙ্গে আরও পাঁচজন আছে। এক এক জন এক-একটা ফ্লোরে পজিশন নিয়েছে।

নীচে মা আর বউদি ছাড়া আর আছে রাঁধুনি মতির মা। সারা বাড়িতে আর কেউ নেই। মতি রোজ এই সময়টায় বিবেকানন্দ রোডের দোকানে ফাই-ফরমাশ খাটতে যায়। নিচে অচেনা লোকদের দেখে মা আর বউদির কী অবস্থা হতে পারে চিন্তা করে হঠাৎ মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বললাম, 'তুমি কী চাও বলো তো?'

—তোমার লাশ ফেলে দেওয়ার চিন্তা করেই কলকাতায় এসেছিলাম। কিন্তু এখানে আসার পর আমার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ডিসিশনটা বদলেছি। আপাতত তোমাকে কিডন্যাপ করতে চাই। একটা হিসাব বরাবর করার ব্যাপার আছে।

—হিসাবটা কী, বলবে?

—তোমাকে বলে লাভ নেই। তোমার বাবাকে বলতে হবে। তুমি এক কাজ করো। এখান থেকে তোমার বাবাকে একটা ফোন করো। ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও। দু'দিন আগে মুম্বই থেকে এক বার তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। খুব ঘমন্ড আছে বলে মনে হল লোকটার। নাউ হারি আপ। ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম।

শেষের কথাগুলো ইয়াকুব খুব রূঢ় গলায় বলল। বলেই পকেট থেকে রিভলভার বের করে, কয়েক পা পিছিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। দেখেই বুঝলাম, বৃশ্চিক রাশির লোক। খুব ধূর্ত। ও যখন 'হারি আপ' কথাটা বলছিল, তখন আমার মনে হচ্ছিল, এক লাফে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার মতিগতি আন্দাজ করতে পেরেছে। তাই ইচ্ছে করেই বিছানার সামনে থেকে সরে গেল। লোকটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কেন জানি না মনে হল, লোকটা আজকালের মধ্যেই হয় রাজরোষে পড়বে, নয়তো মারাত্মক দুর্ঘটনায় মারা যাবে। বৃশ্চিক রাশির লোকেদের পক্ষে এই সময়টা ভাল না। একসঙ্গে রবি আর মঙ্গল খারাপ অবস্থায় আছে।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ইয়াকুব ধমকে উঠল, 'কী দেখছ?'

বললাম, 'তোমার ভবিষ্যৎ। তুমি হয়তো জানো না, আমি একজন জ্যোতিষী।'

—মাই ফুট। আমার ভবিষ্যৎ আমার হাতে। জ্যোতিষে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার বাবা এই সময় শো রুমে আছেন, ফোন লাগাও।

—ইয়াকুব, তুমি কিন্তু আজকালের মধ্যে খুন হবে।

—বুলশিট। আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না। আর এক মিনিটের মধ্যে যদি তুমি ফোন না লাগাও, তাহলে তোমাকে কিডন্যাপ করার ডিসিশনটা আমাকে ফের বদলাতে হবে।

রিভলভার আমার দিকে তাক করে আছে ইয়াকুব। লোকটার চোখ-মুখ হিংস্র

হয়ে উঠেছে। যে—কোনও মুহূর্তে গুলি চালিয়ে দিতে পারে। হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুললাম। কোনও শব্দ নেই। মনে হয়, বাড়িতে ঢুকে এরাই ফোনের লাইন কেটে দিয়েছে। রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে বললাম, 'তোমার সময়টা খারাপ যাচ্ছে ইয়াকুব। ফোন কাজ করছে না।'

রিভলভার উঁচিয়ে ইয়াকুব বলল, 'তোমার মোবাইলটা কোথায়?'

মোবাইল সেটটা সাধারণত আমি বালিশের পাশে রাখি। সেটা তুলে নিয়ে বাবাকে ফোন করলাম। ও দিকে ফোন উঠাল স্টোন সেকশনের রিমিতা। বলল 'স্যার এখন নেই কুন্তলদা। লালবাজারে গেছেন।'

—কখন ফিরবেন জানো?

—বলে যাননি। স্যারকে কিছু বলতে হবে?

—ফিরলে বোলো, বাড়ি থেকে আমি ফোন করেছিলাম। জরুরি দরকার।

—ঠিক আছে।

সুইচ অফ করে কথাগুলো ইয়াকুবকে বলতেই ও জ্বলে উঠল। চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'ঠিক আছে। এখন চলো আমার সঙ্গে। আর একটা মুহূর্তও আমি নষ্ট করব না।'

বিছানা থেকে নামতে আমি সামান্য দেরি করলাম। মোবাইলটা পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে পকেটে পুরে নিয়ে বললাম, 'চলো।'

ইয়াকুব আমার প্রায় পাঁচ-ছ'ফুট পিছনে। রিভলভার উঁচিয়ে রেখেছে। থ্রি সিক্সস্টি ডিগ্রি ঘুরে পা চালালেও আনি ওর নাগাল পাব না। নাহ, লোকটা অসম্ভব বুদ্ধিমান। মানতেই হবে। বাড়িতে পুরুষমানুষ আর কেউ নেই। আমি যদি কোনও ভুল করি, তাহলে এরা মা আর বউদিকে ছাড়বে না। গুলি চালিয়ে দেবে। দিব্যেন্দুবাবুর ওপর রাগ হয়ে গেল। সিকিউরিটি নিয়ে অত বারফাট্টাই মেরে গেলেন ভদ্রলোক। আসল সময়েই তাঁর কোনও পাত্তা নেই।

ঘরের বাইরে পা রাখা মাত্রই পিছন থেকে ইয়াকুব বলল, 'হাত তুলে রাখো।'

অগত্যা হাত তুলে রাখলাম। একতলা পর্যন্ত ষাটখানা সিঁড়ি। নামার সময় কোথাও না কোথাও ইয়াকুবকে বাগে পেয়ে যাব। তেতলার ল্যান্ডিংয়ে নামার সময়ই দেখতে পেলাম দেওয়ালে টাঙানো কাঠের বড় গণেশের মূর্তিটা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। মূর্তিটা মহীশূর থেকে কিনে এনেছিল ঠাকুরদা। মূর্তিটার ওই অবস্থা দেখে রাগে আমার মাথায় ফের আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই। বাঁক ঘুরতেই দেখলাম, দোতলায় ল্যান্ডিংয়ে কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে গেছে সিঁড়িটা। এক পলক দাঁড়াতেই বুঝতে পারলাম, লোকটি আর কেউ নন, দিব্যেন্দুবাবু।

—হারি আপ। পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ইয়াকুব।

আমার মাত্র দু'টো ধাপ নিচেই ইয়াকুবের একটা লোক মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই সুযোগ। আগুপিছু না ভেবেই আমি লাফ দিয়ে লোকটাকে জড়িয়ে ধরলাম। আর তখনই ওপর থেকে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, 'টুম্পাই, লোকটাকে ছাড়িস না।' আমার সঙ্গে ল্যান্ডিংয়ে হুটোপাটি হচ্ছে লোকটার সঙ্গে। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথায় যেন আমার মাথাটা ঠুকে গেল। মনে হল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। 'মা' বলে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

...মাথায় হাত দিয়ে বুঝলাম, নাঃ রক্ত তো নেই! কোথায় ইয়াকুব, তার সাঙ্গোপাঙ্গ? এক তলার ল্যান্ডিং-এও নয়, আমি বসে আছি বিছানার ওপর। এত ঘেমে গেছি যে, গা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। একটু আগে যে চেয়ারে ইয়াকুব বসে আমাকে কিডন্যাপ করার ভয় দেখাচ্ছিল, সেটাও ফাঁকা। উফ, তাহলে কি আমি এত ক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম?

কয়েক মিনিট হতভম্ব হয়ে বসে থেকে বাথরুমে গেলাম। চোখ-মুখে জল দিয়ে আসার পরই পটেলভাইয়ের কথা মনে হল। ঘড়িতে এখন প্রায় চারটে বাজে। তার মানে প্রায় ঘণ্টা চারেক কেটে গেছে পটেলভাইকে ফোন করার পর থেকে। অথচ এখনও উনি রিং ব্যাক করলেন না। আশ্চর্য! পটেলভাই কি ভুলে গেলেন? না, আমার কাছ থেকে উনি অনেক উপকার পেয়েছেন। অন্তত আমার কোনও অনুরোধ হালকাভাবে নেবেন না। স্থির করতে পারলাম না ওঁকে ফের ফোন করা উচিত কি না। ফোন করলে হয়তো উনি ভাববেন আমি মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছি। ঠাট্টাও করতে পারেন।

মনটাকে অন্য দিকে ঘোরানোর জন্যই টিভি চালালাম। চ্যানেল সার্চ করার সময়ই কোনও একটা বাংলা চ্যানেলে চোখ আটকে গেল। আজকাল এক ঘণ্টা অন্তর টিভিতে খবর হয়। সেই রকম একটা খবর হচ্ছে। শুনতে শুনতেই উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম। 'আজ বেলা দুটোর সময় ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে দু'দল দুষ্কৃতীর লড়াইয়ে মারা গেছে মুম্বইয়ের মাফিয়া ডন ইয়াকুব আমেদ। কলকাতার এক নামী রত্নব্যবসায়ীর ছেলেকে কিডন্যাপ করার উদ্দেশ্যে ইয়াকুব আজই সকালে মুম্বই থেকে কলকাতায় এসেছিল। ভবানীভবন সূত্রে জানা গেছে, ইস্টার্ন বাইপাসে নামী একটা হোটেল থেকে বেরনোর সময় অন্য একদল দুষ্কৃতীর সঙ্গে ইয়াকুবের দলের গুলি বিনিময় হয়। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।'

খবরটা শোনার পরই ধপ করে আমি বিছানায় বসে পড়লাম।

সাত

সদর দরজা খুলে দিয়েই লালি বলল, 'মা দ্যাখো, আজ বোধহয় পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে। সাতসকালেই সলমন খান হাজির।' লালি বোধহয় কলেজ যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। চুল আঁচড়ে বেণী বাঁধছে। বেলা দশটা বাজে। এই সময়টাই টোটা বাড়িতে থাকে না।

আমি জানি, ও সাড়ে ন'টা নাগাদই হাইকোর্টে চলে যায়। সকালের দিকে তাই কোনও দিন ওদের বাড়িতে আসি না। আজ বাধ্য হয়ে আসতে হল। বাড়িতে মা কী একটা পুজো করবে। কাল রাত থেকে বউদি আমার কান ঝালাপালা করে দিয়েছে, টোটাদের বাড়িতে গিয়ে সব্বাইকে আসতে বলো। 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা' বলে টোটার একটা বই আমার কাছে অনেক দিন পড়েছিল। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে ভেবে, সেই বইটাও আমি ফেরত দিতে এসেছি। কিন্তু লালি কাকে সলমন খান বলল, বুঝতে পারলাম না।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মাসিমা তরকারি কুটছেন। আমাকে দেখেই বললেন—এসো, বাবা এসো। টোটা আর লালিকে কত বার বললাম, ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। এক বার ও বাড়িতে আমায় নিয়ে চল। দু'জনে এমন ব্যস্ত, কেউ নিয়ে গেল না। তা, এখন কেমন আছ, বাবা?

লালি চুল বাঁধতে বাঁধতেই বেতের একটা মোড়া এনে দিয়েছে। তাতে বসে বললাম, —ভাল। সেলাই কেটে দিয়েছে। ঘণ্টাও নেই।

—আমার শরীরও ভাল নেই বাবা। ঘাড়ে মাথায় খুব যন্ত্রণা। গেল পরশু টোটা নৃপেন ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল। ওর ওষুধ খেয়ে আজ উঠে দাঁড়িয়েছি।

—কই, টোটা তো আমাকে কিছু বলেনি।

—বলবে কী! তোমার ওপর দিয়ে এই ক'দিন যা ঝড়-ঝাপটা গেল! লালির মুখে সব শুনে তো আমি ভয়ে মরি।

—কী বলেছে লালি?

—ছাদ টপকে তোমাদের বাড়িতে না কি কারা সব ঢুকেছিল। তোমাকে খুন করবে বলে। তার পর তুমি নাকি ওদের একজনকে জাপটে ধরেছিলে...ওই-ই তো এসে বলল, মা তোমার বড় ছেলে সলমন খানের থেকেও বড় হিরো।

মাই গড। আমার স্বপ্নটাকেই লালি সত্যি বলে চালিয়ে দিয়েছে। পারেও বটে। স্বপ্নের কথা মা আর বউদির কাছে পরে আমি বলেছিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে লালি সেটাই বোধহয় শুনে এসেছে। হাসব না রাগব—ঠিক করতে পারলাম না। সদর দরজা খুলে দিয়েই একটু আগে লালি যে কেন আমাকে সলমন খান বলল, এই

বার বুঝতে পারলাম। একটু দূরে উঠোনে কুয়ো থেকে জল তুলে লালি মুখে সাবান ঘষছে। সুপারি গাছের ফাঁক দিয়ে ওর মুখে রোদ এসে পড়েছে। মুখটা চকচক করছে। অত সুন্দর একটা মুখ দিয়ে কী করে এত মিথ্যে কথা বেরোয়, আমি ভাবতেও পারি না।

লালির দিকে তাকাতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল, 'চন্দনা কেমন আছে বাবা?'

চন্দনা আমার বউদির নাম। মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'ভালো।'

—শুনলাম, ওর না কি বাচ্চা হবে?

শুনে আমি চমকে উঠলাম। বউদি মা হবে? কই, কেউ তো আমায় বলেনি। আমার মুখ দেখেই সেটা টের পেলেন মাসিমা। হেসে বললেন, 'জানো না বুঝি! কালই তো লালি এসে আমায় বলল। তোমার মা না কি কাল সকালেই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিল।'

আশ্চর্য, কাল রাতে আমার ঘরে এসে মা অত ক্ষণ কথা বলে গেল, অথচ এই খবরটা আমায় দিল না। আমি কাকা হচ্ছি, এই কথাটা বাড়ির ছেলে হয়ে আমি জানতে পারলাম না। অথচ বাইরের লোক হয়েও লালি আমার আগে জেনে ফেলল? কথাটা মনে হতেই মন একটু খারাপ হয়ে গেল।

তরকারি কুটতে কুটতে মাসিমা এ বার বললেন, 'চন্দনা খুব লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই তো ওকে দেখছি। একটা সময় ওর বাবার সঙ্গে টোটার বাবার খুবই বন্ধুত্ব ছিল যে! শীল মশাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই ও আমাদের বাড়ি আসত। তখনই আমরা বলাবলি করতাম, এই মেয়ে যে বাড়িতে যাবে, সেই বাড়ি আলো করে রাখবে।'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, আমার বউদিটা সত্যিই খুব ভাল।'

—তোমার দাদার সঙ্গে চন্দনার ঘটকালিটা কে করেছিল জানো? টোটার বাবা । শীলমশাইকে বলেছিল, দত্তবাড়িতে চোখ বুজে মেয়েকে দিয়ে দিন। কী কপাল দেখো, বিয়েটাই উনি দেখে যেতে পারলেন না। বসে বসে এখন কী ভাবি জানো? আমার মেয়েটার কপালে কী যে লেখা আছে, কে জানে? কে উদ্যোগ নেবে, কোথায় গিয়ে পড়বে...

কথা বলতে বলতে হঠাৎই চুপ করে গেলেন মাসিমা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। একদম আমার মায়ের মতো। কখন কাঁদবে, কেন কাঁদবে, বোঝা মুশকিল। এ সব অবশ্য অহেতুক দুর্ভাবনা। লালির বিয়ে সেখানেই হবে, ওর কপালে যেখানে লেখা আছে। কেউ খণ্ডাতে পারবে না। ফালতু চিন্তা করে লাভ কী? সে কথা মাসিমাকে বলে লাভ নেই। বললাম, 'লালি এখন পড়াশুনো করুক না, মাসিমা?'

—কী হবে পড়াশুনা করে? সেই তো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হেঁশেল ঠেলতে হবে। একটা ভাল ছেলে দেখো না বাবা। তোমার তো অনেক জানাশোনা।

উত্তর দিতে যাব, হঠাৎ পিছন থেকে টোটার গলা, 'কখন এলি?'

টোটা এই সময় বাড়িতে? চমকে ঘাড় ঘোরালাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এ কী? তুই আজ কোর্টে যাসনি?'

—না রে। শরীরটা ভাল নেই।

টোটার চোখের কোণে কালি। সারা মুখে অনিদ্রার চিহ্ন। গায়ে একটা হালকা বেডকভার জড়ানো। হাঁটু অবদি লুটোপুটি খাচ্ছে। এই বোধহয় বিছানা ছেড়ে উঠে এল। ওকে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার মতো সুখের জীবন টোটার নয়। ওর মাথায় অনেক সমস্যা। আমাকে সংসার চালানোর ভাবনা ভাবতে হয় না। ওকে সেই চিন্তাটা করতে হয়। তার পর জ্ঞাতিদের অত্যাচার। ও জেরবার হয়ে আছে। কী হয়েছে পরে জিজ্ঞাসা করা যাবে। হাতে ধরা বইটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই নে। বইটা তোকে ফেরত দেব দেব করেও অ্যাদ্দিন দিতে পারিনি।'

একটা মোড়া টেনে টোটা আমার পাশে বসে পড়ল। তার পর বলল, 'একটা গুড নিউজ আছে রে টুম্পাই। গোয়াবাগানের সেই বাড়িটার পজেশন পেয়ে গেছি। উফ, প্রায় আড়াই বছর ধরে মামলাটা লড়ে জিতলাম।'

শুনে খুব ভাল লাগল। গোয়াবাগানে ওদের এই বাড়িটা বেদখল হয়ে গেছিল। অনেক চেষ্টা করে টোটা সেটা উদ্ধার করল। ওর তো খুশি থাকারই কথা। তাহলে কেন মনমরা হয়ে আছে? ঠিক বুঝতে পারলাম না। বাড়িটা টোটা বিক্রি করে দেবে। আমাকে বলেছে, ওই বাড়ি বিক্রি করে দশ-বারো লাখ টাকা পাবেই। সেই টাকার অর্ধেক খরচ করে ও লালির বিয়ে দেবে। অন্তত একটা বোঝা তো ওর কাঁধ থেকে নামবে। বাকি টাকাটা ও মায়ের নামে ফিক্সড ডিপোজিট করে দেবে ব্যাঙ্কে। ও যদি সংসার ছেড়ে চলে যায়, তাহলেও যেন মায়ের খাওয়া-পরার অসুবিধা না হয়।

বললাম, 'বাড়িটা তাহলে বিক্রিই করে দিবি?'

—ইচ্ছে তো সে রকমই ছিল। কিন্তু একটা প্রবলেম আছে।

—কী রে?

—অ্যাদ্দিন যার দখলে ছিল, সে প্রচুর ট্যাক্স বাকি রেখেছে। আগে সে ট্যাক্স আমায় দিতে হবে। বাড়ির সব কিছু রেগুলারাইজ করতে হবে। তার পর বিক্রির চিন্তা।

—কত টাকা বাকি?

—হাজার দশেক হবে। ঠিক জানি না।

তার মানে...সমস্যাটা ওর রয়েই গেছে। আমি জানি, টোটার জমানো কোনও

টাকাই নেই। দশ হাজার টাকা, ওর কাছে অনেক টাকা। এই টাকাটা জোগাড় করতে ওর কালঘাম ছুটে যাবে। আমার কাছে যদি থাকত, ত হলে এক্ষুনি ওকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার নিজের বলতে কিছু নেই। আমাকেই হাত পাততে হয় বউদির কাছে। দশ হাজার টাকা খুব কমও না। চাইলে বউদি দিতে পারবে কি না সন্দেহ। ...মায়ের কাছ থেকে চাওয়া যায়। দাদু অনেক টাকা রেখে গেছে মায়ের জন্য। সে টাকা সব ব্যাঙ্কে। টোটার নাম করে চাওয়া যায়। মা টোটাকে খুব ভালবাসে। ধার দিলেও দিতে পারে। বাড়ি বিক্রি করে টোটা যখন টাকা পাবে, তখন না হয় ফেরত দিয়ে দেবে। আর মা যদি নাও দেয়, তাহলে আমার দশ-বারোটা আংটি আর গলায় তিনভরি সোনার চেনটা আছে কী করতে? এমনিতেই ও সব বিক্রি করে আমি মুম্বই কেটে পড়ার কথা ভাবছি। পুরো টাকা নিয়ে আমার মুম্বই যাওয়ার দরকার নেই। অর্ধেক টোটাকে দিলেও ওর কাজে লাগবে।

কথাটা মনে হওয়া মাত্রই বললাম, 'টাকার জন্য তুই ভাবিস না টোটা। বাড়ির সব কিছু রেগুলারাইজ করে নে। টাকাটা আমি তোকে জোগাড় করে দেব। আমি ফিরে এলে পরে তুই দিয়ে দিস।'

—তুই ফিরে এলে...মানে? কোথাও যাচ্ছিস না কি?

মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছি। এখন মিথ্যে কথা বলা সম্ভব না। তাই বললাম, 'সেই রকম একটা ইচ্ছে আছে। পরে তোকে বলছি।'

মাসিমা তরকারি কুটতে কুটতে আমাদের কথা শুনছেন। আমার কথা শুনে হাসি মুখে বললেন, 'কী রে টোটা, তোকে আমি বলেছিলাম না? আমার বড় ছেলে আছে। ওকে বল। ও তোকে উদ্ধার করে দেবে।'

টোটা করুণ মুখে বলল, 'মা, আমাকে ও কত বার উদ্ধার করবে, বলো তো? সেই স্কুল লাইফ থেকেই তো ও আমাকে দেখে আসছে। আর কত দেখবে?' কথাগুলো বলেই টোটা উঠে পড়ল। তার পর আমাকে বলল, 'চল, আমার ঘরে চল। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

কথা আমারও অনেক আছে। মাসিমার সামনে সে সব আলোচনা করা যাবে না। তাই আমিও উঠে পড়লাম। এখুনি বাড়ি ফেরার কোনও তাগাদা নেই। দোকানে না গেলেও বাবা অসুন্তুষ্ট হবে না। অনেক দিন পর লম্বা একটা সময় পাওয়া গেছে। টোটার সঙ্গে না হয় আড্ডা মেরেই যাই। টোটার ঘরটা উঠোনের পশ্চিম দিকে। আগেকার আমলের বাড়ি। ভেতরে অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি। উঠোনের এক দিকে সুপারি গাছের সারি। যত্নের অত অভাব। তা সত্ত্বেও বাড়িটার সৌন্দর্য ওই সুপারি গাছগুলো ঘিরেই। টোটাদের এই বাড়ির উঠোনে এসে ছোটবেলায় ব্যাডমিন্টন খেলতাম। অনেক স্মৃতি এই বাড়ি ঘিরে।

আমাদের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে অনেক তফাত থাকা সত্ত্বেও টোটাদের ও বাড়িতে তখন রোজ আসতে ইচ্ছে করত বেশ কয়েকটা কারণে। উঠোনের ঠিক মাঝখানে তখন একটা ঝরনা মতো ছিল। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ছোট্ট গোল জায়গায় জল এসে পড়ত। সেই জলে লাল-হলুদ মাছ সাঁতার কাটত। টোটার বাবা খুব শৌখিন ছিলেন। নানা ধরনের পায়রা পুষতেন। মাছ আর পায়রাই ছিল টোটাদের বাড়ির মূল আর্কষণ। আর ভাল লাগত মাসিমা আর লালিকে। লালিকে তখন দেখতে এত সুন্দর ছিল যে, একেবারে পুতুল পুতুল বলে মনে হত।

উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে টোটা বলল, 'এখুনি সেই মেয়েটা আমাদের বাড়িতে আসবে। দরজাটা বন্ধ থাক, কী বলো?' কথাটা বলেই টোটা দরজা ভেজিয়ে দিল। বললাম, 'কোন মেয়েটা?'

—আরে, তোর সঙ্গে যে-মেয়েটার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। বুলবুল। ক'দিন ধরে দেখছি, লালির সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। কলেজ যাওয়ার সময় গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের বাড়ির সামনে। লালিকে তুলে নিয়ে যায়।

—তাই না কি?

—মাকেও খুব পটিয়ে ফেলেছে। মা অবশ্য এখনও জানে না, তোর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ হচ্ছে। মেয়েটার কথাবার্তা ওভারহিয়ার করেছি। খালি তোর কথা জানতে চায়। আর মাকে তো জানিস। তোর প্রসঙ্গ এক বার উঠলেই হল। তোকে একেবারে হিরো বানিয়ে দিচ্ছে।

—তোর সঙ্গে বুলবুলের পরিচয় হয়েছে না কি?

টোটার চোখমুখে কেমন যেন অস্বস্তির চিহ্ন। চট করে সেটা মুছে ফেলে ও বলে, 'তেমন কিছু না। এক দিন কোর্টে বেরোচ্ছি, এমন সময় লালি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তুই তো জানিস, মেয়েদের সামনে আমি খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করি না।'

বুলবুলকে এক দিনই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছি। চেহারা মনে নেই। কী রকম দেখতে টোটাকে জিজ্ঞেস করাও যাবে না। মেয়েদের সম্পর্কে অহেতুক কৌতূহল ভাল না। বিয়ে যখন করবই না, তখন কোনও রকম আগ্রহ না দেখানোই ভাল। বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে টোটাকে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছিলাম। মাঝে ওই প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনও কথাই হয়নি। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ব্যাপারটা নিয়ে তুই কি কিছু ভেবেছিস?'

—না রে, টাইম পাইনি। আসলে গোয়াবাগানের বাড়িটা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, অন্য কোনও দিকে মন দেওয়ার সুযোগই পাইনি।

—কী করা যায় বল তো?

টোটা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আচমকা দরজা হাট করে খুলে ভেতরে ঢুকে

এল লালি। হাসি মুখে বলল, 'সাতসকালে দরজা বন্ধ করে, দুই বন্ধু মিলে তোমরা কী গুজগুজ করছ, টুম্পাইদা?'

সেজেগুজে কলেজ যাচ্ছে লালি। বেশ মিষ্টি লাগছে ওকে দেখতে। আমি কিছু বলার আগেই টোটা ওকে কড়া ধমক দিল, 'তোর তাতে দরকার কী?'

লালি দমে যাওয়ার পাত্রী নয়। বলল, 'দরকার আছে। তাই এলাম। মা জানতে চাইছে তোমাদের কি জলখাবার দেবে?'

সকালে জলখাবার খেয়েই আমি বেরিয়েছি। তাই বললাম, 'মাসিমাকে বলো, আমার জন্য যেন না করে।'

টোটা বলল, 'আমার কিছু খাবার ইচ্ছে নেই।'

—ঠিক আছে, মাকে তাই বলে দিচ্ছি। বলে যাওয়ার সময় লালি একটু শব্দ করেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওর রাগ প্রকাশের ভঙ্গি দেখে আমার খারাপই লাগল। টোটাকে বললাম, 'লালিকে তুই না বকলেও পারতি।'

টোটা আমার দিকে নরম চোখে তাকাল। একটু চুপ করে থেকে খানিকটা অনুশোচনার ভঙ্গিতে বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিস। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি।'

—বেলুড়ের রামানন্দজির কাছে এক বার যা না।

—গেছিলাম। উনি বললেন, তোমার মনটা এখন ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে আছে। তুমি যা চাইছ, সেটা মনপ্রাণ দিয়ে করতে পারছ না। সংসারের চাপ তোমাকে একটা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলতে চাইছে। সাংসারিক দায়িত্বগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে ফ্যালো। তার পর দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সংসারের প্রবলেম তো তোর আগেও ছিল রে।

—ছিল। কিন্তু এমন ফাঁস হয়ে ছিল না। যাক গে, ঈশ্বর বোধহয় ইচ্ছে করেই আমাকে এ রকম পরীক্ষায় ফেলেছেন। যেমন তোর পরীক্ষা নিলেন গত কয়েক দিন ধরে। কী থেকে কী হয়ে যায়, আমরা সাধারণ মানুষ তো ভাবতেও পারি না। সে দিন ইয়াকুব বলে লোকটার খুন হওয়ার খবরটা তোর কাছে শুনে আমি তো চমকে উঠেছিলাম। ভাগ্যিস, তুই পটেলভাইকে ফোন করেছিলি।

—বাড়ির কেউ কিন্তু এটা জানে না। তুই ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলিস না।

—তোর মাথা খারাপ? ভাবতে পারিস, দুনিয়াটা কত ছোট আর কত বিপজ্জনক জায়গা হয়ে গেছে? একটা লোক মুম্বই শহরে বসে ফোন করে মাত্র তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই হাজার মাইল দূরে কলকাতায় আর একটা লোককে মার্ডার করে দিচ্ছে। ভাবা যায়? এর একটা খুব খারাপ দিকও আছে। হ্যাঁ রে, পটেলভাইয়ের সঙ্গে

পরে তুই আর ফোনে যোগাযোগ করিসনি?

—করেছিলাম। তবে মার্ডার নিয়ে একটা কথাও বলিনি। ফোনে ও সব কথা তোলাই উচিত না। কে কোত্থেকে ট্যাপ করবে। ফোনে উনি একটা কথাই বললেন, কী, এখন নিশ্চিন্তে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ। শিগগিরি আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি। কবে যাব, দু'তিন দিন পরে আপনাকে জানিয়ে দেব।

—তুই কি সত্যিসত্যি মুম্বই যাচ্ছিস?

—ভাবছি। তোর সঙ্গে পরামর্শ করে ডিসিশন নেব। বিয়েটা যদি কাটাতে না পারি, তাহলে বাড়িতে কিছু না বলে পটেলভাইয়ের কাছে চলে যাব। জাভেরি রাজার হল জুয়েলারি বিজনেসের খোদ জায়গা বুঝলি। গেলে অনেক এক্সপিরিয়েন্সও হবে। আমি নিজে কিছু করতে চাই রে। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দিন কে দিন যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এক দিন আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তখন তো নিজেকে কিছু করে খেতে হবে।

—তোর এই ডিসিশনটা মন্দ না।

—আমি মুম্বই যাব বলে পটেলভাই এত এক্সাইটেড যে, প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। ওখানে ওঁর দশ-বারোটা গেস্ট হাউস আছে। গিয়ে থাকার কোনও সমস্যাই হবে না।

টোটা কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রাস্তায় মোটর হর্নের শব্দ। শব্দটা তিন বার হওয়ার পর লালির গলা শুনতে পেলাম, 'দাঁড়া আসছি।' টোটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই এল। বুলবুল। পর্দাটা সরালেই দেখতে পাবি।'

তার মানে... পর্দা সরিয়ে দেখলে টোটার আপত্তি নেই। দু'পা এগিয়ে জানলার পর্দাটা সরাতেই দেখি, লালিরই বয়সি একটা মেয়ে মারুতি থেকে নেমে আসছে। মুখের দিকে তাকাতেই চিনতে পারলাম, এ বুলবুল। এই মুখটাই গত কয়েক দিন আমি চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। সে দিন সালোয়ার কামিজে অন্য রকম লেগেছিল। আজ শাড়ি পরা অবস্থায় মেয়েটাকে খুব সুন্দর লাগছে। বাবা ঠিকই বলেছিল, একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো।

না, না, মেয়েদের দিকে বেশি ক্ষণ তাকিয়ে থাকা উচিত নয়। টোটা মাইন্ড করতে পারে। কিন্তু জানলা থেকে সরে আসার মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে গেল। বুলবুলের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে পর্দাটা নামিয়ে দিলাম। ছি ছি, ব্যাপারটা খুব বাজে হল। কলেজ যাওয়ার পথে বুলবুল নিশ্চয়ই লালিকে বলবে, তোর টুম্পাইদা লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় দেখছিল। আর লালি সেটা অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলবে বউদির কাছে গিয়ে। বানিয়ে গল্প বলায় ওর জুড়ি তো পৃথিবীতে নেই। আমারই দোষ। এক মুহূর্তের সংযমের অভাব। বউদির কাছে আমার আর মুখ থাকবে না।

আট

কান হঠাৎ গরম হয়ে গেল। জানলার সামনে থেকে সরে এসে চেয়ারে বসলাম। টোটা উপুড় হয়ে ওর চৌকিতে শুয়ে আছে। ওকে ওই অবস্থায় দেখে স্বস্তি পেলাম। যাক বাবা, ও অন্তত কিছু টের পায়নি। টোটার এই ঘরে একটা সুন্দর পালঙ্ক আছে। কিন্তু তাতে ও শোয় না। ও চৌকির ওপর কম্বল আর চাদর বিছিয়ে শোয়।

ও বলে, কৃচ্ছ্রসাধন না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব না। বাড়িতে আমিও আমার ঘরে চৌকি ঢোকানোর চেষ্টা করেছিলাম। মা আর বউদি শুনে আঁতকে উঠেছিল। বাবা না কি মারাত্মক রেগে যাবে। দরকার কী বাবার সঙ্গে ঝামেলায় যাওয়ার! রামবাগান থেকে কিনে আনা চৌকিটা শেষ পর্যন্ত মতি ওর বাড়িতে নিয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে টোটা হঠাৎ উঠে বসল। তার পর হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন করল, যা ওর মুখ থেকে কোনও দিন আশাই করিনি, 'টুম্পাই, তুই কোনও দিন কোনও নেকেড মেয়েকে দেখেছিস?'

প্রশ্নটা এসে যেন ধাক্কা মারল আমাকে। ধাতস্থ হয়ে বললাম, 'কী বলছিস তুই?'

টোটার মুখটা খুবই বিষণ্ণ। ফের জানতে চাইল, 'বল না, দেখেছিস?'

—না।

—আমি দেখলাম। কাল রাতে।

বুক ঢিপঢিপ করছে। হৃদযন্ত্রটা যেন আমার গলার কাছে এসে আটকে গেছে। ঢোঁক গিলে কোনও মতে বললাম, 'কোথায়?'

জানলার দিকে তাকিয়ে টোটা বলল, 'স্বপ্নে। জেগে ওঠার পর বাকি রাত ঘুমোতেই পারলাম না। নিজেকে নিয়ে খুব দুঃচিন্তা হচ্ছে রে এখন!'

ওঃ, এই কারণে টোটার চোখমুখে অনিদ্রার চিহ্ন। চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'অত ভাবিস না টোটা। যত তাড়াতাড়ি পারিস, ভুলে যা।'

—ভুলে তো আমি যেতেই চাই। কী করে ভুলব বল? এই দু'তিন দিন আগে পানিবাবার আশ্রম থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। কনখলে এখুনি আমাকে যেতে বলছেন। মনে হচ্ছে, এ বার উনি দেহ রাখবেন। মন ছটফট করছে ওখানে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। আমি গেলে মা আর বোনের কী হবে? এই যে স্বপ্নটা দেখেছি, আমার তো মনে হয়, এর পিছনে বাবার খেলা আছে। যেন উনি

হিন্টস দিয়ে দিলেন, এই বেলায় পালিয়ে আয়। না হলে সংসারে বাঁধা পড়ে যাবি।

কয়েক বছর আগে গঙ্গাসাগর মেলায় টোটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পানিবাবার। ওঁর আশ্রম আছে কনখলে। টোটার অসম্ভব ভক্তি পানিবাবার ওপর। ও ঠিকই করে রেখেছে সংসারের সব দায় উদ্ধার করে, যত তাড়াতাড়ি পারে কনখলে চলে যাবে। বুঝতে পারছি, মারাত্মক দোটানায় পড়েছে টোটা। কোনও ভাবে ওকে আটকে দেওয়া দরকার। একে শনির জাতক, তায় তুলা রাশি। আধ্যাত্মিক লাইনে এক দিন না এক দিন ওকে চলে যেতে হবেই। এখুনি আটকানোর জন্য ওর শুক্রটা একটু স্ট্রং করা দরকার। টোটার সঙ্গে হয়তো একটা তঞ্চকতা করা হবে, কিন্তু মাসিমা আর লালি তো বাঁচবে। তাই বললাম, 'আমার একটা পরামর্শ নিবি টোটা? তাহলে তোর এই অস্থিরতা চলে যাবে। তোদের বাড়িতে হিরের কোনও আংটি আছে?'

—মায়ের কাছে একটা আছে বোধহয়। বোনের বিয়ের জন্য রেখেছি। কেন রে?

—কত বড় হবে?

—মনে হয়, সত্তর-আশি সেন্ট ওজনের।

—ঠিক আছে, তাতেই চলে যাবে। মাসিমার কাছ থেকে ওই আংটিটা চেয়ে নিয়ে আজই তুই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে চলে যা। আংটিটা মন্দিরে শোধন করে নিয়ে মাঝের আঙুলে পরে ফ্যাল। দেখবি, কয়েক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবি।

শুনেই টোটার মুখটা ফের উজ্জ্বল। আংটির কথা মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য ও ঘর ছেড়ে বেরতেই, কেন জানি না, আমাদের দোকানের শাস্ত্রীজির চেহারাটা হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অনেক দিন বল ওয়ার্কারটা নিয়ে ব্যায়াম করা হয়নি। সন্ধেবেলায় একটু সময় পেয়ে তাই একটু ওয়ার্ক আউট করে নিচ্ছিলাম। মাসলগুলো একটু শক্ত হয়ে গেছে। হওয়ারই কথা। প্রায় আট দিন ম্যাসাজ করানো হয়নি। ম্যাসিওর গবা-কে সে দিন আসতে বললাম। অথচ এল না। আজ বিকেলে বিতান এসেছিল। ওকে দিয়ে ম্যাসাজটা করিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছে করল না।

হাতের ট্রাইসেপসটা পাম্প করে সবে মন দিয়ে বাইসেপসের ব্যায়াম করছি, হঠাৎই কানে এল হি হি শব্দ। তাকিয়ে দেখি, লালি। নীচে থেকে নিঃশব্দে কখন আমার ঘরে উঠে এসেছে, টেরও পাইনি। বাড়িতে মা আজ সত্যনারায়ণের পুজো করছে। সকালে ওদের বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছিলাম। তাই এসেছে। লালির পরনে চাঁপা রঙে শাড়ি। সুন্দর লাগছে ওকে। মেয়েটার সবই ভাল। মিথ্যে বলার অভ্যাসটা ছাড়া।

মুখটা গম্ভীর করে ওর দিকে এক বার তাকিয়েই বাইসেপসে মন দিলাম।

বেশি পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই। টোটাও নিশ্চয়ই এসেছে। মনে হয়, ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ও ওপরে উঠে এলেই লালি নীচে পালাবে। আমি জানি। মিনিট খানেক আমার দিক থেকে কোনও উৎসাহ না পেয়ে লালি কাছে এসে বলল, 'বুলবুল তোমাকে কী নাম দিয়েছে, টুম্পাইদা জানো?'

জানার কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু সেটা বোঝার ক্ষমতা লালির নেই। ছোটবেলা থেকে ওকে আমি জানি। এখন খালি কথাই বলে যাবে। আমার পুরো মনঃসংযোগ নষ্ট করে দেবে। কথা বলাটা যে আমি পছন্দ করছি না, সেটা বোঝানোর জন্যই ব্যায়াম বন্ধ করে আমি বারান্দায় চলে এলাম।

দরদর করে ঘেমেছি। হাত-কাটা গেঞ্জিটা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই ফুরফুরে বাতাসে শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। বারান্দা থেকে কোম্পানি বাগানটা দেখা যায়। হঠাৎ সে দিকে চোখ যেতেই দেখলাম, নারকেল গাছের ঠিক ওপরে গোল চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। তার রুপোলি আলো এসে পড়েছে আমাদের চক মিলানো বারান্দাতে। কোনও দিন চোখে পড়েনি কিন্তু।

লালি আমার পিছন পিছন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফের হি হি করে হেসে বলল, 'বুলবুলটা না... তোমার ঠিক নামই দিয়েছে। সলমন খান। তোমাকে সলমন খানের মতোই দেখাচ্ছে।'

চাঁদের আলোয় এত নিষ্পাপ দেখাচ্ছে লালির হাসিমুখটা, কড়া কথা বলতেই ইচ্ছে করল না। সকালে একটা অপরাধ করে ফেলেছি। লুকিয়ে বুলবুলকে দেখতে গিয়ে। সে কথাটা বুলবুল লালিকে বলে দিয়েছে কি না, সেটা জানা দরকার। তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বুলবুল আর কী বলেছে?'

—সে অনেক কথা। বিয়েতে যে তোমার মত নেই, ও জানে।

—ও জানল কী করে?

—রাগ করবে না বলো। তাহলে বলব।

—ঠিক আছে, রাগ করব না, বলো।

—কথায় কথায় আমিই না... বলে দিয়েছি।

শুনে একটু রাগই হয়ে গেল। কিন্তু ওকে কথা দিয়েছি, রাগ করব না। তাই মাথা ঠান্ডা রেখেই বললাম, 'শুনে বুলবুল কী বলল?'

—জিজ্ঞেস করল, তোর টুম্পাইদা কি অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে?

—তুমি কী বললে?

—বানিয়ে বানিয়ে বলে দিলাম। হ্যাঁ করে, তবে মেয়েটা কলকাতায় থাকে না। মুম্বইয়ে থাকে। বিরাট বড়লোকের মেয়ে। বাঙালিও না....

যাক বাবা, ভালই করেছে। আমার ভালর জন্য লালি যদি মিথ্যে কথা বলেই

থাকে, তাহলে আমার আপত্তির কী আছে? বুলবুল নিশ্চয়ই কথাটা বিশ্বাস করেছে। এ সব ক্ষেত্রে অন্য মেয়েরা যা করে, বুলবুলও নির্ঘাতি তাই করবে। বাড়িতে জানিয়ে দেবে, এ বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব না। কোন মেয়েই বা চাইবে, অন্যের সঙ্গে প্রেম করতে থাকা কোনও ছেলেকে বিয়ে করতে? নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কথা বুলবুল বিশ্বাস করল নিশ্চয়ই?'

—সেটা তখন বুঝতে পারিনি।

—বানিয়ে কী লাভ হল তাহলে?

—আরে.... আমি তো ভেবেছিলাম, এই সব শুনলে ও আর তোমার নামই কোনও দিন তুলবে না। কিন্তু উল্টোটা হয়েছে, জানো। আজ কলেজ যাওয়ার সময় কী বলল, শুনবে? 'দেখিস লালি, তোর ওই টুম্পাইদাকেই এক দিন আমার গলায় মালা দিতে হবে। সন্তোষী মা আমাকে হিন্টস দিয়েছে।'

সর্বনাশ! এ কেমন ধরনের মেয়ে! বললাম, 'সন্তোষী মা আবার কে?'

—এ মা তাও জানো না? খুব জাগ্রত ঠাকুর। চন্দনা বউদিও তো বিয়ের আগে সন্তোষী মা করত।' ভক্তিভরে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে লালি ফের বলল, 'আমিও করি। বউদি বলে, মেয়েরা সন্তোষী মা করলে মনের মতো বর পায়। জানো টুম্পাইদা, বুলবুল না.... আগে ঠাকুরঘরও মাড়াত না। সেই মেয়ে কি না এখন প্রতি শুক্কুরবার উপোস করে। কোনও রকম টক ছোঁয় না।' ফের কপালে দু'হাত ছোঁয়াল লালি।

ওর ভক্তি দেখে আমার হাসি পেল। বললাম, 'তোমার মিথ্যে কথাটা আমার কোনও কাজেই লাগল না তাহলে।'

কী করব বলো। আমারই দোষ। আমার মুখে তোমার ডাকাত ধরার গল্প শুনে বুলবুল যে তোমার প্রেমে পড়ে গেছে! কী বলে জানো, এই ছেলেই দরকার, যে মেয়েদের প্রোটেক্ট করতে পারবে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব, টুম্পাইদা?

—বলো।

—বিয়েতে তোমার আপত্তি কেন বলো তো? বুলবুল কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। ওরা অত বড়লোক, তবুও কোনও গুমোর নেই। তোমার সঙ্গে খুব মানাবেও। আমাদের সারা কলেজে ওর মতো সুন্দরী মেয়ে একটাও নেই। গাড়ি থেকে যখন নামে, সবাই ওর দিকে চেয়ে থাকে।

লালির অস্ত্রেই লালিকে বধ করতে হবে। তাই বললাম, 'ও না কি কোন এক মারোয়াড়ি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে?'

—ধ্যাৎ, হি হি করে হেসে উঠল লালি। তার পর বলল, 'বাজে কথা। ও তো আমিই বানিয়ে বানিয়ে চন্দনা বউদিকে বলে গেছিলাম। একদম বিশ্বাস কোরো না।

প্রেম করার সাহসই ওর নেই। এত ভিতু, তুমি ভাবতেও পারবে না। দাদার সঙ্গে এক দিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। ঘেমে নেয়ে একসা।

—ওকে বলে দিও, আমার আশায় যেন একদম না থাকে!

—যাঃ, তাই বলা যায় না কি? বেচারা এমনিতেই এখন খুব মনোকষ্টে আছে। ওদের বাড়িতে একটা বিপদ হয়েছে, জানো?

—কী হয়েছে?

—ওর বাবা....চান করতে গিয়ে বাথরুমে পড়ে গেছেন। হাড় ভাঙেনি। কিন্তু নার্ভে এমন চোট লেগেছে, ডাক্তার বলছে, প্যারালিসিস হয়ে যেতে পারে।

শুনে চমকে উঠলাম। এই রে! যা ভেবেছিলাম, তাই হতে যাচ্ছে। ওই নীলা ধারণের কুফল। মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। সকালে যখন টোটাদের বাড়িতে বুলবুলকে দেখলাম, তখন তো মনে হয়নি ওর বাড়িতে বিপদ? লালি কি এটাও বানিয়ে বানিয়ে বলছে? নাঃ, ওর মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।

শাস্ত্রীজির ওপর মারাত্মক রাগ হল। গিরিজাবাবুকে কেন উনি নীলাটা পরতে বললেন? ওই নীলা যদি আঙুল থেকে এখুনি খুলে ফেলা না যায়, তাহলে গিরিজাবাবুর প্রাণসংশয় পর্যন্ত হতে পারে। এই মুহূর্তে গ্রহনক্ষত্রের যা অবস্থা, তাতে মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, কাল সকাল সাড়ে সাতটার আগেই এই কাজটা করতে হবে। না হলে সারা জীবনও আর গিরিজাবাবু বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এই কথাটা বলব কাকে?

আমি বললে, গিরিজাবাবু হয়তো গুরুত্ব দেবেন। তাহলে আবার পুরো ব্যাপারটাই অন্য দিকে মোড় নেবে। গিরিজাবাবু নিশ্চয়ই বাবাকে ছেড়ে দেবেন না। ফের বাবার সঙ্গে আমার লেগে যাবে। হঠাৎ মনে হল, আরে....খারাপ কী? এটাই তো আমি চাই। আমার মুম্বই চলে যাওয়ার জন্য একটা পরিস্থিতি তো দাঁড় করাতে হবে। এর থেকে আর বড় সুযোগ পাওয়া যাবে? ফট করে এই কথাটা মাথায় খেলে যাওয়ার পর বারান্দা থেকে আমি ঘরে চলে এলাম। গিরিজাবাবুর ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে। বাড়িতে লোকজন কমে গেলে তখন না হয় ফোন করা যাবে।

আমার পিছন পিছন লালিও ঘরে ঢুকে এসেছে। ওকে বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে টোটা আসেনি?'

—না। দাদা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গেছে। তবে আসবে বলেছে। এই যাঃ, চন্দনা বউদি যে কারণে আমাকে ওপরে পাঠাল, এত ক্ষণ সেটাই তোমাকে বলা হয়নি। কী ভুলো মন হয়েছে আমার দ্যাখো।

—কী বলেছে?

—বলল, টুম্পাইকে বলবি, টি শার্ট পরে যেন ঠাকুরঘরে না আসে। পয়লা

বোশেখের দিন দক্ষিণাপণ থেকে আমি যে পাঞ্জাবিটা এনে দিয়েছি, সেটা পরে যেন নীচে নামে। আর বলবি, বাড়ি-ভর্তি কুটুম। গলায় সোনার চেন, আর চার-পাঁচটা আংটি যেন গলিয়ে নেয়। বাবা কিন্তু বাড়িতে আছে। শেষের কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে গেল। বাবা বাড়ি আছে, তো আমার কী? এখন আমি কাউকেই ভয় পাই না। রাগ হলেও, লালির সামনে সেটা প্রকাশ করা ঠিক না। তাই বললাম, 'ঠিক আছে। তুমি যাও। চান করে আমি নামছি।'

তোয়ালে টেনে নিয়ে আমি চানঘরে ঢুকে পড়লাম। ব্যায়াম করার সময় আংটিগুলো আমি খুলে রাখি। প্রায়ই পরতে ভুলে যাই। বউদির কী নজর! ঠিক সে কথা জানে। তাই মনে করিয়ে দিয়েছে। আমাদের বেনেবাড়ির কুটুমরা ও সব খুব লক্ষ করে। কার গায়ে কত সোনা! আমি জানি, মা আর বউদির গা-ভর্তি আজ গয়না। কুটুমদের আর কাজটা কী! বেশির ভাগই এখনও শুয়ে বসে কাটায়। বাপ-ঠাকুরদা সম্পত্তি রেখে গেছে। সেই সব ভাঙিয়েই দিন কাটাচ্ছে। বাবার তরফের কাউকেই আমার ভাল লাগে না। এক একটা অকেশনে ওঁরা এ বাড়িতে আসেন। আর হিংসেয় জ্বলে মরেন আমাকে আর দাদাকে দেখে। দাদার ওপরই রাগটা বেশি। বিলেত ফেরত বলে।

শাওয়ার খুলে দিতেই শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেল। আর তখনই ফের গিরিজাবাবুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভদ্রলোককে মাত্র এক দিনই দেখেছি। সুস্থ সবল মানুষ। এখন বিছানায় পড়ে আছেন। যত দূর জানি, উনিই ফ্যামিলির একমাত্র পুরুষ। ওঁর কিছু হয়ে গেলে পুরো পরিবারটাই তছনছ হয়ে যাবে। নাঃ, এটা হতে দেওয়া যায় না। চোখের সামনে টোটাদের ফ্যামিলিটাকে গাড্ডায় পড়তে দেখেছি। বুলবুলদের অবস্থা তো আরও খারাপ হতে বাধ্য। ফ্যামিলিতে আর কোনও পুরুষ মানুষ নেই। এখুনি একটা কিছু করা দরকার।

কীভাবে কথাটা গিরিজাবাবুকে বলব, ভেবে নিলাম। দু'ভাবে হতে পারে। এক, পরিচয় দিয়ে। আর এক, নামটা না বলে। দেখুন, আপনার একজন ওয়েলউইশার বলছি। আমি একটু-আধটু জ্যোতিষচর্চা করি। সে দিন দত্ত জুয়েলার্স থেকে আপনাকে নীলা কিনতে দেখলাম। ওটা খুলে ফেলুন। ওটা পরার জন্য আপনার পক্ষাঘাত হতে পারে। সারাজীবন আপনাকে আপসোস করতে হতে পারে, আপনার জীবন সংশয় হতে পারে....ইত্যাদি ইত্যাদি। ও দিক থেকে গিরিজাবাবু যদি বেশি প্রশ্ন শুরু করেন, তাহলে তখনই না হয় ফোনটা রেখে দেব। কিন্তু ওদের ফোনে যদি সিএল আই লাগানো থাকে, তাহলে তো আমি ডুবে যাব। ও বাড়ির ফোন নাম্বারটা উনি পেয়ে যাবেন। পরক্ষণেই আমাদের বাড়িতে ফোন করে উনি জানতে চাইবেন, কে ফোন করে ওই সব কথা বলেছিল। তখন ধরা পড়ে যাব। নাঃ, তার চেয়ে সাফ

সাফ জানিয়ে দেওয়াই ভাল। দোষটা শাস্ত্রীজির ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাক। তার পর যা হয় হোক, মুখোমুখি হওয়া যাবে। মনস্থির করে চানঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। চোখের সামনে একটা ফ্যামিলি বিপদের মুখে পড়বে, আর সেটা দেখেও মুখ বুজে থাকতে হবে, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মোছার ফাঁকে আর একটা সন্দেহও মনে এল। বাবা কি ইচ্ছে করেই গিরিজাবাবুকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল? হয়তো দীর্ঘ দিনের কোনও হিসেব চোকানো বাকি আছে। কে জানে, এমন কোনও কারণ, আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না। আমার বাবার পক্ষে অবশ্য কোনও কিছু অসম্ভব না। এমন অর্থলোভী।

বউদির দেওয়া পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে নিয়েই ফোনের সামনে গিয়ে বসলাম। আর অপেক্ষা করা উচিত না। একজনের জীবন-মরণ সমস্যা। ডায়াল করতেই ও প্রান্তে একটা মিষ্টি গলা, 'কাকে চান?'

বুলবুল না কি? এক বার ভাবলাম, ফোনটা রেখে দিই। পর ক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'গিরিজাবাবু আছেন?'

—বাবা অসুস্থ। কে বলছেন?

—আমি কুন্তল দত্ত বলছি। ফোনটা ওঁকে দেওয়া যাবে?

কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। তার পর গলায় কৌতুকের সুর, 'বাবার সঙ্গে কী দরকার, আমাকে বলতে পারেন।'

—আপনি কে বলছেন?

—আমি ওঁর ছোট মেয়ে বুলবুল।

তাহলে আর আপনি আপনি করে কথা বলার দরকার নেই। বললাম, 'বাড়িতে এখন তোমার মা আছেন?

—না, না তো আপনাদের বাড়িতেই গেছেন। কী যেন পুজো আছে, চন্দনাদি ফোন করে নেমন্তন্ন করেছিলেন। মা এলে কিছু বলতে হবে?

—না কাজটা তোমাকে দিয়েও হতে পারে।

—আমাকে দিয়ে? কী করতে হবে বলুন?

—তার আগে তুমি প্রমিস করো, আমি যে তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম, তা আর কাউকে জানাবে না।

PATHAGAR

—কেন বলুন তো?

—জানালে আমার অসুবিধা হবে। একটা কথা বিশ্বাস করে তোমাকে বলতে পারি?

—বলুন।

—সে দিন আমাদের শোরুম থেকে তোমার বাবা একটা নীলা কিনেছিলেন।

সেটা কি উনি ধারণ করেছেন?

—হ্যাঁ। কয়েক দিন আগে।

—বাবাকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে এখুনি নীলাটা হাত থেকে খুলে ফেলো।

—কী বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। ফোনটা আমি ধরে আছি। তুমি যাও, এখুনি তুমি এই কাজটা করবে। কোথায় আছেন তোমার বাবা?

—কাছেই। আচ্ছা.... আপনি যা চান, করছি।

রিসিভারটা ঠক করে রাখার শব্দ হল। আমি দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কেউ এখন ওপরে উঠে এলেই মুশকিল। হাত থেকে তির এক বার বেরিয়ে গেছে। এখন অবশ্য চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। বাবার সঙ্গে আর একটা ঝামেলা লেগে গেল। লাগুক, আমি তো এটাই চাইছিলাম।

ও প্রান্তে একটু পরে ফের রিসিভার তুলে বুলবুল বলল, 'আংটিটা খুলে নিয়েছি। এ বার কী করতে হবে, বলুন।

—তোমার বাবা টের পাননি?

—না উনি এখন ঘুমোচ্ছেন।

—গুড। এ বার আংটিটা এমন জায়গায় রেখে দাও, যাতে সূর্যের আলো না লাগে। যদি সম্ভব হয়, ওটা কালো কাপড়ে মুড়ে রাখতে পারো।

—বাবাকে কী বলব? মানে.... যদি আংটিটা দেখতে না পেয়ে উনি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে?

—শুধু বলো, আমি খুলে রাখতে বলেছি।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলো।

—লালির কাছে শুনেছি, আপনি না কি লোককে যা বলে দেন, মিলে যায়। এটা সত্যি?

—লালি আর কী বলেছে?

গলায় ফের কৌতুকের আমেজ, 'সে সব শুনলে আপনি লজ্জা পাবেন। লালি বলেছিল, বুলবুল খুব ভিতু টাইপের। ছেলেদের সামনাসামনি হলে না কি ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে যায়। কোথায় কী! এই মেয়েটাকে তো খুব স্মার্ট বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য ফোনে যে কথা বলছে, সে আদৌ বুলবুল কি না, জানি না। ওর হয়ে প্রক্সি দেওয়ার মতো ওদের বাড়িতে আর কেউ আছে বলেও আমার জানা নেই। তার চেয়ে লালিকে অবিশ্বাস করা অনেক নিরাপদ। হয়তো আমার কাছে একেবারে উল্টো পরিচয়টা দিয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে বেশি ক্ষণ কথা বলা আমার ধাতে নেই। তবুও বুলবুলের

সঙ্গে কথা বলতে মন্দ লাগছে না। তাই বললাম, 'শুনিই না, লালি আমার সর্ম্পকে তোমার কাছে কী বলেছে?'

—আপনি না কি মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলেন না। কী সত্যি?

—খানিকটা সত্যি।

—আপনাকে দেখে তো তা মনে হয় না।

—কী মনে হয় আমাকে দেখে?

—আজ পর্দার ফাঁক দিয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিলেন কেন? তখন তো আপনাকে আমার অন্য রকম মনে হচ্ছিল।

খুব অপ্রিয় প্রশ্ন। খেই হারিয়ে ফেললাম। কী উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় বুলবুলই ফের বলল, 'রাগ করলেন না কি?'

—না না। আসলে তখন টোটা বলল তোমাকে দেখতে। তাই কৌতূহলেই পর্দাটা সরিয়ে ছিলাম।

—আমি কি খুব খারাপ দেখতে?

—এই উত্তরটা এখন দেব না। আচ্ছা, ছাড়ি তাহলে।

—থ্যাংকস কুন্তলদা।

—কেন?

—বাবার জন্য।

—আশা করি কাউকে কিছু বলবে না।

—আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

ফোন ছেড়ে নীচে নেমে এসে দেখি পুজো শেষ হয়ে গেছে। দোতলার দক্ষিণ দিকে ঠাকুরঘর আর তার লাগোয়া বারান্দায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রচুর লোক। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে লালি ঘুরে ঘুরে সবাইকে আগুনের তাত দিচ্ছে। বারান্দায় এত লোকজন বাবার চোখে পড়লে, খুব রেগে যাবে। দোতলার বারান্দায় লোকজনের বেশি হাঁটাহাঁটি বাবা পছন্দ করে না। কেননা বারান্দায় দু'পাশে বেশ কিছু মার্বেল স্ট্যাচু দাঁড় করানো আছে। আগে এই মূর্তিগুলো পিছনের বাগানে সাজানো ছিল। রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বাবা সব বাড়ির ভেতর এনে রেখেছে। বাবা চায় না, কারও ধাক্কা-টাক্কা লেগে ভেঙে যাক।

ঠাকুরঘরে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। আমি জানি, এই মুহূর্তে শাস্ত্রীজি ঠাকুরঘর আলো করে বসে আছেন। আমাদের বাড়িতে পুজো হলেই বাবা ওঁকে আসতে বলেন। যত ক্ষণ উনি থাকেন, পারতপক্ষে কাছেই যাই না। উল্টো দিকে দাদার ঘরটার দিকে চোখ যেতেই, বউদির বাবাকে নজরে পড়ল। সোফায় বসে আছেন শীলমশাই। ডান দিকে অপরিচিত এক মহিলা। বাবাও আছে। চেয়ারে বসে কথা বলছে শীলমশাইয়ের

সঙ্গে। একটু পিছনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু কাকা। তার মানে পুজোর জন্য দোকানের সব কর্মচারীই এসেছে। অন্য কারও ওপরে ওঠার অনুমতি নেই। বিষ্ণুকাকা ছাড়া। অন্যরা নিচে বৈঠকখানায় আছে।

শীলমশাইকে অনেক দিন পর দেখলাম। আমাকে খুব ভালবাসেন। এক বার প্রণাম করার ইচ্ছেয়, দাদার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সামনে এসে দাঁড়াল লালি। প্রদীপের শিখা থেকে তাত নিয়ে আমার কপালে ছুঁইয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দারুণ লাগছে কিন্তু টুম্পাইদা তোমাকে।'

জানতাম বলবে। এই একটা কারণে আমি পাঞ্জাবি পরতে চাই না। আমাকে না কি কার্তিক-ঠাকুরের মতো লাগে। ঠাকুরঘরে গেলে এখুনি মেয়েমহলে টিকা-টিপ্পনি শুরু হয়ে যেত। তার চেয়ে দাদার ঘরে ঢুকে পড়াই ভাল। এক পা এগোতেই লালি নিচু গলায় বলল, 'টুম্পাইদা, তোমার হবু শাশুড়িকে দ্যাখো। বউদির ঘরে বসে গল্প করছে শীলমশাইয়ের সঙ্গে।'

সঙ্গেসঙ্গে আমার পা আটকে গেল। হবু শাশুড়ি... মানে বুলবুলের মা। ওহ, ওই মহিলা তাহলে গিরিজাবাবুর স্ত্রী! মাথা খারাপ? এখন দাদার ঘরে কেউ যায়? তার চেয়ে নীচে নেমে যাওয়াই ভাল। সিঁড়ির দিকে এক পা এগোতেই বিষ্ণুকাকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'টুম্পাই, দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

একটু অবাক হয়েই বললাম, 'কী কথা কাকা?'

—এখানে বলা যাবে না। নিচে চলো। ঘাবড়ে যেও না। তোমার জন্য সুখবরই আছে।

আর কোনও প্রশ্ন না করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। প্যাসেজ দিয়ে একটু হেঁটে এলেই ডান দিকে আমাদের বৈঠকখানা ঘর। সেখানে এত লোক বসে যে, আলাদা কথা বলার জায়গা পর্যন্ত নেই। বাধ্য হয়ে দু'জনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামনে বেশ বড় লন। ঠিক মধ্যিখানে একটা ঝরনা। আগে চারপাশে প্রচুর বাহারি গাছ ছিল। গরমকালে লনে বসে আড্ডা মারার জন্য লোহার সুন্দর সুন্দর বেঞ্চও। তখন অবশ্য আশপাশে কোনও বড় বাড়ি ছিল না। তাই আড্ডা মারা যেত।

ঝরনার ধারে বসে বিষ্ণুকাকা বললেন, 'কাল থেকে তোমার কাঁধে বিরাট দু'টো দায়িত্ব চাপানো হবে। তুমি কি কিছু শুনেছ?'

বললাম, 'না তো।'

—এলগিন রোডে তোমাদের একটা নতুন শো-রুম হচ্ছে।

কথাটা দাদা এক দিন বলেছিল বটে! এলগিন রোডে পি সি চন্দ্ররা নতুন শো-রুম করার পর থেকেই কথাটা দাদার মাথায় ঘুরছে। বাবাকে তাহলে রাজি করিয়েছে। কিন্তু দত্ত জুয়েলার্সের নতুন শো-রুম নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যাথা নেই। এক পা

আমি মুম্বইয়ের দিকে বাড়িয়ে আছি। তাই কোনও প্রশ্ন না করে আমি বিষ্ণুকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—শো-রুম করার পুরো ঝক্কিটা কিন্তু তোমাকেই সামলাতে হবে টুম্পাই।

—এই ডিসিশনটা নিল কে বিষ্ণুকাকা?

—কে আবার? তোমার বাবা। ওঁকে আবার কিছু জিজ্ঞেস করতে যেও না। তোমার দাদা আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

শুনে মনে মনে হাসি পেল, আমার সম্পর্কে একটা ডিসিশন নেওয়া হচ্ছে, আমার মতামত ছাড়াই। এত ছোট বোধহয় আমি নেই। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রথম দায়িত্বের কথা তো শুনলাম। আমার দ্বিতীয় দায়িত্বটা কী?'

—কাল থেকেই আমাদের শো-রুমে শাস্ত্রীজির জায়গায় তোমাকে বসতে হবে।

—কেন? শাস্ত্রীজি?

—ওঁকে তো তোমার বাবা কাল তাড়িয়ে দিয়েছেন। তুমি কি কিছুই শোনোনি?

নয়

সকালে জলখাবার খেয়ে বাইরে বেরুচ্ছি, এমন সময় মা এসে বলল, 'হ্যাঁ রে টুম্পাই, তুই না কি আজকাল শাস্ত্রীজির চেম্বারে বসছিস?' মা সাধারণত ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলে না। বাবা আর দাদা লাঞ্চ বা ডিনার টেবিলে আলোচনা করে তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু লক্ষ রাখে, বাবার পাতে ঠিকঠাক সব পড়ছে কি না। মাকে তাই এই প্রসঙ্গ তুলতে দেখে একটু অবাক হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, গত সপ্তাহ থেকে বসছি।' আজ থেকে আর বসবি না।

মা এমন জোরের সঙ্গে কথাটা বলল, আমি বেশ চমকেই উঠলাম। বলছেটা কী? বাবার আদেশ অমান্য করার সাহস এ বাড়িতে কারও নেই। মাকে তো কোনও দিন কোনও ব্যাপারে সামান্য প্রতিবাদ করতেও শুনিনি। বাবা খড়ম পরে একটু শব্দ তুলে হেঁটে গেলেও মাকে ভয় পেতে দেখেছি। আমার সেই পতিব্রতা মায়ের গলায় কেন বিদ্রোহের সুর, চোখেই বা কেন আগুনের ছটা, ঠিক বুঝলাম না। বললাম, 'কেন মা?'

—তুই হলি নগেন শীলের নাতি। তুই কেন লোকের হাত দেখে বেড়াবি? ছ্যাঃ। তোর বাবার কি ভীমরতি ধরেছে?

আমি আর এক বার হোঁচট খেলাম। মা বলে কী? লোকে আমায় নতুন বাজারের গোরা দত্তের নাতি বলে জানে। কেউ কোনও দিন আমাকে দর্জিপাড়ার

নগেন শীলের নাতি বলে ডাকেনি। মায়ের বাবার নাম নগেন্দ্রনাথ শীল। গল্প শুনেছি, তিনি না কি টাকা পুড়িয়ে সেই আগুনে চা তৈরি করে, সাহেবদের খাইয়ে এক বার নিজের বড়লোকি দেখিয়ে ছিলেন। দাদুর বাবা গোপীনাথ শীল না কি এক বার বাড়িতে বেড়ালের বিয়েতেই লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। মা সেই বংশের মেয়ে। তাই মাঝেমাঝে কথাবার্তায় বংশ গৌরবের কথা বেরিয়ে পড়ে।

আমি কোনও কথা বলছি না দেখে মা ফের বলল, 'তোর দাদাকে আমি বলে দেব। দোকানের জন্য অন্য কোনও জ্যোতিষী দেখতে। তেমন হলে পণ্ডিতজি গিয়ে দু'দিন বিবেকানন্দ রোডের দোকানে গিয়ে বসবেন। মোট কথা, তুই ওই কাজ করবি না। এই আমি বলে রাখলাম।'

আমাদের গড়িয়াহাটের দোকানে যিনি বসেন, তাঁর নাম চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। মানুষটি খুব সৎ। বিবেকানন্দ রোডের শোরুমে তিনি স্বচ্ছন্দে দু'দিন বসতে পারেন। হ্যাঁ, এই ব্যবস্থা করা যায়। বাবার মাথায় এ ব্যাপারটা আসেনি। অদ্ভুত, মায়ের মাথা খেলে গেছে। শুনে বেশ ভাল লাগল। বললাম, 'বাবা যদি জানতে চায়, দোকানে কেন যাচ্ছি না, তাহলে কী বলব মা?'

—তখন আমার কথা বলবি। আমি মানা করেছি। আমি তোকে বলছি, তুই সকালে যেমন এলগিন রোডে যাচ্ছিস, তেমনই যাবি। বাড়ি ফিরে এসে আগে যেমন জোড়াবাগানে যেতিস, বিকেলে তেমনই যাবি।

আমার ব্যাপারে মা কেন এত নাক গলাচ্ছে, বোধগম্য হল না। এ তো বাবার সঙ্গেসরাসরি সংঘর্ষে যাওয়া। মা সামলাতে পারবে তো? মনে হল, আমার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, যা আমি জানি না। পরে বউদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আসলে বাড়ির কোনও ব্যাপারেই আমি থাকি না। ফলে কিছু জানতে পারি না। ইদানীং তো আগ্রহ আরও কমে গেছে। মুম্বই চলে যাব বলে। মায়ের সঙ্গে আর কথা বাড়ানো বোধহয় ঠিক হবে না। তাই গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঠিক আছে মা। তুমি যা বলছ, বাবাকে তাই বলে দেব।'

আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে রামশরণ গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আজকাল বাড়ির মেয়েদের গাড়িটা আমার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। গাড়িতে করে রোজ এলগিন রোডে যাচ্ছি। ফিরছি সেই বিকেলের দিকে। বউদি দুপুরে লাঞ্চ পাঠিয়ে দিচ্ছে মতির হাত দিয়ে। আমার ক্যারাটে প্রাকটিস মাথায় উঠেছে। বিকালের দিকে ক্লাবে আর যেতেই পারছি না। আমার জীবনের রুটিনটাই পালটে গেছে।

এলগিন রোডের ওখানে আমার মায়ের একটা একতলা বাড়ি আছে। একশো-সোয়াশো বছর আগেকার বাড়ি। একদম জরাজীর্ণ অবস্থায়। সেই বাড়ি ভেঙে

ফেলা হচ্ছে। ওখানেই আমাদের নতুন শো-রুম তৈরি হবে। মাকে বাড়িটা দিয়ে গেছিল আমার দাদু। কেউ থাকত না। তালাবন্ধ অবস্থায় দীর্ঘ দিন পড়েছিল। যেদিন ভাঙা শুরু হল, সে দিন সকালে মা আমায় বলেছিল, বাড়িটা না কি দাদু কিনেছিল কোন এক ইংরেজের কাছ থেকে। অভিশপ্ত বাড়ি। কেউ টিকত না। দাদু না কি কয়েক বার ভাড়া দিয়েছিল। ভাড়াটেরা দু'তিন মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ইংরেজ আমলে তৈরি বাড়ি। তিরিশ ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়াল। ভাঙতে সময়ও লাগছে। বাবা বাড়ি ভাঙার দায়িত্ব দিয়েছে হামিদ বলে একজন ঠিকাদারকে। লোকটা পুরনো বাড়ি ভাঙার ব্যাপারে এক্সপার্ট। প্রায় জনা পঁচিশ লোক খাটছে। গত দশ দিনে ওরা ছাদ ভেঙে ফেলেছে। জানলা-দরজা যত্ন করে খুলে আলাদা করে রেখেছে। সেগুলো না কি কেনার লোক আছে। হামিদ সে দিন আমায় বলেছিল, দেওয়ালের ইট কেনার জন্যও না কি কয়েকজন খোঁজ করে গেছে। পুরানো দিনের বাড়ির ইট না কি টেঁকসই। তাই চাহিদা আছে।

বাড়ির সামনে-পিছনে অনেকটা জায়গা। সামনের দিকে টিনের একটা শেড করেছে হামিদ। রোজ সেখানে গিয়ে আমি বসি। কাজ কতটা এগোচ্ছে, খেয়াল রাখি। এক মাসের মধ্যেই নতুন বাড়ির জন্য ভিত কাটা হবে। ছয় মাসের মধ্যে তা তৈরি হয়ে যাবে। বাড়িটা আপাতত হচ্ছে তিনতলা। একতলায় শো-রুম। প্রায় চার হাজার স্কোয়ার ফুটের। দোতলাটা কোনও ব্যাঙ্ক বা অফিসকে ভাড়া দেওয়া হবে। আর তিনতলায় করা হবে গেস্ট হাউস। শো-রুমের উদ্বোধন পয়লা জানুয়ারি। বাবা বলেছে, এই শেডিউলের যেন একদম নড়চড় না হয়।

প্রথম দু'একদিন এল গিন রোডে গিয়ে ভাল লাগেনি। কিন্তু হামিদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়ার পর এখন রোজ যেতে ইচ্ছে করে। লোকটা বিষ্ণুকাকার বয়সি। থাকে আন্দুল বা তার কাছাকাছি কোনও জায়গায়। রোজ ভোরবেলায় ট্রেনে করে চলে আসে। আমি পৌঁছনোর ঘণ্টা দুয়েক আগেই কাজ শুরু করে দেয়। মাঝেমাঝে আমার সঙ্গে যখন গল্প করে তখন বুঝি, লোকটার অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। প্রায় দিনই দুপুরে দেখি, জনমজুর খাটানোর ফাঁকে শেড-এর তলায় এসে নামাজ পড়ে যায়। এমনই ধর্মভীরু।

বিবেকানন্দ রোড দিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে ঢোকার সময়ই হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। এই সময় কে আবার ফোন করল? সুইচ অন করে হ্যালো বলতেই ও পাশ থেকে যেন বললেন, 'একটু ধরুন, বড়বাবু কথা বলবেন।'

কয়েক সেকেন্ড পরেই প্রকাশ বিশ্বাসের গলা, 'কুন্তলবাবু, পোস্তা থানার ও সি বলছি। আপনি এখন কোথায়?'

—কাছাকাছিই আছি। কেন বলুন তো?

—এখুনি এক বার আসতে পারবেন?

—কী ব্যাপার, প্রকাশবাবু?

—জন্মেঞ্জয় শাস্ত্রী বলে কাউকে আপনি চেনেন?

আমাদের দোকানের শাস্ত্রীজি। বললাম, 'হ্যাঁ চিনি।'

—একটা ফ্রড কেসে ওকে আমরা আজ তুলে এনেছি। লোকটা বলছে, আপনাদের দত্ত জুয়েলার্সের সঙ্গে না কি অ্যাটাচ্‌ড। সত্যি?

—অ্যাটাচ্‌ড ছিল। এখন আর নেই। বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—আই সি। ফোনে সব কথা বলা যাবে না। আপনি এক বার আসবেন? লোকটা কিন্তু আপনাদের ফাঁসাবার চেষ্টা করছে।

শুনেই আমার রাগ হয়ে গেল। বাবাকে এই লোকটা সম্পর্কে অনেকবার সাবধান করেছি। আমার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। এই বার বুঝুক। শাস্ত্রীজিকে বাবা কেন বের করে দিয়েছে সেটা অবশ্য বিষ্ণুকাকা সে দিন আমাকে বলতে পারেননি। মনে হল, ঠিক কারণটা জানে না। পরে দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। দাদাও এড়িয়ে গেল। প্রকাশ বিশ্বাস বললেন, ফ্রড কেস। তার মানে প্রতারণা। শাস্ত্রীজির পক্ষে এই অপরাধটা করাই স্বাভাবিক। নাঃ, এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমাদের ব্যাবসার গুডউইল-এর ব্যাপার। এখুনি গিয়ে ডিটেল জানা দরকার, ঠিক কী হয়েছে।

রামশরণকে বললাম, 'গাড়িটা ঘুরিয়ে নে। এক বার পোস্তা থানায় যেতে হবে।' কিছু দিন হল সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর মাঝে লোহার ডিভাইডার বসেছে। তাই রামমন্দির দিয়ে অনেকটা ঘুরে ফের বাড়ির দিকে আসতে সময় লেগে গেল। আজ কখন এলগিন রোডে যেতে পারব কে জানে? হামিদকে কাল বলেছিলাম, এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব। সেই সময় অনুযায়ী, ও তিন-চারজনকে আসতে বলেছিল, যারা পুরনো দরজা জানলা কিনতে চায়। লোকগুলো আমার জন্য বসেই থাকবে। মনে হয়, ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না।

পোস্তা থানায় পৌঁছে দেখি, গলির সামনে বেশ ভিড়। থানার সামনে বেশ কিছু আমার বয়সি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে একটা চেনা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'কুন্তলদা, আমরা কিন্তু লোকটাকে ছাড়ব না।'

ছেলেটাকে জোড়াবাগান পার্কে প্রায়ই দেখি। নামটা চট করে মনে পড়ল না। আমাদের ক্লাবের পাশে পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতি বলে একটা কুস্তির আখড়া আছে। সেখানে কুস্তি প্র্যাকটিস করতে যায়। সঙ্গেসঙ্গে অন্য ছেলেগুলো আমাকে ঘিরে ধরল। বললাম, 'কী ব্যাপার বলো তো? আমি তো ভাই কিছুই জানি না।'

—আরে, আপনাদের দোকানের অ্যাস্ট্রলজার... লোকটা আমাদের পাড়ার ননীবালা মাসিমার পাঁচ লাখ টাকার একটা হিরে হাপিস করে দিয়েছে।

—কীভাবে?

বিক্রি করে দেবে বলে মাসিমার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠেকিয়েছে। তার পর বলে কি না, হিরের দাম সত্তর হাজার। দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে। টাকা দেয় না। শেষে মাসিমার সন্দেহ হল। ওই হিরেরই আর একটা জোড় মাসির কাছে ছিল। সেটা আপনাদের দোকানে নিয়ে গিয়ে দেখাতেই শোনে, দাম পাঁচ লাখ টাকা। আপনাকে বলে দিচ্ছি কুন্তলদা, লোকটাকে এমন মার মারব, হাড্ডি চুর করে দেব। আমরা রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটের ছেলে। পুলিশকেও ভয় পাই না। দর্জিপাড়ায় গিয়ে শালার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আসব।

শাস্ত্রীজি থাকেন দর্জিপাড়ায়। পোস্তা থেকে এমন কিছু দূরে না। রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটের ছেলেদের আমি জানি। ওদের পক্ষে দর্জিপাড়ায় গিয়ে হামলা করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। যা জানার, তা আমার জানা হয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে থানার গেটের দিকে এগোতেই ছেলেগুলো আমার পিছন পিছন আসতে লাগল। শাস্ত্রীজি কাজটা খুব কাঁচা করে ফেলেছেন। থানায় ঢোকার আগে ছেলেগুলোকে বললাম, 'তোমরা দাঁড়াও। আগে শুনি পুলিশ কী বলছে।'

ও সি-র ঘরে ঢুকতেই প্রকাশবাবু বললেন, সরি, আপনাকে থানায় টেনে আনলাম। কিন্তু না এনেও উপায় ছিল না। দেখছেন তো, পাড়ার ছেলেরা কী রকম ভায়োলেন্ট হয়ে আছে।'

বললাম, 'শাস্ত্রীজি এখন কোথায়?'

—লক আপেই আছে। ওকে কোর্টে প্রোডিউস করতে হবে। ভাবলাম, তার আগে আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

—তার দরকার ছিল না। আপনারা লিগাল স্টেপস নিন।

—কী করে নেব বলুন তো। লোকটা এমন ভাব দেখাতে শুরু করল যে, ওকে কোনও কিছু করলে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

—তাই না কি? কী বলেছে?

—এক এক সময় এক এক কথা বলছে। প্রথমে বলছিল, হিরেটা না কি নেয়ইনি। তার পর বলল, হিরেটা আপনাদের দোকানে দিয়েছে। আমরা দু'চার থাপ্পড় মারতেই এখন বলছে, হরলালকা নামে কোন এক মারোয়াড়ির কাছে না কি বিক্রি করেছে। সেই লোকটার কাছে আমি একজন এস আই-কে পাঠিয়েছি। এখুনি এল বলে।

হেসে বললাম, 'ওই নামে সত্যিই লোক আছে?'

—না থাকলে শাস্ত্রীজির কপালে দুঃখ আছে। আজ আর কোর্টে তুলবই না। খচ্চরটাকে রাতে থার্ড ডিগ্রি দেব। এমন মার মারব, বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে।

চিটিংবাজ। উচিত কী জানেন, এদের একেবারে ধনেপ্রাণে মারা। আমি তো একটা টিভি চ্যানেলকে খবর দিয়েছি। ওরা এল বলে। লোকটা যে ফ্রড, টিভির খবরে সেটা দেখাক। এটা একটা একজাম্পল হয়ে থাকুক। ইন ফিউচার এই ধরনের অ্যাস্ট্রলজারের কাছে লোকে যেন না যায়।

মনে মনে আমি খুব খুশি। বললাম, 'এটা ভাল করেছেন আপনি।'

প্রকাশ বিশ্বাস উৎসাহ পেয়ে বললেন, 'প্রবলেমটা কী জানেন কুন্তলবাবু?' এই শাস্ত্রীজি লোকটা যদি গোঁ ধরে থাকে, হিরে নেয়নি, তাহলে প্রুভ করা মুশকিল হয়ে যাবে, ও নিয়েছে।'

—কেন? কোনও উইটনেসও নেই?

—না। কী বলব মশাই, মহিলাও তেমনই। একটু আগে তাকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। পরিষ্কার করে বলেই না, হিরেটা আসলে কার। প্রবলেমের ওপর প্রবলেম, হিরের কথা পাড়ায় চাউর হতেই একটা ইয়ং ছেলে সকালে এসে আমাকে বলে গেল, হিরেতে না কি তারও মালিকানা আছে। তার সৎমা ননীবালা না কি এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন। এবং চুপিচুপি বিক্রি করার তালে ছিলেন। বেনেবাড়ির সম্পত্তি, জটিল সব ব্যাপারস্যাপার। হিরেটা ফেরত পাওয়া গেলেও ননীবালা হাতে পাবেন কি না তাতে সন্দেহ আছে। ইয়ং ছেলেটা আবার ল' ইয়ার। আইনটাইন সব জানে। কোর্টে একটা মামলা ঠুকে দিলেই প্রবলেম।

—ভদ্রমহিলার নিজের কেউ নেই?

—উনি উইডো। অংশু শেঠদের জ্ঞাতি। ওঁর নাম তো শুনেইছেন। এম এল এ ছিলেন।... এই ননীবালার একটাই ছেলে। বছর চারেক আগে সে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। তখন এই জ্যোতিষীর কাছে ভদ্রমহিলা যাতায়াত শুরু করেন। ছেলের হোয়ার অ্যাবাউটস জানতে হোম-যজ্ঞ, তাবিজ-মাদুলি। শাস্ত্রীজি ভালই কামিয়েছে।

—সেই ছেলে কি ফিরেছে?

—না, মশাই, এখনও ফেরেনি। এ সব কি জ্যোতিষীর কাজ? বলুন তো মশাই। খুঁজে আমার কাজটা তো করব আমরা। ভদ্রমহিলা কী বললেন, জানেন? গত তিন-সাড়ে তিন বছরে এই শাস্ত্রীজি হোম-যজ্ঞ করার জন্য ওঁর প্রায় লাখ খানেক টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছেন। মানুষের কী অন্ধবিশ্বাস দেখুন!

—তার পর?

—তার পর আর কী। একটা ফ্যামিলিকে পেনিট্রেট করে গেলে এই ধরনের জ্যোতিষীরা যা করে, শাস্ত্রীজি সেটাই করেছে। একেবারে সর্বস্ব লুট করার প্ল্যান। আমাদের কাছে যদি কমপ্লেনটা না আসত, তাহলে আর কিছু দিনের মধ্যেই ভদ্রমহিলার আরও অনেক টাকা খসে যেত। যাকগে, আপনি আসায় একটা ব্যাপারে

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, শাস্ত্রী লোকটা আপনাদের হাউসের কোনও ব্যাকিং পাবে না।

বললাম, একেবারেই না।

—তাহলে আপনাদের শো-রুমে অ্যাস্ট্রলজারের কাজটা কে করছেন এখন থেকে?

—কাজটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছিলাম।

—আরে বাঃ। আপনারও এই গুণটা আছে না কি মশাই? বলেই ডান হাতের তালুটা আমার সামনে মেলে ধরলেন প্রকাশ বিশ্বাস, একটা ঝামেলায় পড়েছি রিসেন্টলি। দেখুন তো বেরিয়ে আসতে পারব কি না?

একটু আগেই জ্যোতিষীদের ওপর মানুষের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে প্রকাশ বিশ্বাস করেছিলেন। ভোল পাল্টে ফেললেন দেখে হেসে ফেললাম। এই ধরনের লোক আমার চেনা। এমন অনেক লোকও দেখেছি, বাইরে থেকে হম্বিতম্বি, হাত-ফাত দেখায় না কি একদম বিশ্বাস করেন না, টিভিতে প্রোগ্রামও করে এসেছেন বিজ্ঞানের যুগে জ্যোতিষচর্চা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে! তিনিই আবার লুকিয়ে হাত মেলে দিয়েছেন আমার সামনে।

ও সি-কে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ভদ্রলোক আমার ক্লাবের অনুষ্ঠানে ডাকলেই চলে যান। এ দিকে আবার আমার দেরিও হয়ে যাচ্ছে এলগিন রোডে যেতে। নাহ, আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেরিয়ে যেতে হবে থানা থেকে। চট করে প্রকাশ বাবুর হাতটা সামনে টেনে নিলাম। দু'একটা কথা বলেই উঠে পড়ার কথা ভাবছি, এমন সময় চোখে পড়ল তালুর ঠিক মধ্যিখানে কেতুর জায়গায় ছোট্ট একটা তিল। সর্বনাশ! এ তো মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতের কাছে নেই, তবুও বোঝা যাচ্ছে তিলের রং কালো। লালচে তিল হলে অতটা ক্ষতিকারক হত না। কালো তিল মানে দুর্নাম, কলঙ্ক।

সত্যি কথা বলে ফেললে আমার অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে। প্রকাশবাবু একের পর এক প্রশ্ন করতে শুরু করবেন। আমাকে কোনও একটা বিধান দিতে হবে। এত সময় এখন আমার হাতে নেই। এত দিন সখ করে জ্যোতিষচর্চা করেছি। দুমদাম ফোরকাস্ট করেছি। কিন্তু দোকানে বসার পর থেকে বুঝতে পারছি, এই পেশাটা ডাক্তারির মতো। একটু ধীরেসুস্থে রোগ ধরাটাই ভাল। তাতে লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন করা যায়। প্রকাশ বাবুর হাতে যা দেখার আমি দেখে নিয়েছি, তবুও বেশ কয়েক মিনিট হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পর হাসি ফুটিয়ে আমি বললাম, 'আপনার হরোস্কোপটা কি হাতের সামনে আছে?'

—কেন বলুন তো মশাই?

মিথ্যে কথা বলা ধাতে নেই। ঘুরিয়ে বললাম, 'তাহলে আরও নিখুঁত বলতে

পারতাম। শুধু হাত দেখে সব বোঝা যায় না।'

—খারাপ কিছু আছে না কি?

—একটু আছে। কোনও মহিলাঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

শুনে মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল প্রকাশবাবুর। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে তার পর বললেন, 'কী করা যায় বলুন তো মশাই?'

কথাটা উনি এমন অসহায়ভাবে বললেন যে, মনেমনে হাসলাম। এমন দাপুটে দারোগা, তাঁর কী হাল। আমি তো তাও পুরোটা বলিনি। ভদ্রলোক কেলেঙ্কারিতে এমন ফাঁসবেন, চাকরি থেকে সাসপেন্ডও হয়ে যেতে পারেন। কথাটা বললে প্রকাশবাবু আরও ঘাবড়ে যেতে পারেন। তাই হাসিমুখে বললাম, 'একটা কাজ করুন মশাই। আপনার হরোস্কোপটা নিয়ে আজ বিকেলের দিকে আমাদের ক্লাবে আসুন। আলাদা করে বসে যাব। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

বলেই আমি উঠে পড়লাম। আমার দেখাদেখি প্রকাশবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কুন্তলবাবু... একটা রিকোয়েস্ট আছে। এই কথাটা যেন আর কেউ জানতে না পারে। আপনাকে তো লুকোনোর কিছু নেই। সত্যি বলতে কী, যে সমস্যাটার কথা আপনি বললেন, আমি টের পাচ্ছি, ওই রকম ঝামেলা একটা ফেস করতে হবে। আসলে আমার ওয়াইফ থাকেন দেশের বাড়িতে। বুঝতেই পারছেন... এখানে অন্য এক মহিলার সঙ্গে ইনভলভড হয়ে গেছি...'

এই রে, যে ভয়টা পাচ্ছিলাম, সেটাই সত্যি হতে চলেছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভদ্রলোক এখন অনেক কিছু বলতে শুরু করবেন। থামিয়ে দেওয়ার জন্য তাই বললাম, 'প্রকাশবাবু, বিকেলের দিকে আসুন, তখন ডিটেল শোনা যাবে। আমার একটু তাড়া আছে। এখন আসি। শাস্ত্রীজির কী হল, আমায় কিন্তু জানাবেন।'

বলেই আমি গেটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বাইরে দাঁড়ানো ছেলেগুলোকে এড়িয়ে গাড়িতে উঠে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যেমন কর্ম তেমন ফল। শাস্ত্রীজির এই পরিণতি হওয়া উচিত। মনেমনে ঠিক করে রাখলাম, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে রাত ন'টার টিভির খবর দেখতেই হবে। সুযোগ পেলে মা আর বউদিকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়িতে আগে থেকে কাউকে কিছু বলব না। বাড়ির সবাই জানুক, কত বড় ভণ্ড একটা লোককে সবাই মাথায় করে রেখেছিল। বাড়িতে কোনও আচার-অনুষ্ঠান হলেই এত দিন ডাক পড়ত লোকটার। শাস্ত্রীজির পা-ধোয়া জল পর্যন্ত মাথায় নিতে দেখেছি মা আর বউদিকে। তখন রাগ হত খুব। কিন্তু কিছু বলার ছিল না। এলগিন রোডে পৌঁছলাম বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ। কাজ চলছে পুরোদমে। এক নজরে চোখে পড়ল, উত্তর দিকের একটা দেওয়াল ভাঙা হয়ে গেছে। দু'তিনজন লেবার মিলে হাতেহাতে ইট তুলে সাজিয়ে রাখছে। এলগিন রোডের এই বাড়িটাতে এলেই আমি

অন্য সব কথা ভুলে যাই। শাস্ত্রীজির কথা মাথা থেকে উড়ে গেল। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। ঠিক টাইমে সেই কাজ আমায় তুলে দিতে হবে।

আমায় দেখেই হামিদ টিনের চালা ঘরে ঢুকে বলল, 'ঝুনঝুনওয়ালার লোক এই মাত্র চলে গেল। সেই দশটা থেকে আপনার জন্য বসেছিল।'

—এরাই কি দরজা-জানালা কিনতে চেয়েছিল?

—হ্যাঁ কুন্তলবাবু। ফের বেলাবেলি আসবে। আপনি তখন কথা বলে নেবেন।

এত পুরনো দিনের দরজা-জানলা কী দামে বিক্রি করা উচিত সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। বললাম, 'তুমিই কথা বলে নিলে না কেন? তোমার তো অভিজ্ঞতা আছে।'

—তাই কি হয় না কি? জিনিস আপনার। দরদাম আপনার ইচ্ছেমতো হওয়া উচিত।

—আমাকে একটা আইডিয়া দাও তো।

—দরজা-জানালাগুলো সব বার্মিজ টিক-এর। এখন পাওয়া যায় না। আপনি ফ্যান্সি প্রাইস পেতে পারেন। ঝুনঝুনওয়ালা লোকটা একটু খ্যাপাটে। আমি অনেক দিন আগে থেকে চিনি। যে জিনিস ওঁর পছন্দ হবে, কিনবেনই। দাম যা-ই হোক না কেন। সব মিলিয়ে আপনি লাখ চারেক টাকা চাইতেই পারেন।

শুনেই আমি চমকে হামিদের দিকে তাকালাম। পুরনো এই দরজা-জানালাগুলোর দাম চার লাখ টাকা! এই টাকার অর্ধেকটাই তো হামিদ মেরে দিতে পারত, ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে আলাদা কথা বলে নিয়ে। পুরোটা মেরে দিলেও আমি টের পেতাম না। লোকটা তা করেনি। অত্যন্ত সৎ টাইপের। নাহ, এই লোকটাকে নিজে থেকে আমার কিছু দেওয়া উচিত।

কথাগুলো বলে হামিদ যায়নি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আরও কিছু বলবে। চোখাচোখি হতেই বলল, 'কুন্তলবাবু, দেওয়াল ভাঙার সময় আজ একটা জিনিস পাওয়া গেছে। গয়নার বাক্স। আপনার ড্রয়ারে রেখেছি। এক বার দেখে নিন।'

—গয়নার বাক্স?

—হ্যাঁ। জীবনে সেকেন্ড টাইম পেলাম। এর আগে নেবুতলায় একটা বাড়ি ভাঙতে গিয়ে পেয়েছিলাম।

হামিদ চলে যাওয়ার পর ড্রয়ার খুলে বাক্সটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

দশ

আমার কপালে যে গুপ্তধন পাওয়া ছিল, সেটা আমি নিজেই জানতাম না। এত বার নিজের কোষ্ঠী দেখেছি। অথচ কখনও চোখে পড়েনি। অদ্ভুত! গয়নার

বাক্সটার জন্য সারাদিনই অন্য কোনও কাজে মন বসাতে পারলাম না। বেলা তিনটের সময়ে যখন ঝুনঝুনওয়ার লোক দরজা-জানলা কিনতে এল, তখন ভুলেই গেলাম, হামিদ চার লাখ টাকা দর দিতে বলেছিল। আড়াই লাখ টাকায় আমি প্রায় রাজি হয়ে যাচ্ছিলাম।

তখন সেটা দূর থেকে শুনতে পেয়ে হামিদ সামনে এসে দর কষাকষি শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ওই চার লাখ টাকাতেই ঝুনঝুনওয়ালার লোক রাজি। আমি টাকাটা চেক-এ দিতে বলেছিলাম। কিন্তু ওরা দিল ক্যাশ।

বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় গাড়িতে আমার এক দিকে অ্যাটাচি কেস-এ চার লাখ টাকা। অন্য দিকে অমূল্য একটা গয়নার বাক্স। বাক্সটা মাত্র এক বারই খুলেছিলাম এলগিন রোডের চালাঘরে বসে। ভাগ্যিস তখন সামনে কেউ ছিল না। ভেতরের জিনিস দুটো দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। চোখের সামনে ঝলমল করে উঠেছিল দু'দুটো হিরের আংটি। এক একটা পাঁচ ক্যারাটের তো হবেই। সঙ্গে একটা অপরাজিতা নীলা। হঠাৎই একটা কথা বিদ্যুতের মতো মাথায় ঝিলিক মেরে উঠেছিল, আর যদি বাড়ি না ফিরি তাহলে কেমন হয়! এ সব বিক্রি করে স্বচ্ছন্দে সেই টাকায় মুম্বই চলে যাওয়া যায়।

পরক্ষণেই মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেছিল। না, অ্যাটাচি কেস আর গয়নার বাক্স— কোনওটাই আমার নয়। এলগিন রোডের বাড়ির সূত্রে পাওয়া। টাকা, হিরে আর নীলা— তিনটেই মায়ের। এ সব নিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়া আমার উচিত নয়। টাকার কথা মায়ের কানে যাবেই। আজ অথবা কাল। কাল কেন, আজও হতে পারে। আজ শুক্কুরবার। লেবারদের পুরো হপ্তার পেমেন্ট নেওয়ার জন্য হামিদ প্রতি শুক্কুরবার বাবার সঙ্গে দেখা করে বিবেকানন্দ রোডের দোকানে গিয়ে। টাকা নিয়ে ও আন্দুল চলে যায়। পর দিন লেবারদের পেমেন্ট করে দেয়। কথায় কথায় জানলা-দরজা বিক্রির কথা ও বাবাকে বলতেই পারে। সেই সঙ্গে গয়নার বাক্স পাওয়ার কথাও। গুপ্তধনের কথা কখনও চাপা থাকবে না।

বাড়িতে ফিরে তিনতলায় আমার ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। গয়নার বাক্সের ভেতরে ভাঁজ করা একটা কাগজ দেখেছিলাম। তাতে কী লেখা ছিল, তখন পড়ার সুযোগ হয়নি। বাক্সটা খুলে সেই কাগজটা বের করে দেখলাম, আসলে একটা চিঠি। হাতে লেখা। লেসলি ওয়াটসন বলে এক ইংরেজের। সইয়ের তলায় লেখা ৬ জানুয়ারি ১৯২৪ সাল। তার মানে চিঠিটা আশি বছর আগেকার। ভাঁজের জায়গাগুলো ধূসর হয়ে গেছে। তবুও পড়া যাচ্ছে। আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। প্রিয় বন্ধু,

এই চিঠি কত দিন পর কার হাতে পড়বে, জানি না। যার হাতেই পড়ুক,

তাকে আমি সাবধান করে দিতে চাই। এই বাক্সের হিরে এবং নীলাটির সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই দুটি রত্ন কলিঙ্গরাজ গজপতি আম্বারিদেবের। আমার পিতামহ দীর্ঘ দিন ওই দেশে প্রশাসনের কাজে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় হিরে ও নীলা তিনি সংগ্রহ করেন রাজার এক বংশধরের কাছ থেকে। এই দুটি রত্ন নিয়ে আসার পর থেকেই আমাদের পরিবারে একের পর এক বিপর্যয় ঘটেছে। আমরা সেটা জানতে পারি, ভারতীয় এক জ্যোতিষীর কাছ থেকে।

আমার পিতা এই দুটি রত্ন বেশ কয়েকবার বিক্রির চেষ্টা করেন। আশ্চর্য, প্রতি বারই শেষ মুহূর্তে তিনি ব্যর্থ হন। আমি নিজেও অব্যাহতি পেতে চেয়েছি। পাইনি। এই রত্ন দুটি আমার জীবনেও নিদারুণ শোক ও দুঃখ বয়ে এনেছে। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী হঠাৎ স্বল্প রোগভোগে সম্প্রতি মারা গেলেন। আমি ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু রত্ন দুটি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। এ দুটি আমাদের কাছে এখন বিষপাথর বলে মনে হচ্ছে। তাই এই বাড়ির দেওয়ালের ভেতর রেখে দিয়ে গেলাম। এই বিষপাথর যাঁর হাতেই পড়ুক, তিনি যেন ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার না করেন।

ইতি,

লেসলি ওয়াটসন

৬ জানুয়ারি, ১৯২৪

চিঠিটা ফের ভাঁজ করে বাক্সের ভেতর রেখে দিলাম। একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না—কোনটা অভিশপ্ত? হিরেটা না নীলাটা? ওয়াটসন সাহেব পরিষ্কার করে কিছু লেখেননি। তবুও একটু ভাবতেই মনে হল, নীলাটাই অভিশপ্ত। তাই এলগিন রোডের বাড়িতে কেউ টিকতে পারতেন না। বাড়িটা হানাবাড়ির মতো হয়ে গেছিল। নীলার কুপ্রভাবে বিপর্যয় ঘটা সম্ভব। ওয়াটসন সাহেব শুধু শুধু হিরের আংটি দুটো পরিত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু বাক্সে একই রকম দেখতে দুটো হিরের আংটি কেন? প্রশ্নটা মনে জাগতেই আংটি দুটো বাক্স থেকে তুলে হাতের তালুতে রাখলাম। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। মাই গড! এ তো পরিষ্কার চালাকি! একটা আংটি আসল হিরের। অন্যটা নকল। বোঝার উপায় নেই। আমার মতো লোকও প্রথম দেখায় ধরতে পারেনি। দাদুর কাছে বহু দিন আগে এক বার শুনেছিলাম বটে, আগেকার দিনে রাজারাজড়ারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য আসল হিরের সঙ্গে একটা ডামিও রেখে দিতেন। যাতে চোর-লুটেরারা আসল-নকল বুঝতে না পারে। কেন জানি না মনে হল, ওয়াটসন সাহেবও কোনটা আসল, কোনটা নকল, জানতে পারেননি।

হিরের আংটিটা আমি বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে দিলাম। তার পর চুপ

করে ভাবতে লাগলাম, হিরের কথা আমি আদৌ কাউকে বলব, কি না? দুপুরে যখন হামিদ বাক্সটা পায়, তখন খুলে দেখেছিল কি না, আমি জিজ্ঞেস করিনি। ও যে প্রকৃতির মানুষ, তাতে মনে হয় না, খুলে দেখেছে। যদি খুলে না থাকে, তা হলে আমাকে কোনও জবাবদিহি করতে হবে না। মা বা বাবার কাছে শুধু নীলার কথাটা বললেই চলবে। তার আগে বাক্সের ভেতরকার চিঠিটা শুধু আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। না, হিরের কথা এখনই কাউকে আমি বলব না। বাড়ি থেকে যদি আমাকে বেরিয়েই যেতে হয়, তাহলে এই হিরেটা তখন আমার অনেক কাজে দেবে।

দরজায় টকটক শব্দ। গয়নার বাক্সটা আমি তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেললাম। মা অথবা বউদি —কেউ একজন জলখাবার নিয়ে এসেছে। এলগিন রোড থেকে ফেরার পর প্রতি দিন দোকানে যাওয়ার আগে বউদি আমাকে জলখাবার খাইয়ে তবে ছাড়ে। আজ একটু আগেই আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। বিন্দুমাত্র খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কিন্তু সে কথা বউদি শুনতে চাইবে না। জোর করে আমাকে বসিয়ে দেবে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখি, মা। আমাকে এক বার জরিপ করে নিয়ে তার পর বলল, 'হ্যাঁ রে, ওপরে উঠেই দরজা বন্ধ করে দিলি? শরীর খারাপ না কি?'

মাকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, 'না। আমি ঠিক আছি।'

—দ্যাখ টুম্পাই, তোর পেটে আমি হইনি, বুঝেছিস? তুই-ই আমার পেটে হয়েছিস। তোর মুখই বলছে, কিছু একটা হয়েছে। বল না বাবা।

—আমার কিছু হয়নি, মা।

—এলগিন রোডে কাজ কতটা এগোল রে?

—আজ দরজা জানালা বিক্রি হয়ে গেল। দাঁড়াও, ওরা টাকা দিয়ে গেছে। তুমি রেখে দাও।

—থাক, ও টাকা তোর কাছেই থাক। তোর দাদামশাইয়ের ইচ্ছে ছিল, ও বাড়িটা তুই পাস। মুখার্জিবাবুকে ডেকে আমি বলেও দিয়েছি, নতুন বাড়ির ডিড তোর নামে করে দিতে।

—কেন, দাদা?

—তাকেও আমি বঞ্চিত করিনি। বসাক স্ট্রিটের বাড়িটা তাকে দিচ্ছি। সে যাক, তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন, তা তো বললি না রে?

—উফ্, তুমি আমায় ছাড়বে না, তাই না?

—তুই কেমন ধারা ছেলে রে, টুম্পাই? মায়ের সঙ্গে একদণ্ড কথা বলারও তোর ইচ্ছে হয় না? সে দিন অন্নদাদির বাড়ি গেসলুম। কী সুন্দর! ছেলে আপিস থেকে ফিরে এল, হাত-পা ধুয়ে, মায়ে-পোয়ে গপ্প করতে বসে গেল। আমার কপালে

কি সে সব আছে? আমার ছেলেরা সব ঘোড়ায় জিন দিয়ে বাড়িতে আসে।

মায়ের দুঃখের কথা শুনে আমার খুব হাসি পেয়ে গেল। সত্যিই তো, মায়ের সঙ্গে বসে দু'দণ্ড কথা বলার সময় কারও হয় না। বাবা, দাদা, আমি—সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি। না, মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, কিছু ক্ষণ বলুক। বুঝতে পারছি, মা এমনি উঠে আসেনি। নিশ্চয়ই কিছু জানতে চায়। এত ক্ষণ ভূমিকা করে গেল। হাসি চেপে আমি বাবু হয়ে বসে বললাম, 'কী বলবে, আসল কথাটা বলো তো।'

—বউমা বলছিল, তুই না কি এখন বিয়ে করতে চাইছিস না?

—ঠিকই বলেছে।

—কেন, বুলবুল মেয়েটা তো খারাপ না। তুই কি অন্য কাউকে পছন্দ করে রেখেছিস? তাহলে আমায় বল।

—তোমার মাথা খারাপ?

—কী জানি বাপু, লতিকাদির ছেলেটা যা কাণ্ড করে বসল। বিয়ে করব না... বিয়ে করব না... বলত। তার পর কোত্থেকে একটা বামুনের মেয়েকে ধরে আনল! এখন অশান্তির চূড়ান্ত। তুই যেন বাবা আমার মুখটা পোড়াস না। বেনেদের মেয়ের অভাব নেই। তোর বাবা চাইলে... দশটা মেয়ের বাবা আমার বাড়িতে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

—তুমি বুঝছ না কেন, মা, নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করা উচিত না?

—তার মানে? আর ক'দিন পর তো তুই দোকানে বসবিই। তা ছাড়া আমার এত টাকা-পয়সা... সে তো তোদের দু'ভাইয়েরই।

—তুমি কি এ সব কথা বলার জন্যই উঠে এলে?

—বুলবুলের মা আজ আমার কাছে এসেছিলেন। কী বলে গেলেন, জানিস? আমার হাত ধরে উনি অনেক করে রিকোয়েস্ট করে গেলেন। তোকে যেন রাজি করাই। এখন তোর কী বিবেচনা, বল।

—ভদ্রমহিলাকে বলো, আমার থেকে অনেক ভাল একজন ছেলেকে আমি জোগাড় করে দিচ্ছি। মেয়েকে যেন উনি রাজি করান।

—তোর বাবা যে বুলবুলের মাকে কথা দিয়ে ফেলেছে। দ্যাখ, বাবা, কয়েকদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমি চলে গেলে তখন তোরা বাপ আর ছেলে মিলে সারাজীবন জেদাজেদি করিস। আমাকে দেখতে হবে না।

মা এমন করে কথাটা বলল, বুকে এসে ধাক্কা মারল। ঘরের ভেতরের আবহটা হঠাৎই গম্ভীর হয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।

আগে ওই মেয়েটার ছক আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলো। বিচার করে দেখি, আমার সঙ্গে মিলবে কি না। তার পর বিয়ের কথা ভাবা যাবে।'

—এই তো গুডবয়ের মতো কথা। আজই আমি ওদের বাড়ি ফোন করে দিচ্ছি। তুই কি এখন বেরবি?

—হ্যাঁ, মা।

হাসিমুখে মা উঠে পড়ল। অনেক ক্ষণ সিগারেট খাইনি। বারান্দায় গিয়ে আমি সিগারেট ধরালাম। বউদি ছাড়া এখন আর কেউ ওপরে উঠে আসবে না। দিব্যি সুখটান দেওয়া যায়। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার এটাই সবচেয়ে ভাল সময়। দু'তিন টান মারতেই ফের আমার হিরের কথা মনে এল। দেরাজ থেকে নিজের কোষ্ঠীটা বের করে আনলাম। ছকে চোখ দিতেই আমার ভ্রু কুঁচকে উঠল। না, সেকেন্ড হাউসে এমন কোনও লক্ষণ নেই, যাতে আমার কপালে গুপ্তধন আসতে পারে। তাহলে?

আমাদের শাস্ত্রে বলে, গুপ্তধন পাওয়া ভাল লক্ষণ নয়। অনুপার্জিত ধন পরে খুব ক্ষতি করে দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে এটা দেখেছি। লোকে গুপ্তধন পায় খারাপ গ্রহের প্রভাবে। রাহু, কেতু যদি সেকেন্ড হাউসে থাকে, তবেই। যে পায়, প্রথম প্রথম সে লাফায় বটে, কিন্তু পরে তাকে কোনও না কোনও ভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়। এটাই বাস্তব। আমার ছকটা রেখে দিয়ে মায়ের ছক বের করে দেখতে লাগলাম। হিরের আংটি আর নীলাটা অবশ্যই মায়ের সম্পত্তি। তাহলে মায়ের ছকে নিশ্চয়ই তার লক্ষণ থাকবে। ছকটা সামনে মেলে ধরতেই আন্দাজ মিলে গেল। হ্যাঁ, মায়ের সেকেন্ড হাউসে এখন কেতু বসে আছে। আর তা থাকবে আগামী আড়াই মাস।

ছক দেখতে দেখতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এই আড়াই মাসে এমন কোনও একটা ঘটনা ঘটবে, যা মায়ের পক্ষে ভাল নয়। মানুষ কি আগেভাগে সেটা বুঝতে পারে? নিশ্চয়ই পারে। না হলে এই একটু আগে মা কেন বলে গেল, 'কয়েক দিন ধরেই কেন জানি না মনে হচ্ছে, আমার দিন শেষ হয়ে আসছে।' মায়ের যদি খারাপ কিছু হয়, তাহলে?

মন যখন খারাপ হয়, তখন আমার টোটার কথা মনে পড়ে। গত দু'দিন ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি। ও ফোনও করেনি। এমনটা কখনও হয় না। নিশ্চয়ই কোনও কাজে ও ফেঁসে গেছে। আজ এক বার ওদের বাড়িতে গেলে হয়। কিন্তু সন্ধে ছ'টার আগে টোটা কোর্ট থেকে ফেরে না। এখন বাজে পাঁচটা। বাড়ি ফিরেই কোনও কোনও দিন টোটা বি কে পাল অ্যাভিনিউতে ওর সিনিয়রের বাড়িতে চলে যায়। সে দিন ফিরতে ফিরতে আটটা-সাড়ে আটটা হয়ে যায়। আজ বেরবে কি না জেনে, তবেই ওর বাড়িতে যাওয়া উচিত। কথাটা ভেবে ওদের বাড়িতে ফোন করলাম।

ও প্রান্তে রিসিভার তুলল লালি। হি হি হাসি। তার পর বলল, 'টুম্পাইদা, তোমার কোনও খবর নেই কেন গো! মা আজই তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

—টোটা কোর্ট থেকে ফিরেছে?

—দাদা তো দু'দিন কোর্টেই যায়নি। বাড়িতে বসে জোর পড়াশুনা করছে।

—হঠাৎ! কীসের পড়াশুনা?

—এ মা, দাদা যে জজ হওয়ার পরীক্ষা দিচ্ছে, তোমায় কিছু বলেনি?

টোটা বলেছিল কি না, চট করে মনে পড়ল না। কিন্তু লালির সামনে না বলা যাবে না। তাহলে হি হি করে হাসবে। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বললাম, 'ওকে বলো, বাড়ি থেকে যেন কোথাও না বেরোয়। আমি আসছি।'

—তাড়াতাড়ি এসো। আরও একজন তোমার জন্য ওয়েট করবে।

—ওয়েট করবে! কে?

—এলেই তাকে দেখতে পাবে। ফোনটা তাকে দেব না কি? কথা বলবে?

নিশ্চয়ই বুলবুল। তাড়াতাড়ি বললাম —না। কাউকে দিতে হবে না।

—তোমার জন্য একটা খবর আছে, টুম্পাইদা। এখন বলব, না কি এসে শুনবে?

—কী খবর বলো।

—বুলবুল না, কাল বড় কাছারিতে গেছিল।

—সেটা কোথায়?

—এ মা তাও জানো না? ডায়মন্ডহারবারের দিকে। খুব জাগ্রত ঠাকুর, জানো? ওখানে কেউ মানত করে এলে তা ফলে যায়। গাড়িতে আমাকেও নিয়ে গেছিল। মা আমায় একা ছাড়ল না। তাই দাদাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হল।

এটা আমার কাছে সত্যিই খবর। বুলবুল আর লালির সঙ্গে টোটা কোথাও গেছে। এক সপ্তাহ আগে হলে বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু টোটার আঙুলে এখন হিরের আংটি। ওই হিরের প্রভাবেই ও এখন মেয়েদের দিকে ঝুঁকবে। আমার টোটকায় তাহলে কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাই ঠাট্টা করে বললাম—টোটাও কি মানত করেছে না কি?

ও প্রান্তে হি হি হাসি। লালি বলল—তুমি যে কী বলো! দাদা মানত করতে যাবে কেন? মানত করলাম আমি আর বুলবুল। গাছের গুঁড়িতে সুতো বেঁধে দিয়ে এলাম। দেখো, ঠিক ফলে যাবে।

—তুমি কী মানত করলে?

—তোমায় বলব? শুনলে কিন্তু তুমি হাসবে।

—না, হাসব না, বলো।

—ফোনে বলব না। তুমি এসো, তখন সামনাসামনি বলব। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। প্লিজ, না হলে বুলবুল বাড়ি চলে যাবে।

বিরক্তির একশেষ। বুলবুল আর টোটাদের বাড়ি যাওয়ার সময় পেল না। নাহ, এখুনি ও বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। ঠিক করে নিলাম, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগে এক বার দোকানে যাব। খানিকটা সময় দোকানে কাটাব। তার পর অন্ধকার নামলে আড্ডা মারতে যাব পাথুরেঘাটায়। বেনেবাড়ির মেয়ে। সন্ধের পর নিশ্চয়ই বুলবুল বাড়ির বাইরে থাকবে না। গিরিজাবাবু না কি গার্জেন হিসেবে খুব কড়া। কথাটা অনেক বার আমাকে শুনিয়েছে বউদি।

লালিকে বললাম—টোটা এখন ধারেকাছে নেই?

—আছে। পড়ার ঘরে। ডাকব না কি?

—না, থাক। দরকার নেই। ওকে বোলো, আমি ছ'টা সাড়ে ছ'টার সময় তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। কথাটা বলেই আমি মোবাইলের সুইচ অফ করে দিলাম।

খিলাত ঘোষ লেন থেকে আমাদের দোকান দু'মিনিটের পথ। ট্রাম লাইন পেরলেই পৌঁছে যাওয়া যায়। দোকানে গিয়ে দেখি, বাবা খুব গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে অর্নামেন্টস সেকশনের সামনে। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার পর গটগট করে উঠে গেল মেজেনাইন ফ্লোরে নিজের চেম্বারে। বাঁচা গেল।

সিঁড়ির নীচেই আমার চেয়ার। গত কয়েক দিন এই চেয়ারে বসার দরকার হয়নি। তখন বসতাম অ্যাস্ট্রোলজার'স চেম্বারে। আমার চেয়ারে তাই ধুলো পড়ে গেছে। আসলে সুইপারটাও জানে, এই দোকানে আমার কোনও স্টেটাস নেই। তাই আমার চেয়ার-টেবল পরিষ্কার রাখার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেয়ারটা নিজেই ঝেড়ে নিলাম। আর ক'টাই বা দিন! মুম্বইয়ে পটেলভাইয়ের কাছে তো এত দিনে চলেই যেতাম। মাঝখান থেকে এলগিন রোডে শো-রুম তৈরির কাজটা কাঁধে না চাপলে। চেয়ারে বসতে যাচ্ছি, এমন সময়ে মোবাইলে দাদার ফোন—তুই এখন কোথায় রে, টুম্পাই?

—বিবেকানন্দ রোডের দোকানে। কেন গো?

—আমি এখুনি আসছি। তুই কিন্তু হুট করে কোথাও বেরিয়ে যাস না।

—কেন গো?

—দরকার আছে।

—তুমি এখন কোথায়?

—বাড়িতে। এসেই শুনলাম, তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিস। যাক গে, আমি আর দু'মিনিটের মধ্যেই আসছি। তুই সিটে থাক। বাবার কাছে যাওয়ার সময় তোকে আমি ডেকে নেব।

বলেই লাইনটা কেটে দিল দাদা। ব্যাপারটা কী? নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে। না হলে দাদা এই সময় গড়িয়াহাটের দোকান ছেড়ে বাড়িতে আসত না। দরকারটা আগে আমার সঙ্গেই বোধহয়। না হলে দাদা আগে বাড়ি যেত না। চেয়ারে বসার সঙ্গেসঙ্গেই ফট করে মনে হল, দাদার কানে কি গুপ্তধন পাওয়ার কথা পৌঁছে গেছে তাহলে? আর তা যাচাই করার জন্য ছুটে আসছে? তাই বা কী করে সম্ভব? হ্যামিদ যদি ফোন করেও দাদার কানে খবরটা দিয়ে দেয়, তাহলেও এত তাড়াতাড়ি দাদার পক্ষে গড়িয়াহাট থেকে নর্থ ক্যালকাটায় আসা সম্ভব না। আর দাদাকে আমি চিনি। গুপ্তধনের কথা শুনলে ফোনেই সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করে নিত। আমার দাদা কুচুটে টাইপের না।

কথাটা ভাবার সঙ্গেসঙ্গে মনে পড়ে গেল, আসার সময় গয়নার বাক্স আমি বালিশের নিচে রেখে এসেছি। মাই গড, কী হবে? বাড়িতে আমি না থাকলে আমার ঘরে অবশ্য কেউ চট করে ঢোকে না। বালিশের নীচ হাতড়ানোর তো কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় মতির মা আমার বিছানা গুছিয়ে দিতে ওপরে ওঠে। মশারি টাঙিয়ে দিয়ে যায়। সেই সময় যদি বালিশ সরাতে গিয়ে বাক্সটা ওর চোখে পড়ে, তাহলেই মুশকিল। আমার জন্মের আগে থেকে মতির মা কাজ করছে। চুরি হয়তো করবে না। কিন্তু মা-বউদির কাছে নিয়ে গিয়ে বাক্সটা দেখাতেই পারে।

কথাটা মনে হতেই অস্বস্তি বোধ করলাম। নাহ্, বাক্সটা মায়ের জিম্মায় রেখে এলেই ভাল হত। টুক করে এখন দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা দাদা আমাকে থাকতে বলেছে। এ দিকে, কোনও কারণে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে বাবা যদি আমাকে না দেখে, তাহলে বিষ্ণুকাকাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে— আমি কখন বেরিয়ে গেছি। 'বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি', এই কথাটা অবশ্য বিষ্ণুকাকাকে বলে এক বার চলে যাওয়া যায়। কিন্তু ফিরে আসার পর আর আমার তাহলে টোটার বাড়ি যাওয়া হবে না। চেয়ারে বসে তাই আমি ছটফট করতে লাগলাম।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে দাদা আমার কাছে এল। 'আয়' বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। দুজনে বাবার ঘরে ঢুকেই দেখি, আরও একজন আছে। পোস্তার ইউসুফ। লোকটা খুচরো মাল বিক্রি করার জন্য প্রায়ই আমাদের কাছে আসে। এই সেই ইউসুফ যে ইয়াকুবের একটা হিরে বাবাকে গছিয়েছিল। লোকটাকে দেখেই আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। এই লোকটার জন্য আমি মার্ডার হয়ে যেতে পারতাম।

বাবা আমাকে বসতে বলেনি। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু চেয়ারে

বসেই দাদা বাবাকে জিজ্ঞেস করল—মালটা ইউসুফ এনেছে?

বাবা বলল—এনেছে। কিন্তু যা দাম বলছে, আনএক্সপেক্টেড।

—কত বলছে?

—পঁচিশ লাখ টাকা।

—কই দেখি।

নীল মখমলের পুরিয়া থেকে একটা হিরের টুকরো বের করে ইউসুফ কাচের টেবিলের ওপর রাখতেই আশপাশটা ঝিকমিক করে উঠল। কাটিং দেখেই বুঝলাম ডি বিয়ার্সের। ওজন তিন ক্যারাটের বেশি হবে না। দাম বড়জোর দশলাখ টাকা। মাস চারেক আগে পার্ক স্ট্রিটে সতরামদাস ধালামাল-এর দোকানে গেছিলাম। আমাদের মতো ওঁরাও রত্ন ব্যবসায়ী। আমাদের চেয়েও অনেক বড়। ওঁদের পাঁচ পুরুষের ব্যাবসা। ধালামালজির ছেলে রাজ মেহতানি আমার খুব পরিচিত। ও সে দিন ঠিক এই রকমই একটা হিরে আমাকে দেখিয়েছিল। একেবারে বেলজিয়াম থেকে আনা। কথায় কথায় দাম বলেছিল, ওই দশ লাখ।

আতর আর পাথরের দাম কখনও নির্দিষ্ট থাকে না। যাকে বলে, ফ্যান্সি প্রাইস এই দুটো জিনিসের। তবুও ইউসুফের হিরের দাম পঁচিশ লাখ টাকা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে। না হলে বাবার মতো মানুষের কাছে ইউসুফ এত দাম হাঁকত না। আমাকে কোনও কিছু বলতে বলা হয়নি। আগ বাড়িয়ে তাই কোনও কথা জানতে চাওয়া ঠিক হবে না। চুপ করে দাদা আর বাবার কথা শুনতে লাগলাম। হিরের টুকরোটা বেশ কিছু ক্ষণ দেখে দাদা বলল— তোমার কি মনে হয় বাবা, গজেন্দ্র সিং এটা তিরিশ লাখ টাকায় কিনবে?

বাবা বলল—ওর লোক তো বলে গেল, দাম কোনও ফ্যাক্টরই না। এনি প্রাইস। শুধু মালটা ঠিক আগেরটার মতো হতে হবে। একজ্যাক্টলি আগেরটার মতো।

—তবুও একটা রিস্ক থেকে যাচ্ছে, বাবা।

—তা তো থাকছেই। কলকাতায় অনেক জায়গায় কথা বললাম, কারও কাছে পেলাম না। শেষে এই ইউসুফ বলল, ওর কাছে এই পিসটা আছে। নিলে এখুনি নিতে হবে। না হলে দিতে পারবে না। অন্য কোনও এক বায়ার না কি নিতে চায়। সে জন্যই তোকে ডেকে আনলাম।

কী ভেবে দাদা ইউসুফকে বলল, তুমি একটু নিচে যাবে, ভাই? ওয়েট করো। দশ মিনিটের মধ্যেই তোমাকে ডাকছি।

ইউসুফ বিরক্তমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর দাদা আমাকে বলল— কী করা যায় বল তো ভাই? কাল বিকেলে বাবার কাছে গজেন্দ্র সিং নামে একজন কাস্টমার এসেছিল। বিহারের কোন এক এস্টেটের না কি রাজা ছিল ওর পূর্বপুরুষ।

খুব ঠাটবাট দেখিয়ে দশ লাখ টাকায় ঠিক এ রকমই একটা হিরে কিনে গেছে। পুরো ক্যাশ দিয়ে। আজ সকালে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে লোকটার সেক্রেটারি ফোন করে বাবাকে বলছে, ঠিক একই রকম আর একটা হিরে ওর চাই। যেটা কিনে নিয়ে গেছে সেটা না কি ওর বড় বউকে দিয়েছে। এ দিকে, ছোট বউ কান্নাকাটি করছে, তারও ঠিক এক জিনিস চাই। দাম কোনও ফ্যাক্টর না। আমাদের দোকানে এ রকম একটাই হিরে ছিল। বাবা অনেক খুঁজে ইউসুফের কাছে আর একটা পেয়েছে। নিজের কানেই তো শুনলি, কী দাম চাইছে। তোর কি মনে হয়, ওই দামে আমাদের নেওয়া উচিত? ঝুঁকিটা নিলে... আমাদের কিন্তু প্রফিট থাকবে পাঁচ লাখ টাকা।

শুনেই আমি মনেমনে হাসলাম। বাবা আর দাদা এত দিন ধরে এই ব্যবসায় আছে, অথচ আন্ডারওয়ার্ল্ডের বদমাইশির কোনও খবরই রাখল না। দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—আমার তো মনে হয় এই ডিলটা করা উচিত হবে না। করলে ঠকতে হবে। মনে হচ্ছে—এটা একটা ট্র্যাপ।

এগারো

দাদার মুখ থেকে কথাটা ছিটকে বেরোল —কী বলছিস তুই! আমাদের সঙ্গে বেইমানি করবে ইউসুফ?

—আমার যা মনে হল, তাই বললাম। বিশ্বাস করা বা না করা তোমাদের ব্যাপার। বাবা আর দাদা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তার পর দাদা আমাকে বলল—কিন্তু এটা ট্র্যাপ বলে তোর মনে হল কেন, বল তো?— সিম্পল কারণে। এ রকম চিটিং-এর ঘটনা আগেও ঘটেছে। আমি জানি। দাদুর মুখে শুনেছি।

কাল বিহারের গজেন্দ্র সিং বলে যে —লোকটা হিরে কিনতে এসেছিল, সেই লোকটাই যে ইউসুফের সঙ্গে কন্সপিরেসিটা করেনি— তার কী প্রমাণ আছে? আমাদের থেকে নেওয়া হিরেটাই হয়তো গজেন্দ্র সিং রেখে এসেছে ইউসুফের কাছে। ও জানতেও পারে, আমাদের সঙ্গে কারবার করে ইউসুফ। এই ধরনের লোকেরা সব খোঁজখবর করেই তার পর চিটিং-এ নামে। ছকটা দেখো, ওই হিরের পেয়ার খোঁজার জন্য আমরা ইউসুফের কাছে যেতেই পারি। তখন ইউসুফ অনেক বেশি দাম বাড়িয়ে দেবে ওই হিরেটারই। এখানে যেমন ও দাম বাড়িয়েছে।

—ইউসুফের লাভটা কী?

—আমরা গজেন্দ্র সিং-এর কাছে তিরিশ লাখ টাকায় বিক্রি করার লোভে পঁচিশ লাখ টাকায় এই হিরেটা ইউসুফের কাছ থেকে কিনে নেব। তার পর গজেন্দ্র সিংয়ের লোক আর আমাদের কাছে আসবেই না। তখন মাথায় হাত দিয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে। আর পঁচিশ লাখ টাকা দিব্যি ভাগাভাগি করে নেবে ওরা দু'জনে।

দশ লাখ টাকা দিয়ে হিরে কিনে গজেন্দ্র সিং বাড়তি দশ লাখ টাকা রোজগার করে বাড়ি চলে যাবে। আর ইউসুফ ঘরে বসে পেয়ে যাবে পাঁচ লাখ। আমার তো মনে হয়, এই ট্র্যাপে পা দেওয়া আমাদের উচিত হবে না।

মিনিট খানেক বাবা আর দাদার মুখ থেকে কোনও কথাই বেরোল না। ঘরে পিন পড়লে শব্দ শোনা যাবে। বাবা রুমাল দিয়ে এক বার মুখ মুছে নিল। দাদা খুব চিন্তায় পড়লে থুতনির কাছটা চুলকোয়। দু'জনের মুখ দেখে হাসি পেল। ভাগ্যিস দাদা বুদ্ধি করে আমায় ডেকেছিল। না হলে আজই পঁচিশ লাখ টাকা বাবার ব্যবসা থেকে চোট হয়ে যেত। বাবার যা আছে, তার তুলনায় অবশ্য এই টাকাটা কিছুই না। তবুও পাঁচ টাকা ফালতু খসে গেলে যে লোক চেল্লাতে শুরু করে, তার পক্ষে এত টাকার শোক একসঙ্গে সামলানো মুশকিল হত। দাদা থুতনি চুলকোনো বন্ধ করে হঠাৎ বলল, 'তোর কথাগুলো জাস্টিফাই করতে পারবি?' 'কেন পারব না? বাবাকে বলো না, পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে এক বার খোঁজ নিক, গজেন্দ্র সিং লোকটা গ্রান্ড হোটেলে সত্যিই উঠেছে কি না? যদি উঠেও থাকে, তাহলে ও সত্যিকারের কোথাকার লোক? সত্যিসত্যিই লোকটার দু'টো বউ আছে কি না? এ সব খোঁজ নিতে অবশ্য দিন দু'য়েক লেগে যাবে। তবে তার আগেও চালাকিটা ধরা যায়। গজেন্দ্র সিংয়ের সেক্রেটারি যদি ফের ফোন করে তাবলে ওকে বলো, আমাদের কাছ থেকে যে-হিরেটা ওরা কিনে নিয়ে গেছে, সেটা সঙ্গে নিয়ে যেন অন্যটা কিনতে আসে। ওকে বলো, না হলে আমরা মেলাতে পারব না। এই কথাটা বলে দেখো, ওই সেক্রেটারি আর ও মুখোই হবে না।

শুনে দাদা বাবাকে বলল—লোকটা কি তোমাকে কোনও কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে গেছে? ওকে ফোনে ধরা যাবে?

বাবা বলল— না। তবে আজ ও ফোন করতে পারে।

— তাহলে মনে হচ্ছে গড়বড় আছে। টুম্পাইয়ের সন্দেহটা সত্যি হলেও হতে পারে। এই ইউসুফটাকে রগড়ালেই সব বেরিয়ে আসবে। টুম্পাই, কেসটা তুই দ্যাখ তো! ততক্ষণে বাবা কথা বলুক সি পি-র সঙ্গে।

মারপিট, হাতাহাতি—এ সব থেকে শতহস্ত দূরে থাকে দাদা। সেই দাদাই রগড়ানির কথা বলছে। তার মানে খুব রেগে গেছে। কিন্তু এই সময় ইউসুফকে ধরে কোনও লাভ হবে না। লোকটা খুব ধূর্ত। ওকে মারধর করলে পোস্তায় গিয়ে ও অন্য ব্যাপারিদের ভড়কে দিতে পারে। ওকে অন্য ভাবে ফাঁদে ফেলা উচিত। হিরেটা ও এখুনি নিয়ে নিতে বলছে। ওর ব্যস্ততাই বলছে, এখুনি হাত ঝেড়ে ফেলতে চায়। ওকে কাল বা পরশু আসতে বলা দরকার। তখনই ওর মোটিভটা বোঝা যাবে। তাই বললাম— ইউসুফকে চেজ করার আগে মনে হয়, এটা জেনে নেওয়া উচিত,

যে-হিরেটা আমরা গজেন্দ্র সিংয়ের কাছে বিক্রি করেছি, সেটা কোথাকার স্টক। মুম্বই, সুরাত না পোস্তার?

দাদা বলল—কেন বল তো?

—পুলিশ জিজ্ঞেস করলে যাতে আমরা ঝাড়া হাত-পা থাকতে পারি। স্টকটা যদি পোস্তার হয়, তাহলে প্রবলেম।

কথাটা বলেই এক বার বাবার মুখের দিকে তাকালাম। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। পোস্তার মার্কেট থেকে মাঝেমাঝে দু'নম্বরি মাল আসে। অনেক সময় তা দোকানে রাখতেও হয়। সেই সময় পাথরের লেন-দেন, কাগজ কলমে হয় না। হিসেবপত্তর সব মুখেমুখে। আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। বাবা-দাদার যা বোঝার, ওরা বুঝে নিক।

নিজেকে সামলে নিয়ে বাবা হঠাৎ বলল— **এই** সব ঝামেলায় যাওয়ার কোনও দরকার নেই, বুঝলি? ইউসুফকে বিদেয় করে দে। আর বিষ্টুকে বলে দিচ্ছি, গজেন্দ্র সিংয়ের সেক্রেটারি যদি ফের ফোন করে তাহলে বলে দিতে, হিরের পেয়ার পাওয়া যায়নি। আমরা দিতে পারব না।

বলেই বাবা উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট ইঙ্গিত, আর কথা বলতে চায় না। সারা ক্ষণ বাবা একটা কথাও বলেনি আমার দিকে তাকিয়ে। কোনও কারণে আমার ওপর রেগে আছে। থাক রেগে। আমার কিছু আসে যায় না। এই একটু আগে এত টাকা লোকটার বাঁচিয়ে দিলাম। কোনও হেলদোল নেই। তার চেয়ে চুপ করে তামাশাটা দেখে গেলেই ভাল হত। আমারও বয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়েই আমি নিচে নেমে এলাম। দেখি, গড়িয়াহাটের শো-রুমের জ্যোতিষী চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। মা আজই সকালে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে এই দোকানে বসানোর কথা বলছিল। এত তাড়াতাড়ি মায়ের কথামতো কাজ হয়ে গেল। পণ্ডিতজিই তাহলে আজ ও দোকানে আমার জায়গায় বসেছিলেন? আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন বাইরে লালবাতি জ্বলছিল। তাই পণ্ডিতজি এত ক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে বোধহয় কোনও কথা বলতে চান।

চোখাচোখি হতেই পণ্ডিতজি আমাকে বললেন—কী হল কুন্তলবাবু, বলুন তো ভাই? তখন তো শুনেছিলাম, আপনিই এই শো-রুমে শাস্ত্রীজির জায়গায় বসছেন। হঠাৎ আমাকে ও দায়িত্ব দেওয়া হল?

—কেন, আপনার কোনও অসুবিধা আছে?

—সেটা বলার জন্যই আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আসলে কী জানেন, এই শো-রুমে আপনাদের বেশির ভাগ কাস্টমার ননবেঙ্গলি। আমার আবার হিন্দিটা ভাল আসে না।

—সে কী! আপনার পদবি তো যত দূর জানি, পণ্ডিত।

—না ভাই। ওটা আমাদের পাওয়া। আমার নাম, পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, খাঁটি বাঙালি। এখানকার মারোয়াড়ি কাস্টমারদের আমি ভাই সামলাতে পারব না। ওদের অর্ধেক কথাই আজ বুঝতে পারলুম না।

—সেটা কোনও সমস্যাই না। বাবাকে বলুন, আপনার সঙ্গে উনি এমন লোক দিয়ে দেবেন, যে-লোকটা ভাল হিন্দি জানে।

—সেটা ভাল দেখাবে না। কাস্টমারদের অনেক সিক্রেট ব্যাপার থাকে। অন্য কারও সামনে ওরা মুখ নাও খুলতে পারে। তা ছাড়া ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আপনাদের গড়িয়াহাটের শো-রুমে আমি তিনটে দিন সময় দিই। বাকি তিনটে দিন পড়াশোনা করতে হয়। সেই তিনটে দিন আমি এখানে দিতে পারব না। সপ্তাহে ছ'টা দিনই যদি চেম্বারে বসি, তাহলে নিজের চর্চা করব কখন? আমি একা মানুষ। সত্যি বলছি, অত রোজগারে আমার প্রয়োজন নেই।

ইউসুফের জন্য মনটা খিঁচড়ে ছিল এত ক্ষণ। পণ্ডিতজির কথা শুনে মনটা ভাল হয়ে গেল। এমন জ্যোতিষীও তাহলে পৃথিবীতে আছে! নিশ্চয়ই আছে। সে জন্যই তো পৃথিবীটা এখনও আছে। না হলে কবে রসাতলে চলে যেত শাস্ত্রীজির মতো লোকদের জন্য। শাস্ত্রীজির শেষ পর্যন্ত কী হল, প্রকাশবাবু তা জানাননি। বিকেলের দিকে ওঁকে আমাদের ক্লাবে যেতে বলেছিলাম। একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি। প্রকাশবাবু নিশ্চয়ই ক্লাবে যাননি। গিয়ে আমাকে না পেলে মোবাইলে ধরার চেষ্টা করতেন। পুলিশের চাকরি। হয়তো কোনও ঝামেলায় আটকে গেছেন। টোটাদের বাড়ি থেকে ফেরার পর আজ ভদ্রলোককে ফোন করতেই হবে।

দরজা খুলে দাদা বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ বার দোকান থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। তাই পণ্ডিতজিকে বললাম— আপনার সমস্যাটা বাবাকে বলে দেখুন কী হয়। আচ্ছা চলি।

কাচের সুইং ডোর ঠেলে রাস্তায় নেমে এলাম। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের দোকান থেকে টোটাদের বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। হেঁটে গেলে মিনিট পাঁচেক। ট্রামরাস্তা পেরিয়ে একটু হেঁটে আমি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে ঢুকলাম। মোড়ের বাড়িতেই আমার স্কুলের একজন ছেলে থাকত। খুব বদমাশ টাইপের ছেলে। ওর জন্য এক বার অঙ্ক স্যারের কাছে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। মানে, বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেটা অবশ্য আমার ব্রত নেওয়ার অনেক আগেকার কথা। পরে আমাকে একলা পেয়ে ও মারধর করেছিল। তার পরই আমি ঠিক করি শরীরচর্চা করব।

এখন ভাবি, এক দিক থেকে সুধাময় আমার উপকারই করেছিল। না হলে আমি দাদার মতো ভিতু টাইপেরই হয়ে থাকতাম। শরীর সম্পর্কে যত্নবান হতাম না।

সুধাময় এখন রাজনীতি করে। রাস্তায় আসতে যেতে মাঝেমধ্যেই ওকে মিটিং করতে দেখি। মিছিলে হাঁটতে দেখি। কেমন যেন প্যাকাটি মেরে গেছে। এক বার বন্যাত্রাণে টাকা চাইতে এসেছিল আমার কাছে। আমি দেখাও করিনি ওর সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে সিঙ্গিবাড়ির মোড়ে পৌঁছতেই পাশ থেকে কে যেন ডাকলেন—আরে কুন্তল, তুমি এ দিকে?

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, গিরিজাবাবু। গাড়িতে বসে। জানলায় মুখ বাড়িয়ে রয়েছেন। গাড়ি আটকে আছে ট্রাফিক সিগন্যালে। ভদ্রলোক যে বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরোতে পেরেছেন, দেখে ভাল লাগল। বললাম— বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে উনি বললেন—বন্ধুর বাড়ি পরে যেও। এখন আমার বাড়ি চলো। দু'দিন ধরে কেবল তোমার কথাই মনে হচ্ছে, বাবা। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার।

বাড়ির কাউকে না জানিয়ে আমি গিরিজাবাবুর বাড়ি গেছি, এটা ভাল দেখাবে না। মা বা বাবা হয়তো আমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু কীভাবে দেখবে, কে জানে। বিশেষ করে বাবা। আমি জানি, শুনলে বউদি ঠাট্টা করবেই। ভাই, ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে? কিন্তু বাবা হঠাৎ বিগড়েও যেতে পারে। বলতে পারে, আমার পারমিশন ছাড়া কে ওকে ও বাড়িতে যেতে বলেছে? কথাটা মনে হতেই ঠিক করে নিলাম, গিরিজাবাবুর সঙ্গে আমি যাব। বাবা যদি বিগড়ে যায়, তাহলে আমারই লাভ। বিয়েটা ভেস্তে যেতেও পারে। এক বার অবশ্য বললাম—কাকাবাবু, আজ একটু ব্যস্ততার মধ্যে আছি। পরে কোনও দিন যাব। আজ আমাকে মাফ করবেন।

উনি কিন্তু কথাটা উড়িয়ে দিলেন—রাখো তোমার ব্যস্ততা। উঠে এসো বলছি। বড়দের কথা শুনতে হয়। তোমাকে বেশি ক্ষণ আটকাব না, বাবা। প্লিজ এসো।

এরপর আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়িতে উঠলাম। নাহ্, ট্রামলাইন ধরে পাথুরেঘাটা চলে গেলেই ভাল হত। কে জানে সিঙ্গিবাড়ির মোড়ে দেখা হয়ে যাবে গিরিজাবাবুর সঙ্গে! গাড়িতে উঠেই মিষ্টি একটা গন্ধ পেলাম। নিশ্চয়ই খুব দামি আতর। লখনউয়ের হবে। বাবাও মাঝেমধ্যে এই আতর ব্যবহার করে কোনও অনুষ্ঠানে গেলে। গিরিজাবাবু যে খুব শৌখিন মানুষ, প্রথম দিনই তা টের পেয়েছিলাম। বউদির মুখে শুনেছি, উনি না কি উচ্চশিক্ষিতও। পড়াশোনা করার জন্য বেশ কয়েক বছর ইংল্যান্ডেও ছিলেন।

—তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, বাবা। তুমি আমায় বাঁচিয়েছ। বুলবুলের মুখে সবই শুনেছি।

সেই নীলা-কাহিনি! বুলবুলকে বারণ করেছিলাম। শোনেনি তাহলে। বললাম— এ আর এমন কী! খুব সাধারণ ব্যাপার।

—কী বলছ তুমি, বাবা! সাধারণ ব্যাপার? তোমার বাবা খুব ভাগ্যবান, তোমাদের মতো দু'টো ছেলে পেয়েছেন। ব্যাপারটা কী জানো বাবা, এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছেছি, এখন মনে হচ্ছে, ভগবান একটা ছেলে দিলে হয়তো বাড়তি ভরসা পেতাম। আমার একটাই মেয়ে। তুমি আবার ভেবে নিও না যেন, পুত্রসন্তান নেই বলে আমি আপসোস করছি।

বাবা না কি ভাগ্যবান! কী বলব? চুপ করে রইলাম। গিরিজাবাবু তো আর জানেন না, বাবা আমাকে কী চোখে দেখেন। উনি হয়তো সে দিন বাবার মুখের কথাগুলোই বিশ্বাস করে বসে আছেন। না করেই বা উপায় কী? পরে যদি আত্মীয়তা হয়, তখন হয়তো আসল কথা জানতে পারবেন।

অবশ্য আত্মীয়তা হওয়ার কোনও চান্সই নেই। বুলবুলকে আমি অন্তত বিয়ে করছি না।

দু'চার কথা বলার ফাঁকেই গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা বড় গাড়িবারান্দার নিচে। সদর দরজার দু-ধারে মার্বেল পাথরের বিশাল দুটো সিংহমূর্তি। গাড়ি থেকে নেমেই মনে হল, এই বাড়িতে আমি আগে এসেছি। এক আধবার নয়। বেশ কয়েক বার। দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে বড় একটা নাটমন্দিরে উঠতে হয়। ওই সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এক বার আমি পিছলে গেছিলাম। আমার জিভ কেটে রক্তারক্তি হয়েছিল। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। আমাকে নিয়ে বেশ হুলুস্থুল হয়েছিল। কোনও একটা অনুষ্ঠান ছিল ও বাড়িতে। দাদু.... হ্যাঁ, দাদুই আমাকে নিয়ে এসেছিল এ বাড়িতে। খুব ছোটবেলায়।

গিরিজাবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় পা দিয়েই বুঝলাম, আমাদের থেকে কোনও অংশে কম নন এঁরা। বৈঠকখানাটা এত বড়, চার-চারটে ঝাড়বাতি। দেওয়ালে বিরাট বিরাট সব অয়েল পেন্টিং। বিদেশ থেকে আনা পোর্সেলিনের শো-পিস সব। পুরনো আমলের ভিন্ন সাইজের গোটা দশেক সোফা। গিরিজাবাবু নিজেও বোধহয় আড্ডাবাজ মানুষ। সোফাগুলো দেখলেই বোঝা যায়, রোজ লোকজন এসে বসেন। অন্যের বাড়িতে আসবাব দেখে মুগ্ধ হলেও, তা প্রকাশ করার কোনও উপায় নেই। বেনে পরিবারের ছেলে। ছোটবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে, কৌলীন্যে আমরা কারও থেকে কম যাই না। আদেখলেপনা যেন কোনও ভাবেই প্রকাশ না পায়।

আমাকে সোফায় বসিয়ে গিরিজাবাবু নিচে থেকে হাঁক পাড়লেন— শুভ্রা, দেখে যাও আজ কাকে ধরে এনেছি।

বলার সঙ্গেসঙ্গেই উদয় হলেন বুলবুলের মা। আমাকে দেখে সারামুখ হাসিতে ভরিয়ে বললেন— কোথায় পেলে একে?

এক একজন ভদ্রমহিলা থাকেন, যাঁকে দেখলে মা ছাড়া আর কিছু মনে হয়

না। এই ভদ্রমহিলা ঠিক সে রকম। এই নিয়ে তিন বার দেখলাম। দেখেই মনে হল, আমার প্রণাম করা উচিত। উঠে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করতেই পা সরিয়ে নিয়ে উনি বললেন—থাক, থাক বাবা। দীর্ঘজীবী হও।

গিরিজাবাবু বললেন—বুলবুল নেই?

—পড়তে গেছে। এই এল বলে।

—ওকে ফোন করে দাও। কুন্তল খুব বেশি ক্ষণ থাকতে পারবে না।

বুলবুলের কথা শুনে ফের আমার মনে অস্বস্তির কাঁটা। গিরিজাবাবুকে বললাম—আপনি যেন কী পরামর্শ করবেন বলে আমাকে নিয়ে এলেন?

—চলো, তাহলে ওপরে চলো। এখানে বসে জিনিসটা দেখানো ঠিক হবে না।

দোতলায় উঠে দেখলাম, সর্বত্রই বৈভবের ছড়াছড়ি। বারান্দায় এক পাশে খাঁচায় ম্যাকাও পাখি। ঝাড়বাতির আলোয় নানা রং ঠিকরে বেরোচ্ছে পাখিটার গা থেকে। ভগবানের কী বিচিত্র সৃষ্টি। কলকাতার খুব কম লোকের বাড়িতে এই ধরনের ম্যাকাও পাখি আছে। তিন কী চারটে বাড়িতে হবে। দাদুর মুখে শুনেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে একটা সময় গোটা দশেক ছিল। সাহেবরাও অবাক হয়ে যেতেন, সেই সব পাখি দেখে। দাদুর মুখে গল্প শুনে শুনে ছোটবেলায় আমারও খুব শখ হয়েছিল ম্যাকাও পাখি পোষার। কিন্তু সেই সব শখ কবে বহু দিন আগে মুছে গেছে।

শোবার ঘরের লাগোয়া একটা ঘরে আমাকে বসিয়ে গিরিজাবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন। ছোট এই ঘরটায় বসে বোধহয় উনি নিজের ব্যবসায়িক কাজকর্ম করেন। পুরনো আমলের একটা টেবিল। তাতে কম্পিউটার বসানো। গিরিজাবাবু এখন কী করেন, আমার কোনও ধারণা নেই। কম্পিউটার দেখে মনে হল, এমন কিছু করেন, যাতে বাইরের জগতের সঙ্গে ওঁকে যোগাযোগ রাখতে হয়। আগ বাড়িয়ে আমার কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত না। তবুও একটু কৌতূহল বাড়ল ভদ্রলোক সম্পর্কে। বেনে পরিবারের এই বয়সি লোকেরা বসে বসে খেতেই অভ্যস্ত। এই ভদ্রলোককে মনে হচ্ছে ব্যতিক্রম।

টেবিল থেকে মুখ সরিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকাতেই বুঝে গেলাম, গিরিজাবাবুর আসল পেশাটা কী। সারা ঘরের দেওয়াল জুড়ে আলমারি। আর তাতে ঠাসা আইনের বই। তাহলে উনি আইনজীবী। চট করে টোটার মুখটা মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। গিরিজাবাবুকে বলব না কি টোটার কথা? যদি পেশার দিক থেকে কেনও রকম সাহায্য করেন। টোটা এখন যাঁর জুনিয়র, সেই প্রশান্ত মল্লিক ইদানীং অসন্তুষ্ট টোটার ওপর। টোটা সে দিন বলছিল, হাইকোর্টের আইনজীবীদের মধ্যেও না কি ভীষণ রাজনীতি। কেউ কেউ বাম দলের সমর্থক, কেউ কেউ তা নন। প্রশান্তবাবু ওকে বাম মনোভাবাপন্নদের সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু ও রাজি

হয়নি। আর কেউ জানুক না জানুক, আমি জানি, ও রাজনীতি করার ছেলেই না।

দেওয়াল থেকে মুখ সরাতেই গিরিজাবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। হাতে গোল পাকানো একটা কোষ্ঠী। তাহলে কারও কোষ্ঠীবিচার করানোর জন্যই উনি আমাকে ডেকেছেন। টেবিলের উল্টো দিকে বসে উনি বললেন, 'কুন্তল, আমার মেয়ের কোষ্ঠীটা এক বার দেখে দেবে, বাবা? শুনলাম, তুমি না কি দেখতে চেয়েছিলে?'

মায়ের কাছে কথাটা বলেছিলাম বটে। সেটা এত তাড়াতাড়ি এ বাড়িতে পৌঁছে যাবে ভাবিনি। উফ্, মা হঠাৎ আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য এত হড়বড় করছে কেন, মাথায় ঢুকছে না। সেই ডাকাত ধরার ঘটনাটার পর থেকে দেখছি, বাড়িতে সবাই আমার দিকে যেন একটু বেশি বেশি নজর দিতে শুরু করেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিরিজাবাবুর হাত থেকে কোষ্ঠীটা নিয়ে চমকে উঠলাম। এ কী! এ তো নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের করা কোষ্ঠী। আমার দেখার কোনও দরকারই নেই। উনি এমন ভাবে টীকাসহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পড়লেই সব জানা হয়ে যাবে।

ছকের দিকে নজর দিয়ে দেখলাম, বুলবুল মকর রাশির মেয়ে। কর্কট লগ্ন। তাই এত সুন্দরী। শনির জাতিকা। ছক দেখেই ফট করে একটা কথা মাথায় খেলে গেল। এই মেয়েটার সঙ্গে যদি টোটার বিয়ে হয়, তাহলে রাজযোটক হবে। টোটার ছক আমার মুখস্থ। সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট কূট বিচার শুরু করে দিলাম। মাই গড! এই মেয়েটা তো টোটার জীবনটাই বদলে দেবে। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করলাম। এই বুলবুলের সঙ্গে যদি টোটার বিয়ে হয়, তাহলে সংসার থেকে ওর বেরিয়ে যাওয়াও আটকে যাবে। কিন্তু টোটাদের যা অবস্থা, তাতে কি গিরিজাবাবু বিয়ে দিতে রাজি হবেন? মনে হয় না। তা ছাড়া বুলবুলই বা রাজি হবে কেন?

গিরিজাবাবুকে কী বলা যায়, ভাবতে লাগলাম। নকুলেশ্বরবাবু ছক বিচার করে যা লিখে গেছেন, সেটা পড়তে শুরু করলাম। উনি কোথাও নিশ্চিত করে কিছু লেখেননি। সব জায়গাতেই —হইতে পারে, হইবার সম্ভাবনা প্রবল বা হইবার যোগ রহিয়াছে। প্রকৃত জ্যোতিষীরা বিনয়ীই হন। কোথাও দম্ভ প্রকাশ করেন না। নকুলেশ্বরবাবু যে সব সম্ভাবনার কথা লিখেছেন, আমি জানি, তা হবেই। তাই দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলাম। বুলবুলের বিদ্যাস্থানে কোনও ব্যাঘাত নেই। বিবাহযোগ একুশ বছর পেরোলেই। বুলবুল তিন মাস আগে একুশ বছর পেরিয়েছে। সুতরাং এখনই সেই যোগ এসে গেছে। গিরিজাবাবুরা ঠিক সময়েই ওর বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছেন।

হঠাৎই একটা লাইন পড়ে চমকে উঠলাম। নকুলেশ্বরবাবু লিখেছেন, জাতিকার পতির আইন ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। মানে? একটু আগে যা ভাবছিলাম, দেখছি উনি তো সে কথাটাই লিখে গেছেন। কোষ্ঠীর দিকে এক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই ভাবতে লাগলাম, গিরিজাবাবুকে এখনই কথাটা বলা ঠিক হবে কি না! ভদ্রলোক অনেক আশা করে আমাকে ডেকে এনেছেন। এখুনি জানতে চাইবেন, বুলবুলের সঙ্গে আমার বিয়ে সম্ভব কি না। আমি যদি এখন বলি, নকুলেশ্বরবাবু ঠিকই লিখেছেন, বুলবুলের জন্য কোনও ল'ইয়ার পাত্র দেখুন, তাহলে উনি ধরে নেবেন আমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এঁরা বুঝবেনই না, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে নিয়ে কারও কোনও হাত নেই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গিরিজাবাবু একটু অধৈর্য হয়েই বললেন, 'কী দেখলে, বাবা?'

—কী জানতে চান বলুন?

—মেয়ের বিয়েটা নিয়ে খুব টেনশনে আছি।

—টেনশনের কিছু নেই। আপনার মেয়ের ম্যারেড লাইফ খুব সুন্দর হবে। বিয়ের যোগ এসে গেছে। মাস তিনেকের মধ্যেই... ধরে নিতে পারেন।

—বাঁচালে বাবা। তোমাকে একটা কথা বলি। ক'দিন আগে যখন অসুস্থ হয়ে বিছানা নিলাম, তখন একটা ভয় এসে বাসা বেঁধেছিল। আমি যদি না থাকি তাহলে কী হবে? বলতে পারো, এই অনুভূতিটা আমার জীবনে প্রথম। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না তখন কতটা অসহায় লাগছিল নিজেকে। শুয়ে শুয়ে ঠিক করেছিলাম, রাধেশ্যামের ইচ্ছায় যদি উঠে দাঁড়াই, আগে তাহলে মা মণির বিয়ে দেব। এমন কারও সঙ্গে যে আমার ছেলের অভাবটাও পূরণ করবে।

—আপনি সে রকম একটা ছেলেই পাবেন।

—পাব! কী বলছ হে? কোষ্ঠীতে তাই লেখা আছে না কি?

—কোষ্ঠীটা কি আপনি কখনও পড়ে দেখেছেন?

—না, তেমন ভাবে পড়িনি।

—এই কোষ্ঠীটা যিনি করেছেন, তাঁকে আমি গুরু বলে মানি। উনি যা লিখেছেন, ধরে নিতে পারেন, অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে যাবে। ভাল করে এক বার পড়ে নেবেন। কথাটা বলেই কোষ্ঠীটা গুটিয়ে আমি গিরিজাবাবুর হাতে তুলে দিলাম। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম— আজ আমি যাই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন গিরিজাবাবু— তা হয় না কি? আজ তুমি প্রথম এলে আমার বাড়িতে। মিষ্টি মুখ না করিয়ে তোমাকে ছাড়তে পারি? আর একটু বোসো বাবা, বুলবুল এই এল বলে। না না, তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, তোমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক করার। রাধেশ্যাম এই মুখ তুলে তাকিয়েছে। চলো, আমরা নিচে গিয়ে বসি।

...গিরিজাবাবুর বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন প্রায় সোয়া সাতটা।

মিষ্টিমুখ করানোর নাম করে ভদ্রলোকের স্ত্রী ভরসন্ধ্যায় লুচি, মাংস নিয়ে হাজির। মাংসের বাটিতে তেলের পরিমাণ দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। ভদ্রমহিলার আর দোষ কী! এটাই বেনেবাড়ির দস্তুর। এত তেলঝাল আমি খাই না। বলায় ওঁরা দু'জনেই একটু মুষড়ে পড়লেন। একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে কোনও রকমে পালিয়ে এলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট খেতে ইচ্ছে হল। আশারাম হাসপাতালের সামনে এসে একটা পানের দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেট কেনার পর উল্টো দিকের ফুটপাতে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। টোটা না? পোস্তার এই জায়গায় ট্রাক আর লরির খুব ভিড় রাস্তায়। একটা ট্রাকের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে টোটা কথা বলছে। মেয়েটার মুখ দেখতে পেলাম না। পরনে হলুদ রঙের শাড়ি। হাতে বই। ভাল করে তাকাতেই বুঝতে পেলাম, লালি নয়। অন্য কোনও মেয়ে। রাস্তায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টোটা একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে, ভাবাই যায় না।

এক বার ভাবলাম, রাস্তা পেরিয়ে ওদের সামনে গিয়ে টোটাকে চমকে দিই। পরক্ষণেই মনে হল, না তা উচিত হবে না। টোটা বিব্রত বোধ করবে। তার থেকে বরং আবিষ্কার করা যাক, মেয়েটা কে? সিগারেট ধরিয়ে টোটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা মনে হল, খুবই ব্যস্ত। এক বার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন বলল টোটাকে। তার পর হাঁটতে লাগল। তখনই ওর মুখটা আমি দেখতে পেলাম। বুলবুল। আমার পা-টা যেন স্ক্রু দিয়ে আটকে দিল! গিরিজাবাবুর মুখে একটু আগে শুনলাম, বুলবুল পড়তে গেছে! মাথায় ঢুকল না, তাহলে ওর সঙ্গে টোটার দেখা হল কোথায়?

রাস্তা পেরিয়ে টোটাকে ধরব, ঠিক এমন সময় পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। কানে দিতেই শুনতে পেলাম পটেলভাইয়ের গলা— গডব্রাদার, আমি কলকাতায়। তাজ বেঙ্গলে। তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। পারলে এখনই চলে এসো।

বারো

পটেলভাই কলকাতায়। আমাকে না জানিয়ে? কোনও বার তো এমনটা হয় না। অন্তত আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে কখনও হয়নি। পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই উনি এই শহরে আসুন না কেন, এক বার আমাকে ফোন করেছেন, 'গডব্রাদার আসছি। আমার জন্য ফাঁকা থেকো।' কী এমন হল, সেই পটেলভাই হঠাৎ সশরীরে হাজির! এই তো সে দিন ইয়াকুবের ব্যাপারে ফোনে কথা হল আমার সঙ্গে। তখনও

বলেননি উনি কলকাতায় আসবেন।

পোস্তার রাস্তায় পটেলভাইয়ের গলাটা শুনে আমি এমনই অবাক, টেরই পাইনি উল্টো দিক থেকে হাতেটানা রিকশা আমার দিকেই ছুটে আসছে। শেষ মুহূর্তে 'হটিয়ে সাব' কথাটা কানে যেতেই এক লাফে ফুটপাতে উঠে পড়লাম। আমাদের এই বড়বাজার অঞ্চলে প্রায় রিকশাজনিত দুর্ঘটনা হয়। পুরনো কলকাতা, রাস্তাঘাট এমনিতেই ছোট। তার ওপর ব্যাবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়াতে নানা ধরনের যানবাহনের জন্য মারাত্মক জট বাঁধে রোজ। কখনও কখনও পুলিশের হল্লা গাড়ি বেরোয়, বেআইনি রিকশা ধরার জন্য। তখন রিকশা নিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে রিকশাওয়ালারা গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। দেখি, এই রকমই একটা রিকশা আমার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে তারাসুন্দরী পার্কের দিকে টার্ন নিল।

—কী হল, গডব্রাদার? কথা বলছ না কেন? ইজ ইট নাইন এইট থ্রি ডাবল ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান থ্রি টু?

পটেলভাই আমারই মোবাইল নাম্বারটা বলেছেন। শুনে বললাম— আপনার গলা শুনে এমন অবাক হয়েছি, আমার গলা দিয়ে স্বর বেরচ্ছে না।

ও প্রান্তে হা হা করে এক চোট হেসে নিয়ে পটেলভাই বললেন— রিয়েলি? আছ কোথায় এখন? তাজ বেঙ্গলে চলে এসো। তোমার সঙ্গে বহু দিন সামনাসামনি দেখা হয়নি। বলো তো গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রায় রাত আটটা বাজে। এখন তাজ বেঙ্গলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। ওখানে গেলে পটেলভাই চট করে ছাড়বেন না। ওঁর সঙ্গে অনেকেই থাকেন। তাঁদের কারও কারও হাত দেখতে হবে। বড় বড় বিজনেসম্যানদের মধ্যে আজকাল একটা ব্যাপার লক্ষ করছি, কারও সঙ্গে ব্যাবসা করতে নামার আগে ওঁরা জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছেন। মানে... হবু পার্টনারের গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করিয়ে জেনে নেন, পরে দু'জনের মধ্যে বনাবনি হবে কি না। পটেলভাইয়ের জন্য এ রকম বিচার আমি আগে অনেক করে দিয়েছি। উনি অন্ধবিশ্বাসে তা মেনেও নিয়েছেন।

আজ যদি সে রকম কয়েকজনকে ডেকে পটেলভাই হোটেলের ঘরে বসিয়ে রাখেন, তাহলেই আমি গেছি। রাত বারোটার আগে কোনও মতেই বাড়ি ফিরতে পারব না। তার পর বাড়ি ঢোকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার হিটলার বাবার কড়া নির্দেশ আছে, যেখানেই যাও, রাত দশটার আগে ফিরতে হবে। তার পর বাড়ির দরজা বন্ধ। বাবা নিজেও কোনও দিন এই নিয়ম ভাঙে না।

পটেলভাইকে বললাম— কোত্থেকে এলেন এ বার?

—স্ট্রেট মুম্বই থেকে।

—বিজনেস ট্রিপ, না কি অন্য কিছু?

—খানিকটা অন্য একটা কারণে। এখন চলে এসো। তাহলেই জানতে পারবে। তোমার সাহায্য আমার দরকার।

ক'দিন আগেই পটেলভাই দারুণ একটা বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। আজ এখনই আমার ছুটে যাওয়া উচিত। কিন্তু সম্ভব না। তাই বললাম— সরি পটেলভাই। আজ যেতে পারব না। আপনি ক'দিন থাকবেন কলকাতায়?

—দু'তিন দিন। তার পর এক সপ্তাহের জন্য কাঠমান্ডু যাব। ফিরে আসার পর প্রোগ্রামটা এখনও ঠিক করিনি। বেলজিয়াম যেতে পারি।

পটেলভাই মাসে এক বার করে বেলজিয়াম যান। আমি জানি অ্যান্টোয়ার্প বলে একটা শহর আছে বেলজিয়ামে। হিরের বড় বাজার ওখানে। হিরের কাটিং আর পলিশিং সেন্টার আছে খুব বড় বড়। আমাদের সুরাতের মতো। এই ক'দিন আগে অ্যান্টোয়ার্পে ভয়ানক একটা ডাকাতি হয়ে গেছে হিরের বাজারে। কোন কোম্পানিতে অতটা মনে নেই। ইন্টারনেটে দেখছিলাম, ডাকাতরা কোম্পানির একশো উনত্রিশটা ভল্টের মধ্যে একশো বারোটা ভল্টই খালি করে দিয়ে গেছে। তার মানে কয়েক মিলিয়ন ডলারের হিরে নিয়ে গেছে। পৃথিবীতে এত বড় ডাকাতি আর না কি হয় নি।

অ্যান্টোয়ার্পে গিয়ে ডি বিয়ার্স কোম্পানির কাছ থেকে প্রচুর কাটিং পটেলভাই নিয়ে আসেন। সেই কাজ সুরাতে নিজের কাটিং সেন্টারে করান। আসলে আমাদের দেশে অনেক কম পয়সায় কাটিং-পলিশিংয়ে কাজটা করানো যায়। সে জন্য অ্যান্টোয়ার্পের ওরা পটেলভাইদের মতো লোকদের কাজ দেয়। অ্যান্টোয়ার্পে হিরের বাজার দেখার খুব ইচ্ছে আমার। নিজে ব্যাবসা করলে ভবিষ্যতে ওখানে যাবই।

হেসে পটেলভাইকে বললাম— আপনাদের কী কপাল, তাই না যখন ইচ্ছে পৃথিবীর যে কোনও দেশে ঘুরে আসতে পারেন।

—তা তুমিও আমার সঙ্গে চলো না, গডব্রাদার। কে আটকাচ্ছে আমার তো ওপেন অফার দেওয়া আছে। জয়েন মাই বিজনেস।

—মনে হয়, তাই করতে হবে এক দিন। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। কাল সকালে গিয়ে অবশ্যই দেখা করব।

—কখন আসবে গডব্রাদার? একটু তাড়াতাড়ি এসো। তাহলে এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করা যাবে।

—এই ধরুন ন'টা সাড়ে ন'টা।

—গুড। ভেবেছিলাম, আজ এলে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব, দেওয়া হল না। যাক গে, তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার ঘাড়ের কাছে এক ভদ্রমহিলা

বসে আছেন। তার সঙ্গে কথা বলো।

ও প্রান্তে রিসিভার হাত বদল হল। তার পরই মিষ্টি গলা— কুন্তলদা নমস্কার। চিনতে পারছেন, আমি কে?

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম: দীপা। পটেলভাইয়ের মেয়ে। বছর তিনেক আগে এক বার কলকাতায় এসেছিল। তখন মুম্বইয়ের মিঠিবাই কলেজে পড়ত। বললাম— কেমন আছ তুমি, দীপা?

—ভাল। আপনাকে আমার খুব দরকার, কুন্তলদা। এক বার আসবেন?

—কী ব্যাপার বলো তো?

—তিন বছর আগে আপনি আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। মনে আছে? তখন সময় পাননি। এ বার কিন্তু আপনাকে আর ছাড়ছি না।

—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি?

—যাক, আপনার মনে আছে তাহলে। ঠাকুরবাড়িটা তো আপনাদের বাড়ির খুব কাছেই, তাই না? কবে নিয়ে যাবেন বলুন। এ বার কিন্তু আমি নিজেকে টেনে এনেছি এই কারণে। আমাকে আপনার জিম্মায় দিয়ে উনি কাঠমান্ডু চলে যাবেন।

তবে কাল দুপুরেই যাওয়া যেতে পারে।

তাহলে খুব ভাল হয়। আপনি আসুন। তার পর সব ঠিক করা হবে। আপনি কি বাবার সঙ্গে কথা বলবেন?

তবে এক বার দাও।

আবার হাত বদল হল রিসিভার। পটেলভাই বললেন—বলো গডব্রাদার তোমার বাবা কেমন আছেন? আজ বিকেলেই তোমাদের শো-রুমে ফোন করেছিলাম। তখন উনি ছিলেন না। ওঁকে আমার নমস্কার জানিও।

আচ্ছা বলে দেব। ছাড়ি তাহলে। কাল দেখা হচ্ছে।

ও কে। গুড নাইট।

মোবাইল সেটটা পকেটে পুরতেই কেন জানি না, পাথুরেঘাটায় গিয়ে আর যেতেই ইচ্ছে করল না। বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। এই সময়টাই লোক গিজগিজ করে কৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের এই রাস্তাটায়। দোকান-পাট, মন্দির, সিনেমা হলটার জন্য। রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম লাইন ধরে একটু হাঁটলেই আমাদের বাড়ি। মোড় পেরনোর পরই ছানার বাজার। রাতের এই সময়টায় ছানার বাজার খুব তেজি। ছানার গন্ধ আমার একেবারে সহ্য হয় না। তাড়াতাড়ি এই জায়গাটায় পা চালিয়ে আমি খিলাত ঘোষ লেনে ঢুকে গেলাম।

বাড়িতে ঢুকতেই আমার সেই বাক্সটার কথা মনে পড়ে গেল। বিকেলে বাড়ি

থেকে বেরনোর সময় আমি বাক্সটা বালিশের তলায় রেখে গেছিলাম। জানি না, সেটা কারও চোখে পড়ে গেছে কি না। প্রায় লাফিয়েই তিনতলায় আমার ঘরে ঢুকে দেখলাম, নাহ্, মতি বিছানা গুছিয়ে দেওয়ার জন্য এখনও ওপরে ওঠেনি। তাই বাক্সটা কারও চোখে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ঘরের দরজা বন্ধ করে বালিশের তলা থেকে বাক্সটা বের করে আনলাম। নীলার টুকরো আর হিরের আংটি দুটো চোখের সামনে ঝলসে উঠল।

মায়ের জিনিস, মাকেই দিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু হিরের আসল আংটিটা হাতের তালুতে রাখা মাত্র আমার অন্য কথা মনে হতে লাগল। গোলকোন্ডা হিরে, এখন বাজারে পাওয়া যায় না। মাকে নীলা আর নকল আংটিটা দিয়ে, আসল হিরের আংটি আমার কাছে রেখে দিলে কেমন হয়? এ বাড়িতে আমার নিজের জিনিস বলতে কিছুই নেই। একটা দামি জিনিস না হয় আমার কাছে থাক। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। পটেলভাইকে যদি হিরের এই টুকরোটা দেখাই, তাহলে উনি লুফে নেবেন। এমন যোগাযোগ, ভদ্রলোক এই মুহূর্তে কলকাতায়। কথাটা মনে হওয়া মাত্র আসল হিরের আংটিটা আমার দেরাজে রেখে দিলাম।

আধ ঘণ্টা পর স্নান সেরে নিচে নেমে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখি, মা বসে টিভি দেখছে। খাটের ওপর বসে আয়েস করে রোজ মা এই সময়ে সিরিয়াল দেখে। টিভিতে বোধহয় কান্নাকাটির কোনও সিন হয়ে গেছে। মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। ওপরে আমার ঘরেও একটা টিভি আছে। কিন্তু টোটার বারণ আছে বলে সিরিয়াল-টিরিয়াল আমি দেখি না।

টিভির দিকে মন, মা আমায় দেখতে পায়নি। কী মনে হল, পেছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম— কী দেখছ গো, মা?

—ওহ তুই। বোস। ভাল একটা সিরিয়াল হচ্ছে রে। ইন্দুবালাকে নিয়ে।

হাত ছাড়িয়ে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে বললাম— কে ইন্দুবালা?

—ও মা, জানিস না? গান গাইত। রামবাগানের দিকে থাকত। কী মিষ্টি গলা ছিল। তোর দাদু খুব পছন্দ করত ইন্দুবালা আর আঙুরবালার গান। ইন্দুবালার গান শোনার জন্য তোর দাদু তো গ্রামোফোন সেট কিনে এনেছিল হাজার টাকা দিয়ে। ...হ্যাঁ রে, মতির মা তোকে কিছু খেতে-টেতে দিয়েছে?

—উফ মা, খাওয়ানো ছাড়া তুমি অন্য কিছু জানো না, তাই না?

—তার মানে, দেয়নি। কাজের লোকগুলো যেন কেমনধারা হয়ে যাচ্ছে। কোনও কথা বললে গুরুত্বই দেয় না। মতির মাকে তখন বলে দিলুম, টুম্পাই এলে ক্ষীর দিও। এখনও দেয়নি?

—আমি এখন কিছু খাব না, মা।

—কেন রে? বিকেলে তো হুড়ুম করে বেরিয়ে গেলি। কিছুই মুখে দিলি না। শোন বাবা, বউমার বাপের বাড়ি থেকে আজ ভাল ক্ষীর এসেছে। খেয়ে দ্যাখ, ভাল লাগবে।

—হঠাৎ ক্ষীর পাঠাল?

—নিয়ম বলে। তুই যে কাকা হচ্ছিস, সে খবর রাখিস? শীলমশাই নিজে এসেছিলেন পাঁচপো ক্ষীর আর পাঁচটা শাড়ি নিয়ে বউমাকে আশীর্বাদ করার জন্য।

—এটা নিয়ম?

—হ্যাঁ। বেনেবাড়ির অনেক নিয়ম। তোরা তো সব নিয়ম-টিয়ম জানিস না। জেনে রাখ। পোয়াতি সাত মাসের হলে তখন সব সাত রকম পাঠাবে। সাত রকমের আচার, মিষ্টি, ভাজা, নোনতা, ফল, তরকারি, বসন আর বাসন দিয়ে মেয়ের সাধ দিতে হবে শীলমশাইকে।

—সাত রকমের আচার কোথায় পাবে মা?

—কেন পাবে না? দোকানেই পাওয়া যায়। আম, লেবু, চালতা, কামরাঙা, আমড়া, তেঁতুল, সজনে ডাঁটা.... কত কী দিয়েই তো আচার হয়। তবে শীলমশাইরা তো আর দোকান থেকে কিনে দেবে না। দ্যাখ গিয়ে এখন থেকেই লোক এনে আচার বানাতে শুরু করেছে। এ সব জিনিস খুব শুদ্ধাচারে বানাতে হয়। যাক গে, একটা কথা বলতো বাবা, হঠাৎ কেন আমার কোলে এসে শুয়ে পড়লি? মতলবটা কী?

—বা রে, তুমিই তো বিকেলে বললে, তোমার অন্নদাদি না কে.... তার ছেলে আপিস থেকে ফিরেই মায়ের সঙ্গে গল্প করে। তোমার ভাগ্যে কি সে সব লেখা আছে? শুনে আমি ঠিক করেছি, রোজ সন্ধেয় বাড়ি ফিরে মায়ে-পোয়ে গল্প করব।

—খুব কথা শিখেছিস, না? বউ আনার পর তো মাকে আর চিনতেই পারবি না...। তখন ওপর থেকে আর নামবিই না...

মা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় টিভিতে খবর আরম্ভ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল শাস্ত্রীজির কথা। পোস্তা থানার প্রকাশবাবু বলেছিলেন, শাস্ত্রীজির খবরটা যাতে টিভিতে দেখায়, তার ব্যবস্থা করবেন। সেটা করেছেন কি না তা দেখার জন্য আমি উঠে বসলাম। ভাল সময়ে মায়ের কাছে আমি এসেছি। মাকে দেখানো দরকার, শাস্ত্রীজির আসল রূপটা কী।

টিভির খবরে মায়ের আগ্রহই নেই। মা পানের বাটা হাতের সামনে টেনে নিয়েছে। পান সাজছে। সারা দিনে এই একটা কাজ মা অন্য কাউকে করতে দেয় না। বাবা আর নিজের জন্য পান নিজে সাজে। ছোটবেলায় শখ করে কয়েক দিন মায়ের হাতে সাজা পান খেয়েছি। খুব সামান্য খয়ের দেয়, তা সত্ত্বেও ঠোঁট লাল হয়ে যায়। পান সাজতে পারাটা একটা আর্ট। বাবা তো অন্য কারও তৈরি পান খায়ই না।

বেশ খানিকটা সময় নিয়ে পান সেজে মা একটা মুখে দিল। তার পর বোঁটা দিয়ে চুন তুলে জিভের গোড়ায় লাগিয়ে আমায় বলল— সর তো। এক বার রান্নাঘরে যাই। মতির মা-টা কী করছে, গিয়ে দেখি।

—আর একটু বোসো না, মা। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কী রে?

—আজ তোমার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে গুপ্তধন পাওয়া গেছে।

—কী পাওয়া গেছে?

—গুপ্তধন।

—কোথায় দেখি?

পাজামার পকেট থেকে গয়নার বাক্স বের করে মাকে দিলাম। বাক্সটা খুলে প্রথমেই হিরের আংটিটা তুলে মা বলল— এ তো ঝুটো রে।

শুনে চমকে উঠলাম—কী করে জানলে?

—বেনেবাড়ির বউ, জানব না? সারা জীবনটাই তো আমার কেটে গেল সোনা, হিরে, পান্না, চুনি নিয়ে। এই যে নীলাটা দেখছিস, এটা ব্রাজিলের। খুব দাম। কোত্থেকে পেলি এই বাক্সটা?

—দেয়ালের মধ্যে ছিল। ভাঙতে গিয়ে হামিদরা পেয়েছে। তোমার কাছে রেখে দাও মা। তোমারই পাওয়া উচিত।

পান চিবোতে চিবোতে মা নকল হিরের আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু'চারবার দেখে হঠাৎ আমায় চমকে দিয়ে বলল—এর আসলটাও এই বাক্সে ছিল। কাল গিয়ে খোঁজ করিস তো, নিশ্চয়ই কেউ সরিয়ে ফেলেছে। হামিদ ছেলেটা অবশ্য সে রকম না। ওকে এক বার জিজ্ঞেস করিস অন্য কেউ এই বাক্সে হাত দিয়েছিল কি না।

শুনে চুপ করে রইলাম। মাকে যতটা সাদাসিধে ভাবতাম, ততটা না। বাক্সে আর কিছু পাওয়া যায়নি, এই কথাটা বললে মিথ্যাচরণ করতে হত। মিথ্যে কথা আমি বলি না বললে বারো বছরের ব্রত আমার নষ্ট হয়ে যেত। মা যাতে ও ব্যাপারে আর একটা কথাও না বলে, সে জন্য টিভির দিকে চোখ ফেরালাম। আর সেই মুহূর্তেই শাস্ত্রীজির ছবি পরদায় ভেসে উঠল। 'এক বিধবা মহিলাকে প্রতারণা করার দায়ে এক জ্যোতিষীকে আজ গ্রেফতার করেছে পোস্তা থানার পুলিশ।'

খবরটা আমার জানা। তাই আড়চোখে এক বার মায়ের দিকে তাকালাম। মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। পর্দায় শাস্ত্রীজি গায়ের লাল উত্তরীয়টা দিয়ে মুখ ঢাকার চেষ্টায় ব্যস্ত। দেখলাম, প্রকাশবাবু সেই উত্তরীয়টা সরিয়ে দিলেন। যাতে মুখটা ভালভাবে দেখা যায়। এর পর প্রকাশবাবু ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, কেন ভণ্ড লোকটাকে গ্রেফতার করেছেন। তা দেখতে দেখতে মা বলে উঠল— কী কাণ্ড বল তো, টুম্পাই।

ভাগ্যিস, ঠিক সময়ে তোর বাবাকে আমি বলেছিলাম, শাস্ত্রীজিকে তাড়িয়ে দাও।

—তুমি তাড়িয়ে দিতে বলেছিলে?

—নয়তো কী! যজ্ঞ করার নাম করে লোকটা আমার অন্নদাদির পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরে দিয়েছে। চরিত্তিরেরও দোষ আছে। তোকে বলা যাবে না। তোর বাবা জানে। ছ্যা ছ্যা। এই লোকটাকে দিয়ে আমি বাড়িতে পুজো করিয়েছি? কালে কালে যে কী হবে, রাধেশ্যামই জানেন।

—বাবাকে আমিও অনেক দিন সাবধান করেছি মা। আমার কথা শুনতই না।

—তোর বাবার তো ওই এক দোষ। কারও কথা শোনে না। চট করে লোককে বিশ্বেস করে ফেলে। আর যাকে বিশ্বেস করে, তার সঙ্গে একেবারে হলায়-গলায়। এই যে গিরিজাবাবু... এক সময় তাঁর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। এখন দেখছি, তার কথায় মেতে উঠেছে। কুটুম্বিতে করার কথাও ভাবছে। বুঝি না বাপু, লোকটা কী চায়! আমি আর কত সামলাব?

গল্পের নেশায় জিজ্ঞেস করলাম— গিরিজাবাবুর সঙ্গে বাবার মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল কেন মা?

—সে অনেক কথা। বেনেবাড়ির রেষারেষি। তুই ছেলেমানুষ। তোকে বলা যাবে না। সর দেখি। আমি উঠি। মতির মা-টা কী করছে, গিয়ে দেখি। মেয়েটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান হল না।

খাট থেকে মা নেমে পড়ার উপক্রম করছে দেখে বললাম— আর একটু বোসো না মা। তোমার সঙ্গে গল্প করি।

মা খাট থেকে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা কাঁধের পিছনে ফেলে বলল— আমার কি কোথাও দু'দণ্ড বসার জোগাড় আছে বাবা? রাজ্যের কাজ তা'লে পড়ে থাকবে। তুই বোস। তোর জন্য ক্ষীর নিয়ে আসি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—তুমি তাহলে ওপরে পাঠিয়ে দাও মা। আমি ওপরের ঘরে আছি।

ফের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। ডিনার করার আগে এই সময়টায় আমার কোনও কাজ থাকে না। তাই কোনও কোনও দিন বই নিয়ে বসি। লালির হাত দিয়ে টোটা ক'দিন আগে একটা বই পাঠিয়েছিল। সচিত্র হঠযোগ প্রদীপিকা। বইটার আসল লেখক স্বাত্মারাম যোগী। সেই বইটাই বাংলায় টীকাসহ ফের লিখেছেন স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী। টালা পার্কের দিকে কোথায় যেন টোটা যোগব্যায়াম কম্পিটিশনে গেছিল। সেখানে ওর সঙ্গে দেখা হয় যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতীর। ওর সঙ্গে কথা বলে যোগেশ্বরানন্দ এমন খুশি হন যে, নিজের হাতে বইটা উপহার দেন টোটাকে।

বইটা টোটা নিজে পড়ে ফেলেছে। এক দিন হঠযোগ সম্পর্কে অনেক কথাও বলেছিল। তখনই কথায় কথায় আমাকে বলে— সারা জীবন যদি নীরোগ রোগ থাকতে চাস বা দীর্ঘায়ু হতে চাস, বইটা পড়িস। অনেক কিছু জানতে পারবি।

মাঝে বইয়ে চোখ বোলানোর সময়ই পাইনি। তেতলায় উঠে প্রথমেই বইটা হাতে নিলাম। প্রায় চারশো পৃষ্ঠার। মন দিয়ে পড়তে শুরু করলাম। এত দিন আমার ধারণা ছিল, হঠযোগ শুধু সাধুসন্তরাই করতে পারেন। সাধারণের জন্য নয়। আমাদের মতো লোক হঠযোগ করতে গেলে... অনেক বিপদ হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্যর ভূমিকা পড়ার সময় মনে হল, না... সাধারণ লোকও এর চর্চা করতে পারে। তবে সঠিক গুরু পেলে, তবেই। না হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই কথাটা পড়েই খানিকটা দমে গেলাম। সঠিক গুরু পাব কোথায়?

বইটা পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এ তো সব বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ। হঠযোগীর অপথ্য অধ্যায়ে লেখা আছে : এই যোগ অভ্যাসকারীদের কখনওই করলা, তেঁতুল, লঙ্কা, লবণ, তিল বা সরষে থেকে বের করে নেওয়া তেল, মাছ, মাংস, মদ, দই, ঘোল, ক্ষীর, কলাইয়ের ডাল হিঙ, রসুন, পিঁয়াজ, গাজর প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়। ভাত, ডাল, রুটি ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার সেই সব খাবার গরম করে খাওয়া যোগীর পক্ষে অহিতকর বলে জানবে। উদর পূর্তি করে ভোজন করা কোনও মতেই উচিত নয়। ভোজনের সময় উদরের এক-চতুর্থাংশ খালি রাখিবে। বাঃ, এই সব কথাই তো আমাদের বলে গেছিলেন ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট হোল্ডার মি. কাওয়াসাকি। কী অদ্ভুত! নীরোগ থাকার যে সব পদ্ধতির কথা আমাদের মুনি-ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে বলে গেছেন, সেই সব কথাই এখন আমেরিকানদের আর জাপানিদের মুখে শুনে বিশ্বাস করতে হচ্ছে। যোগেশ্বরানন্দ লিখেছেন, এই বইটা ছাপানোর জন্য একটা সময় তাঁকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই আমার মনে হল, আমেরিকানরা যদি এই বই পেত, তাহলে লুফে নিত।

ভাই, এত মনোযোগ দিয়ে কী পড়ছ, বলো তো?

বউদির গলা। শুনে মুখ তুলে তাকালাম। বউদির এক হাতে ক্ষীরের বাটি। অন্য হাতে জলের গ্লাস। আমাকে খাওয়ানোর জন্য নিজে নিয়ে এসেছে। একটু আগেই পড়েছি দই, ঘোল, ক্ষীর প্রভৃতি খাওয়া অনুচিত। ক্ষীর দেখেই মনটা তাই বেঁকে বসল। বউদির বাপেরবাড়ি থেকে পাঠানো জিনিস। মুখের ওপর না বলা যাবে না। বউদি তাহলে দুঃখ পাবে। বউদি দুঃখ পাবে এমন কোনও কাজ আমি করতেই পারব না। কায়দা করে পরে ক্ষীরের বাটিটারই একটা সদগতি করতে হবে। কথাটা মনে হওয়া মাত্রই আগ্রহ দেখিয়ে বাটিটা হাতে নিয়ে বললাম—যোগাসনের ওপর

একটা বই।

চেয়ারটা সামনে টেনে নিয়ে আমার মুখোমুখি বসে বউদি বলল—তোমার বোধহয় আর ব্রহ্মচর্য পালন করা হল না ভাই।

—কেন?

—হবু শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগল, আগে বলো।

—খবরটা তাহলে এ বাড়িতে পৌঁছে গেছে।

—এই মাত্র পৌঁছল। বুলবুল আমাকে ফোন করেছিল। ওর মুখেই শুনলাম। বাব্বা কী আপসোস মেয়ের! বাড়িতে না কি তখন ছিল না? পড়তে গেছিল?

—আমি যে ও বাড়িতে গেছিলাম, মা জানে?

—আমার মুখেই শুনলেন। শুনে কী বললেন, জানো? কী ডাকাত ছেলে দেখো বউমা, এত ক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করে গেল, অথচ আমায় বলল না? সে যাক, তুমি বললে না তো হবু শ্বশুরবাড়ি পছন্দ হয়েছে কি না?

—আমার পছন্দ-অপছন্দে কী এসে যায় বলো।

—তোমাকে একটা গোপন খবর দিতে পারি ভাই।

—কী গো?

—ও বাড়ির সঙ্গে কুটুম্বিতে হোক, মা মন থেকে চাইছেন না।

—কী বলছ তুমি? এই তো বিকেলে মা আমার কাছে এসে পীড়াপীড়ি করছিল।

—সে তো মুখের কথা। মা কিন্তু তোমার জন্য অন্য একজনকে ভেবে রেখেছিল। নামটা শুনবে না কি ভাই?

—থাক, শুনে আমার দরকার নেই।

—তা'লে থাক। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল তাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসার। কিন্তু তুমি যখন ধনুর্ভঙ্গ পণ করেই ফেলেছ, তখন নামটা না বলাই ভাল।

মুচকি হেসে বউদি এ বার উঠে দাঁড়াল। তার পর বলল— আমার একটা কথা রাখবে, ভাই?

—কী বলো?

—আগে কথা দাও রাখবে, তা'লে বলব।

—উফ, বলোই না।

—মাকে কোনও দিন কষ্ট দিও না। মায়ের খুব চিন্তা তোমাকে নিয়ে। মা যদি তোমাকে কোনও দিন কোনও অনুরোধ করেন, সেটা রাখার চেষ্টা কোরো।

বউদির গলা খুব সিরিয়াস। হঠযোগ মাথায় উঠল। বললাম—কী হয়েছে বউদি, খুলে বলো তো? আমাকে নিয়ে বাড়িতে কি অশান্তি হয়েছে? কিন্তু কেন?

—সব কথা তোমাকে বলতে পারব না ভাই। যা বললাম, মনে রেখো।

কথাটা বলেই বউদি আর দাঁড়াল না। আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে নিচে নেমে গেল। বইয়ে আর মন দিতেই পারলাম না। মায়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মা সম্পর্কে অ্যাদ্দিন আমার যে ধারণা ছিল, ইদানীং তা বদলাতে শুরু করেছে। পর পর কয়েকটা ঘটনায়, কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাদের এই সংসারটার রাশ মা-ই টেনে রেখেছে। আড়ালে থেকে মা সবাইকে চালাচ্ছে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না। মা অসম্ভব বুদ্ধিমতী। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আমাদের বেনে সমাজে এ রকম একজন মহিলা পাওয়া মুশকিল।

ঠিক বুঝতে পারলাম না, মা আমার সম্পর্কে এত দুর্বল কেন?

তেরো

হোটেলের বিশাল লাউঞ্জটায় ঢুকতেই কালো সাফারি স্যুট পরা এক ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে এসে আমায় বললেন— আসুন মিস্টার দত্ত। স্যার আপনার জন্য চাইনিজ রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছেন। সত্যিই পটেলভাইয়ের জবাব নেই। কাল সন্ধ্যায় ফোনে কথা বলার সময় উনি আমাকে বলতে ভুলে গেছিলেন কত নম্বর রুমে আছেন। এখানে এসে রিসেপশনিস্ট মারফত খোঁজ করতে গেলে জানতেই পারতাম না, উনি নিচের রেস্তোরাঁয় ব্রেক ফাস্ট করতে নেমেছেন।

উনি ঘরে না ফেরা পর্যন্ত আমাকে লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে হত। সেই কথাটা আগে ভেবেই পটেলভাই আমার জন্য একটা লোককে বসিয়ে রেখেছেন লাউঞ্জে। লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু সাফারি স্যুটের রং দেখে মনে হল, পার্সোনাল বডি গার্ড। এ রকম অনেক লোককে পটেলভাই পোষেন। এক এক বার এক একজনকে দেখি। কিন্তু লোকটা আমাকে চিনল কী করে বুঝতে পারলাম না।

আমার আসার কথা ছিল ন'টার মধ্যে। কিন্তু এসে পৌঁছেছি পনেরো মিনিট দেরিতে। ঠিক করে বেরিয়েছি, ব্রেকফাস্ট সেরেই দীপাকে নিয়ে সোজা চলে যাব জোড়াসাঁকো। ঠাকুরবাড়িটা ভাল করে ঘুরিয়ে দেখাব। ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। তার পর একটা দেড়টা নাগাদ ওকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে। লাঞ্চ করানোর জন্য। ওকে ভাত মাছ খাওয়ানোর ইচ্ছে আমার। একেবারে ঘরোয়া রান্না।

এর পিছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। ফোনে মাঝেমধ্যে যখন ওর সঙ্গে আমার কথা হয়, তখন ও প্রায়ই বাঙালিদের সম্পর্কে নানা কথা জানতে চায়। কথায় কথায় এক বার দীপা আমায় বলেছিল, ওদের বাড়িতে মাছ-মাংস খাওয়ার চল নেই। কিন্তু বাইরে ও সবই খায়। মিঠিবাই কলেজে ওর কে এক বন্ধু ছিল বাঙালি। সে না কি এক বার শুঁটকি মাছ খাইয়েছিল। দীপা গল্প করেছিল, এমন সুস্বাদু ডিশ না কি

আগে কখনও খায়নি। ওকে আমি শুঁটকি মাছ খাওয়াতে পারব না। ও সব বাঙালদের রান্না। আমাদের বাড়িতে হয় না।

আমার বাবা বাঙালদের সহ্যই করতে পারে না। ওদের না কি সব খারাপ। বাবা এখনও পূর্ব পাকিস্তানের লোক বলে ভাবে। কেউ বাঙাল শুনলে এখনও বাবার চোখমুখ কুঁচকে যায়। কলেজে আমাদের ক্লাসে অজিত সাহা বলে একটা ছেলে পড়ত। তাকে এক দিন আমি আর টোটা আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। বাবা ওর নামটা শুনে তখন কিছু বলেনি। পরে বলে দিয়েছিল—ওরা রিফিউজি। ওদের কখনও এ বাড়িতে আনবি না।

আমার মা অবশ্য এ রকম না। যে যাই হোক, মা কখনও কাউকে ছোট নজরে দেখে না। কিন্তু তাই বলে মা কাউকে শুঁটকি মাছ রান্না করে খাওয়াবে, এমনটা ভাবতেই পারি না। মাকে বলে এসেছি, মতির মাকে দিয়ে ইলিশ মাছের কিছু করাতে। দীপাকে আজ চমকে দেব। সে বার তো ও বলেছিল, কখনও ইলিশ মাছ খায়নি। সে অনেক দিন আগের কথা। এর মধ্যে যদি টেস্ট করে থাকে, তাহলে আলাদা ব্যাপার।

তবে খাওয়ানোর ব্যাপারটা নির্ভর করছে, যদি আমাদের বাড়িতে যেতে ও রাজি হয়। মায়ের খুব ইচ্ছে, দীপাকে দেখার। সকালে আমাকে এমনও বলল, 'আমার নাম করে বলবি, যাতে আসে। আহা রে, বেচারির মা নেই। কখনও মায়ের আদর পায়নি।' ঠিক বুঝতে পারছি না, আমাদের বাড়িতে দীপাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পটেলভাইয়ের অনুমতি নেওয়ার দরকার আছে কি না। আমার অবশ্য মনে হয় না, উনি আপত্তি করবেন। পরিস্থিতি তেমন বুঝলে, না হয় অনুমতি নেব। সাফারি স্যুট পরা লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললাম— মিস্টার পটেল কি আমার জন্য অনেক ক্ষণ বসে আছেন?

—না, না। এই মিনিট পাঁচেক হল নেমেছেন।

—ওঁর সঙ্গে কি আর কেউ আছেন?

—হ্যাঁ। মিস পটেল আর বিদেশি এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা।

মিস পটেলকে না হয় চিনতে পারলাম। দীপা। কিন্তু বাকি দু'জন বিদেশি কে? নিশ্চয়ই ব্যাবসার কথাবার্তা বলার জন্যই এসেছেন। একটু পরে রেস্তোরাঁতে ঢুকতেই দেখি বেশ ভিড়। এ দিক ও দিক তাকাতেই দেখতে পেলাম, কোণের দিকে এক টেবিল থেকে পটেলভাই হাত তুলে আমার নজর কাড়ার চেষ্টা করছেন। পটেলভাই ও দীপা পাশাপাশি চেয়ারে বসে। উল্টো দিকে দুই বিদেশি। দীপার পাশের চেয়ারটা খালি। সে দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বসতে বলে পটেলভাই বললেন— বোসো গডব্রাদার, আগে তোমার সঙ্গে এই অতিথির আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার জন ব্লিচ। থাকেন প্যারিসে। আর ইনি মিস মিশেল দুম। জোহানেসবার্গ থেকে এসেছেন।

তোমার লাইনেরই—ডায়মন্ড এক্সপার্ট। আর ইনি কুন্তল দত্ত, আমার ছোটভাইয়ের মতো। আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড।

ব্লিচ কী করেন, পটেলভাই তা বলেননি। জানতে চাওয়া আমার উচিতও নয়। ওঁরা দু'জনেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। হ্যান্ডশেক করলাম। ব্লিচের হাতের তালুটা বেশ কড়া। নিশ্চয় এমন কোনও কাজ করেন, যাতে লোহালক্কড় ব্যবহার হয়। মেকানিকও হতে পারেন। ভদ্রলোক এই সাতসকালে চোখে রোদ চশমা পরে আছেন। চৌকো মুখ। খুব টাফ ধরনের মানুষ বলে মনে হল। এই ভদ্রলোক এমন কাজও করে ফেলতে পারেন, যা সাধারণ লোক ভাবতেও পারবে না।

—তুমি কী খাবে কুন্তলদা? মেনু কার্ড হাতে নিয়ে প্রশ্নটা করল দীপা। আর তখনই প্রথম ওর দিকে ভাল করে তাকালাম। ওর পরনে বেশ দামি তাঁতের শাড়ি। আগের বার যখন কলকাতায় এসেছিল, তখন কোনও দিন ওকে শাড়ি পরতে দেখিনি। এখন বেশ বড় বড় লাগছে। গুজরাতি মেয়েরা শাড়ি একটু অন্য ভাবে পরে। ওরা আঁচলটা ডান কাঁধে রাখে। দীপা কিন্তু শাড়িটা পরেছে বাঙালি মেয়েদের মতো। আঁচল বাঁ দিকে। একদম বাঙালি বলে মনে হচ্ছে ওকে। দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে। তবে মুখশ্রীটা মনে হল, একদম বদলে গেছে। আগে ওর ডান গালে একটা তিল লক্ষ করেছিলাম। এ বার সেটা নেই। এ রকম তো হওয়ার কথা নয়।

উত্তরের অপেক্ষায় দীপা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। হেসে বললাম—টোস্ট, বাটার অ্যান্ড ওমলেট।

—ব্যস! আর কিছু নয়? ফ্রুট জুস বা অন্য কিছু?

—পাইন অ্যাপেল জুস নিতে পারো।

দীপা অর্ডার দিতে ব্যস্ত। এমন সময় পটেলভাই আমাকে বললেন—গডব্রাদার, মিস্টার ব্লিচের সঙ্গে কালকেই আমি কাঠমান্ডু যাব। দু'তিনদিনের জন্য। দীপা এখানেই থাকবে। ওকে কিন্তু দেখভাল করতে হবে তোমাকে।

বললাম— মাই প্লেজার।

—আজ টেগোরের বাড়িতে ওকে নিয়ে যাচ্ছ?

—সেই জন্যই তো এসেছি।

—আমার মেয়েটা টেগোরের ভীষণ ভক্ত। টেগোরের কিছু গল্প গুজরাতিতে অনুবাদও করেছে। টেগোরের ওপর ও কী যেন রিসার্চ করতে চায়। আমি ও সব বুঝি না। পারলে তুমি ওকে হেল্প কোরো।

—নিশ্চয়ই।

—টোগোরের ইউনিভার্সিটি এখান থেকে কত দূর গডব্রাদার?

—শান্তিনিকেতনের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। টেগোর যেখানে থাকতেন।

—ট্রেনে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। এখন রাস্তা খুব ভাল হয়ে গেছে। গাড়িতে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে চলে যাওয়া যায়।

—কী নাম যেন ইউনিভার্সিটিটার?

—বিশ্বভারতী।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। দীপা ওখানে গিয়ে থাকতে চায়। ওখানে কি বাড়ি-টাড়ি কিনে ফেলা যাবে? দু'চারদিনের মধ্যে?

—খোঁজ করতে হবে।

—একটু দেখো তো গডব্রাদার? মেয়ে আমাকে পাগলা করে দিচ্ছে। আমি তো ভাবছি, কোনও বাঙালি ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে ওকে এখানেই পাঠিয়ে দেব। এমন ছেলে, যে ওর মতোই টেগোরকে ভক্তি করে।

কথাটা বলেই পটেলভাই হা হা করে হাসলেন। বললাম— এমন ছেলে এখানে অনেক পাবেন।

—দীপার কী ধারণা, জানো গডব্রাদার? তোমরা বাঙালিরা খুব ভাগ্যবান। তোমাদের এখানে এমন একজন গ্রেট পোয়েট জন্মেছেন। তোমাদের ভাষায় লিখে রেখে গেছেন। তোমার নিশ্চয়ই ওঁর সব রচনা পড়া আছে, তাই না?

—কিছু কিছু।

বলেই চুপ করে গেলাম। আমাদের বাড়ির কয়েক গজের মধ্যেই ঠাকুরবাড়ি। কিন্তু গত বারো-তেরো বছরের মধ্যে সেখানে পা দিয়েছে কি না সন্দেহ। পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প, কবিতা কিছু পড়েছি। তার বাইরে আর কিছুই আমি জানি না। ছোটবেলায় দাদু প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখের দিন আমাকে ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে যেত। অনেক গানটান হত। কিন্তু বড় হওয়ার পর আর ও দিকে যাইনি। আমি সায়েন্সের ছাত্র। কোনও দিন আগ্রহই বোধ করিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে।

উল্টে, কলেজে পড়ার সময় রবীন্দ্রভারতী আর বিশ্বভারতী সম্পর্কে আমরা ঠাট্টা করতাম, ওটা নৃত্যগীতের ইউনিভার্সিটি। লালির খুব ইচ্ছে ছিল, রবীন্দ্রভারতীতে পড়ার। কিন্তু আমরা হাসাহাসি করব, এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত ও গিয়ে ভর্তি হল বেথুন কলেজে। ওর কয়েকজন বন্ধু অবশ্য রবীন্দ্রভারতীতে পড়ে। সংযুক্তা, মল্লিকা, অনিন্দিতা, ঝুমা। ওদের সঙ্গে আড্ডা মারার জন্য লালি প্রায়ই জোড়াসাঁকো যায়। আমি জানি। ওর কথা মনে হতেই ফট করে মাথায় এল, আরে... লালিই তো দীপাকে সাহায্য করতে পারে। ও বাংলা নিয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। খুব সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীতও গায়। ওর সঙ্গে দীপাকে ভিড়িয়ে দিলে কেমন হয়?

টেবিলে খাবার সার্ভ করা হয়ে গেছে। পটেলভাই খেতে খেতে নিচু গলায়

কথা বলছেন মিস দুমের সঙ্গে। কী ভাষায় কথা বলছেন বুঝলাম না। ফরাসি? হতে পারে। দুনিয়া চষে বেড়ান পটেলভাই। শুনেছি, অনেকগুলি ভাষা জানেন। ওদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করানোর সময় অবশ্য ইংরেজি ব্যবহার করেছিলেন। তার মানে ব্লিচ আর মিস দুম ইংরেজিটাও জানেন। কিন্তু এখন অন্য ভাষায় কথা বলছেন কেন? তাহলে কি ওঁরা চান না, ওদের আলোচনাটা আমি বুঝতে পারি? মিস দুম্ এক বার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ব্লিচও অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে। কেন জানি না, মনে হল কথাগুলো আমার সম্পর্কেই হচ্ছে।

...ব্রেক ফাস্ট সারতে সারতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েই পটেলভাই বললেন— গডব্রাদার, দুপুরের দিকে আমরা এক বার সল্টলেক সিটির দিকে যাব। কত ক্ষণ লাগবে বলো তো?

—ধরে নিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

—তোমাদের ফিরতে ফিরতে ক'টা হবে?

—চারটে সাড়ে চারটে।

—গুড। ততক্ষণে আমি ফিরে আসব। প্লিজ স্টে উইথ হার। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—মিস্টার পটেল, দীপাকে যদি আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে?

—কী বলছ তুমি! একেবারেই না। আরে দীপা তো খুব খুশিই হবে। ইন ফ্যাক্ট আমিই তোমার বাবাকে রিকোয়েস্ট করব ভাবছিলাম। ওর মতো আমারও বেঙ্গলি হাউসহোল্ড দেখার খুব ইচ্ছে। আজই কি ওকে নিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমার যাওয়া হবে না। আমারই ব্যাড লাক। এই দেখো না, একটু পরেই এই হোটেলে ডায়মন্ড জুয়েলারির একজিবিশন করছে তানিশ্‌ক। সেখানে আমায় থাকতে হবে। আমার বড় ক্লায়েন্ট। ওরা ইয়ানা গুপ্তাকে নিয়ে এসেছে। ওদের ব্রান্ড অ্যাম্ব্যাসাডর। ভাল বিজনেস করছে। তোমরাও এ রকম একজিবিশন করছ না কেন? বাবাকে বলো, শুধু শোরুমে এখন আর বিজনেস হবে না। ধামাকা লাগাতে হবে।

শুনে মনে মনে হাসলাম। বাবা লাগাবে ধামাকা! এ সব প্রোমোশনের কথা বাবার মতো পুরনো আমলের লোকেরা ভাবতেই পারে না। মাস ছয়েক আগে কথায় কথায় দাদাকে বলেছিলাম, আমাদের শো-রুমে যত জুয়েলারির ডিজাইন আছে, একজন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে তার একটা ডিসপ্লে সিডি তৈরি করার জন্য। শো-কেস থেকে গয়না বের করে দেখাতে যত সময় লাগে, তার অনেক কম সময়ে

কম্পিউটারে সেই গয়না কাস্টমারকে দেখানো সম্ভব। গয়না প্রতি দশ টাকা লাগবে। শুনে বাবা পিছিয়ে গেল! সেই মানুষকে পটেলভাই ধামাকা লাগাতে বলছেন। বাবার মতো লোকেরা তাতে রাজিই হবে না।

হেসে বললাম—বাবাকে আপনি বলুন না।

—বলব। দেখা হোক। কাঠমান্ডু থেকে আগে ফিরে আসি, তার পর তোমাদের শো রুম এক বার ঘুরে আসা যাবে। যাক গে, শোনো গডব্রাদার, আজ কিন্তু তুমি ডিনারটাও আমার সঙ্গে করবে। তোমাকে সহজে ছাড়ছি না।

বললাম— ঠিক আছে।

দীপাকে বাড়িতে নিয়ে যাব বলেই দাদার টয়োটা করোলাটা নিয়ে গেছিলাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেই বললাম— তোমার যে এত বাঙালি প্রীতি, আগে তো জানতাম না দীপা? ফোনেও কখনও বলোনি।

—এটা কেন হয়েছে জানো? গুরুদেবের জন্য।

—কে গুরুদেব?

—ঠাট্টা করছ? তুমি জানো না? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার কাছে সত্যিই উনি গড। মানে ঠাকুর। জানো কুন্তলদা, সুরাতের স্কুলে আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন আমার একজন প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। তাঁর নাম জয়া দাশগুপ্তা। তাঁর মুখেই প্রথম গুরুদেবের নাম শুনি। উনি পড়াতে আসতেন ইংরেজি। আমাকে টাস্ক দিয়ে অনেক সময় উনি বাংলা বই পড়তেন। তখন থেকেই বাংলাভাষা সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ। জয়াদিই আমাকে বাংলা শিখিয়েছেন।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে খুব একটা কথা বলেনি দীপা। গাড়িতে বকবক শুরু করল। আচ্ছা, গুরুদেব কি ঠাকুরবাড়িতেই জন্মেছিলেন? শুনেছি, উনি না কি কোনও স্কুলে পড়াশুনা করেননি? উনি না কি খুব অল্প বয়েসে মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন? ঠাকুরবাড়ির যে ঘরে বসে উনি লিখতেন, সেই ঘরটায় ঢুকতে দেবে? কবে উনি শান্তিনিকেতনে চলে যান? আচ্ছা শান্তিনিকেতন থেকে ওঁর যে সব জিনিস চুরি গেছিল, সেগুলো কি ফেরত পাওয়া গেছে? আমি পড়লাম মুশকিলে। অনেক উত্তর আমার জানা নেই। বাধ্য হয়ে বললাম, ঠাকুরবাড়িতে অনেক গাইড আছেন। তাঁদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে নিলেই হবে। ওঁরা সব জানেন। তখন সব প্রশ্নের জবাব তুমি পেয়ে যাবে।

গাড়ি চলছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ দিয়ে। জানলা দিয়ে শহরটাকে যেন গিলছে দীপা। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল— এই শহরের সব কিছুর মধ্যেই গুরুদেবের ছোঁয়া আছে, তাই না কুন্তলদা?

বললাম— তোমার তাই মনে হচ্ছে?

—অফ কোর্স। হয়তো এই রাস্তা দিয়েই কোনও দিন গুরুদেব গাড়ি করে গেছেন।

—হতে পারে।

—জানো আমার খুব ইচ্ছে, সুরাতে গুরুদেবের নামে একটা ইনস্টিটিউশন খোলার। ড্যাডির কাছে দশ কোটি টাকা চেয়েওছি। ড্যাডি বলেছে, ইলেকশনটা হয়ে গেলেই টাকা দেবে।

মেয়ের আবদার রাখার জন্য পটেলভাই দশ কোটি টাকা দেবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। উনি কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক। আমি জানি। দীপা ছাড়া পটেলভাইয়ের আপন বলতে আর কেউ নেই। ইচ্ছে করলে একশো কোটি টাকাও উনি ঢালতে পারেন ওই ইনস্টিটিউশনের জন্য। আমি শুধু অবাক হচ্ছি দীপার কথাবার্তা শুনে। পটেলভাইয়ের মতো একজন ব্যবসায়ীর মেয়ে দীপা এত সংস্কৃতিমনস্ক হল কী করে? বললাম— ইনস্টিটিউশনটা মুম্বইয়ে না করে সুরাতের কথা ভাবলে কেন?

—মুম্বইয়ের কোনও কালচারাল হেরিটেজ আছে নাকি কুন্তলদা? তোমাদের কলকাতা শহরের মতো? ওখানে তো মানুষকে মাপা হয় টাকাপয়সার নিক্তিতে। গুরুদেবের কদর করার লোক আছে না কি?

কথাগুলো বলেই দীপা চুপ করে গেল।

ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। এই সময়টায় রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভিড় থাকে। গাড়ি থেকে নেমেই দীপা জিজ্ঞেস করল— এখানে এত ছেলে-মেয়ে... রোজ ঠাকুরবাড়ি দেখার জন্য এত ভিড় হয়?

বললাম— না। এরা স্টুডেন্ট। এখানে তোমার গুরুদেবের নামে একটা ইউনিভার্সিটির কয়েকটা সেকশনের ক্লাস হয়। গান, নাচ, নাটক...।

—বাকি সেকশন?

—সেই ক্লাসগুলো হয় নর্থ ক্যালকাটায় এমারেল্ড টাওয়ার্স বলে একটা জায়গায়। আগে সেখানে আমাদের স্টেট লাইব্রেরি ছিল।

—এটা তো আমি জানতাম না।

কথাটা বলার পরই দীপার হঠাৎ চোখে পড়ল লনের এক পাশে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটার দিকে। মোহগ্রস্তের মতো ও মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল। জুতো খুলে দু'হাত জড়ো করে দীপা অনেক ক্ষণ ধরে প্রণাম করল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত ক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছিলাম বলে ভাল করে ওর দিকে তাকাইনি। এখন মনে হচ্ছে, দীপা শুধু সুন্দরীই নয়, অসাধারণ সুন্দরী। প্রণাম শেষ করে ও

আমার দিকে ঘুরতেই ওর নাকছাবিটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। নাকছাবিতে সুপারক্লাস ক্যাটাগরির ডায়মন্ড। এক ক্যারাটের তো হবেই। প্রায় আড়াই-তিন লাখ টাকা দাম। এ রকম দামি হিরের নাকছাবি পরা পটেলভাইয়ের মেয়ের পক্ষেই সম্ভব।

দীপা জুতো পায়ে গলিয়ে নেওয়ার পর আমি বললাম— চলো, ঠাকুরবাড়ির ওপরে যাই। যে ঘরটায় উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, তোমাকে সেই ঘরটা দেখাব। এখানে একটা মিউজিয়ামও আছে।

দীপাকে নিয়ে সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছি, এমন সময় আটকাল সিকিউরিটি গার্ড— সরি স্যার। ওপরে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

চোদ্দো

ঠাকুরবাড়িতে আগে কখনও সিকিউরিটি গার্ড দেখিনি। বিরক্তিতেই মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল— কেন?

—মিউজিয়াম কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কথাটা শোনার পরই দপ করে আমার সব উৎসাহ নিভে গেল। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে যাওয়ার পর, কাগজে পড়েছিলাম, এখানেও বেশ কিছু দিন কড়াকড়ি হয়েছিল। কিন্তু সে তো প্রায় এক মাস আগেকার ঘটনা।

এখনও মিউজিয়াম বন্ধ রাখা হবে কেন? বললাম— ভাই, এই ভদ্রমহিলা মুম্বই থেকে ঠাকুরবাড়ি দেখতে এসেছেন। এঁর জন্য ব্যবস্থা করা যায় না?

—তা হলে আপনাকে চিফ সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—উনি কোথায়? ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?

—ওপরে আছেন। আমার অবশ্য মনে হয় না, উনি রাজি হবেন। আসলে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট নতুন ভাবে করা হচ্ছে। তাই সিল করে দেওয়া হয়েছে।

—মিউজিয়াম কবে খোলা হবে, আইডিয়া দিতে পারেন?

—জানি না। স্যারই বলতে পারবেন।

আমাদের কথাবার্তা শুনে দীপা বেশ হতাশ। চোখাচোখি হতেই বলল— আমারই ব্যাড লাক। এমন সময় এলাম, মিউজিয়ামটাও দেখতে পেলাম না।

বললাম— কী আর করা যাবে! চলো, আমাদের বাড়িতে চলো।

বললাম বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাল না দীপা। বলল —এই লনে কিছু ক্ষণ বসবে, কুন্তলদা? বাইরে থেকেই না হয় বাড়িটাকে প্রাণভরে দেখে যাই।

—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এই রোদ্দুরে বসবেটা কোথায়?

এ দিক ও দিক তাকিয়ে দীপা বলল— তা হলে ভেতরে চলো। ওখানে বোধহয় কিছু একটা হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা মন দিয়ে কী যেন দেখছে।

ভেতরে মানে... ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে। কয়েক পা হেঁটে ভেতরে ঢুকতেই দেখি, নাটমন্দিরের উঠোনে নাটকের মহড়া হচ্ছে। চারদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রচুর ছেলেমেয়ে চুপচাপ সেই মহড়া দেখছে। অভিনেতাদের সবার পরনে লাল ধুতি। মালকোঁচা মারা। কপালে লাল ফেট্টি। অভিনেত্রীদের পরনে হলুদ শাড়ি। অল্প বয়সি সব ছেলে-মেয়ে। ঠিক বুঝতে পারলাম না, এরা ছাত্রছাত্রী কি না। ছেলেগুলো সমস্বরে গান গাইছে, 'বলো বলো আজ মা কালী।' নাচের ভঙ্গিতে গান গেয়ে যাচ্ছে। ওদের বডি ফিটনেস দেখে একটু অবাকই হলাম।

দীপা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় আমার মাথায় মাথায়। ওর গা দিয়ে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। সেটা নাকে যেতেই আমি সরে দাঁড়ালাম। হচ্ছেটা কী? টোটা যদি এই অবস্থায় আমাকে দেখতে পেত, তা হলে হয়তো আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসত। কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার কোনও দরকার নেই আমার। হোক না সে পটেলভাইয়ের মেয়ে।

—বাল্মীকি প্রতিভা। বুঝলে কুন্তলদা! হঠাৎ দীপা বলে উঠল। আবিষ্কারের উত্তেজনায় ওর চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে। স্থান-কাল ভুলে আমার কাছে সরে এসে ও বলল— এরা বাল্মীকি প্রতিভার রিহার্সাল দিচ্ছে। আমার গুরুদেবের লেখা নাটক। কলেজে আমরাও এই নাটকটা এক বার করেছিলাম।

—বাংলায় করেছিলে?

— না না হিন্দিতে। আমাদের এক প্রফেসর ছিলেন বিজয় শ্রীবাস্তব। তিনিই হিন্দিতে এই নাটকটা লিখে দিয়েছিলেন। আমি করেছিলাম বনদেবীর রোলটা।

কথাগুলো বলেই দীপা ফের রিহার্সাল দেখায় মন দিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় বারোটা। এই সময়টায় বাড়িতে চলে গেলে ভাল হত। বাবা আসার আগে দীপাকে পুরো বাড়িটা তা হলে ঘুরিয়ে দেখানো যেত। কিন্তু দীপা যেভাবে আগ্রহ নিয়ে রিহার্সাল দেখছে, এখন ওকে নড়ানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আমারই মুশকিল। নাটক-থিয়েটার দেখার তাগিদ আমার কোনও কালেই ছিল না। ছোটবেলায় মাত্র এক বারই একটা যাত্রা দেখেছিলাম। এখনও মনে আছে। বিনয় বাদল দীনেশ।

কোম্পানির বাগানে যাত্রাটা আমাকে দেখতে নিয়ে গেছিল দাদু। মোটেই আমার ভাল লাগেনি। দাদু মারা যাওয়ার পর বাবার জামানায় যাত্রা থিয়েটার দেখার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি কোনও দিন। বাবা নিজে পছন্দ করে না। কেউ দেখুক, সেটাও চায় না। ভাবা যায়, আমার মা উত্তম-সুচিত্রার এত ফ্যান, অথচ বাবা কোনও দিন

মাকে হাতিবাগানে একটা সিনেমা পর্যন্ত দেখাতে নিয়ে যায়নি। মা আক্ষেপ করে কথাটা এক দিন বউদিকে বলেছিল। আমি সেটা শুনে ফেলেছিলাম।

দীপা তন্ময় হয়ে নাটকের মহড়া দেখছে। ওর চোখ মুখের রং বদলাচ্ছে বারবার। ওর সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু নিজেকে সংযত করার জন্যই চোখটা সরিয়ে নিলাম। হলুদ শাড়ি পরা মেয়েগুলো এ বার নাচতে শুরু করেছে। গান গাইছে। তা দেখতে দেখতে দীপা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আমায় বলল— গানটা শুনছ, কুন্তলদা? খানিকটা ওয়েস্টার্ন টাচ আছে, তাই না? এই প্রথম গুরুদেব ওঁর গানে ওয়েস্টার্ন টিউন আনেন।

—তুমি তো দেখছি অনেক জানো দীপা।

—আমার জীবনটা আজ ধন্য হয়ে গেল কুন্তলদা। জানো, বইয়ে পড়েছি, এই নাটমন্দিরেই গুরুদেব বাল্মীকি প্রতিভা নিজে পারফর্ম করেন। উনি হয়েছিলেন দস্যু রত্নাকর। উফ, কত বছর আগেকার কথা। ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এই দেখো। বলেই ডান হাতটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরল দীপা। প্রথমে ওর হাত, তার পর ওর বুকের দিকে চোখ চলে গেল। তখনই হঠাৎই আমার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। পরক্ষণেই মনে হল, ছিঃ, আজ এ কী হল আমার? এত অধঃপতন হয়েছে যে, একটা মেয়ের বুকের দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছি! নাহ, বাড়ি গিয়ে টোটার সেই মন্ত্রটা আজ জপ করতেই হবে। কৃষ্ণ কালী হরি রাম। মনটা শান্ত করা দরকার। তার আগে দরকার যত শিগগির সম্ভব ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্যই বললাম— বড্ড গরম লাগছে দীপা। চলো, আমাদের বাড়িতে যাই।

—সে কী! কই আমার তো গরম লাগছে না কুন্তলদা। আমার এত ভাল লাগছে, এখান থেকে যেতেই ইচ্ছে করছে না।

—এখন চলো। আর এক দিন আসা যাবে। তোমার জন্য আমার মা অপেক্ষা করছে।

—চলো তা হলে।

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। পাশাপাশি দু'জনে গেটের দিকে হাঁটছি। ছেলে-মেয়েরা অনেকেই আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎই রাস্তার দিকে আমার চোখ গেল। দেখি, উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে লালি। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই স্পষ্ট দেখলাম, ওর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভোরবেলায় খুব বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন দেখেছি। কে যেন এসে আমাদের বাড়িতে খবর দিয়েছে, টোটার

মা মারা গেছে। আমি এলগিন রোডের বাড়িতে চালাঘরের নিচে বসে তখন হামিদের সঙ্গে হিসাবনিকেশ করছি। মা মোবাইলে ধরে আমাকে বলল— টুম্পাই, টোটা কি তোকে ফোন করেছিল? আমি বললাম, না তো। কেন, কী হয়েছে? মায়ের গলাটা ভাঙা ভাঙা। বলল— তুই শিগগির টোটাদের বাড়িতে চলে আয়। ওর মা আর নেই। শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম— তুমি ঠিক জানো? কাল রাতেই তো টোটার বাড়িতে ফোন করে ছিলাম। মাসিমা আমার সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধরে কথা বললেন। তখন তো ভালই ছিলেন। এর মধ্যে কী এমন হল, মারা গেলেন? মা বলল— রাধেশ্যাম জিউ কখন কাকে ডেকে নেন, তার কি ঠিক আছে রে! তুই এক বার আয় বাবা ওদের বাড়িতে। তোকে খুব ভালবাসত যে!

চোখ খুলে দেখি, কোথায় কী! বিছানায় আমি শুয়ে আছি। ভোরবেলার স্বপ্ন সত্যি হয়। তবে অন্য ভাবে। পরের দেখলে নিজের হয়। টোটার মায়ের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখা... মানে খুব শিগগির আমাদের বাড়িতে কেউ মারা যাবে। এই কথাটা অন্য কেউ শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এ সব আমি মানি। বিছানায় বসেই চিন্তা করতে লাগলাম, স্বপ্নটা যদি সত্যি হয়, তা হলে কে মারা যেতে পারে আমাদের বাড়িতে? জন্ম, মৃত্যু নিয়ে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তবুও গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। আমাদের বাড়ির সবার কোষ্ঠী আমার জানা। আপাতত কারও মৃত্যুযোগ নেই। একমাত্র মায়ের শরীরটা খারাপ হতে পারে।

অন্য দিনে ঘুম থেকে উঠে ছাদে হালকা ব্যায়াম সেরে নিই। কাল রাতে শোওয়ার সময় ঠিক করেছিলাম, ঘুম থেকে উঠে আগে মন্ত্র জপ করব। মনে যাতে আর কুচিন্তা না আসে। দীপার সঙ্গে আজও আমায় সারাটা দিন কাটাতে হবে। বেলা বারোটার সময় আমার হোটেলে যাওয়ার কথা। দুপুরের দিকে পটেলভাই কাঠমান্ডু চলে যাবেন মিস্টার ব্লিচ আর মিস দুম-কে নিয়ে। আমি জানতামই না, পটেলভাই নিজের প্লেন নিয়ে কলকাতায় এসেছেন।

কাল ডিনার করার সময় পটেলভাই যখন কথাটা বললেন, তখন মনে হল, নাঃ ক্ষমতা আছে লোকটার। একটা প্লেনের মালিক হওয়া চাট্টিখানি কথা! একটাই তো জীবন, বাঁচতে হলে ও রকম রাজার মতোই বাঁচা উচিত। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার পর মনে হল, এ সব আমি কী ভাবছি? চিত্রগুপ্তের খাতায় যার ভাগ্যে যা লেখা আছে, সেটাই হবে। এর অন্যথা হওয়ার কোনও উপায় নেই। রাজার ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি। আমি জানি।

বিছানায় বসে কথাটা ফের মনে হওয়ায় খানিকটা স্বস্তি পেলাম। তার পর মুখটুখ ধুয়ে এসে মন্ত্র জপ করতে বসে গেলাম। টোটা বলেছিল, জপ করার সময় চোখ বুজে চোখের মণি দুটো কপালের মধ্যিখানে ধরে রাখার চেষ্টা করবি। তাতে

মনঃসংযোগ বাড়বে। সেটা করতে গিয়ে কপালে টনটনানি শুরু হয়ে গেল। যত বারই চোখ বুজি, লালির সেই ফ্যাকাশে মুখটা ভেসে ভেসে ওঠে। কী করুণ সেই মুখ! অন্যায় করেছি। কাল ঠাকুরবাড়িতে খুব অন্যায় করেছি আমি। আমার উচিত ছিল, লালিকে ডেকে তখনই দীপার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি তা করিনি।

কী যে হল তখন আমার? তাড়াতাড়ি দীপাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। লালি কী মনে করেছে কে জানে? রাত দশটার সময় বাড়িতে ফিরেই টোটাকে এক বার ফোন করেছিলাম। প্রথম কয়েকবার রিং হয়ে গেল। তার পর চার বারের বেলায় মাসিমা এসে ফোনটা ধরলেন। বললেন, টোটা বা লালি কেউ বাড়ি নেই। ওরা দু'জন পোস্তায় নেমন্তন্ন খেতে গেছে। রাত দশটা পর্যন্ত টোটা কারও বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য আটকে গেছে, আজ পর্যন্ত তা শুনিনি। বেনেটোলায় নিজের মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েও এক বার টোটা রাত ন'টার মধ্যে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। পোস্তায় ওদের কে এমন থাকেন যে, টোটা সেখানে জমে গেছে! নাঃ, কারও কথা তো কোনও দিন শুনিনি।

মন্ত্র জপ করা আমার শিকেয় উঠল। মনে হল, টোটাদের বাড়িতে চলে যাই। কিন্তু ভোর ছ'টায় কোনও দিন ওদের বাড়িতে যাইনি। আর গিয়েই কী করব এখন? কী কারণ দেখাব? একটা কথা অবশ্য মাসিমাকে বলা যায়, ভোরবেলায় একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি। তাই এলাম। শুনে মাসিমা হয়তো হাসাহাসি করবেন। টোটাকে পরে বলবেন, দ্যাখ, তোর থেকে আমার বড় ছেলে আমায় কত বেশি ভালবাসে। সক্কাল বেলায় কেমন দৌড়ে এসেছে। কিন্তু তার পর? টোটা তো ঘুম থেকে ওঠে সাতটা সাড়ে সাতটার সময়। লালি কখন ওঠে, তা আমার জানা নেই।

জপ করা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নিচের চিৎপুরের রাস্তার এখন অন্য চেহারা। নতুনবাজারে মাল নামানোর জন্য শেষ রাতে সারি সারি ট্রাক এসে দাঁড়ায়। সবজি নামিয়ে কয়েকটা ট্রাক এখনও দাঁড়িয়ে। হঠাৎই নজরে পড়ল, বাবা হাতেটানা একটা রিকশায় উঠেছে। তার মানে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। জগন্নাথ ঘাটে বাবা রোজ স্নান করতে যায়। আজ বোধহয় একটু তাড়াতাড়িই যাচ্ছে। সেই ছোটবেলাকার অভ্যেস। মাঝে নকশাল আমলে কিছু দিন না কি বন্ধ ছিল। সেটা অবশ্য আমার জন্মেরও আগে। নকশালরা না কি এক দিন ভোরবেলায় রিকশা আটকে বাবার বুকে পিস্তল ঠেকিয়েছিল। বাবা কোনও রকমে বাড়ি ফিরে আসে। মায়ের মুখে শুনেছি, সেই সময় বাবা রোজ ভারীদের দিয়ে চার-পাঁচ ঘড়া জল আনাত গঙ্গা থেকে। গঙ্গাজল দিয়ে বাড়িতেই স্নান সেরে নিত।

—অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছিস রে টুম্পাই?

মায়ের গলা। শুনে ঘরের ভেতর ঢুকে এলাম। এই সকালেই মায়ের স্নান

সারা হয়ে গেছে। তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল মুছতে মুছতে মা কখন নিচে থেকে উঠে এসেছে, টেরই পাইনি। মায়ের মুখটা যেন বড় একটা চাঁপা ফুল। খুব সুন্দর লাগছে মাকে। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মা হাসি মুখে বলল— কী দেখছিস অত হাঁ করে?

—তোমাকে।

—মায়ের সঙ্গে ফাজলামি? দাঁড়া তোর ব্যবস্থা আমি করছি। আগে চাঁদপানা একটা বউ নিয়ে আসি। তখন দেখব, মায়ের দিকে তাকাস কি না।

—উফ মা, আবার সেই এক কথা।

—এক কথা কী রে? কাল কি হয়েছে তুই জানিস?

—কী গো?

—কাল রাতে তোর বাবা দোকান থেকে ফিরে একেবারে গুম। খেতে বসে কোনও কথা নেই মুখে। আমি ভাবি, হল কী। দোকানে কোনও গোলমাল না কি। বউমাকে বললাম, পাত্তা লাগাও। দেখো তো, শ্বশুরের মুখ এত ভার কেন? তা, বউমা পারে বটে। রাতে তোর বাবার পায়ে তেল মালিশ করতে করতে পেট থেকে কথা বের করে ফেলেছে।

—কী কথা?

—এ মাসেই তোর বিয়ে দেবে। কাল তোর সঙ্গে পটেলভাইয়ের মেয়েটাকে দেখার পর থেকে তোর বাবার মাথা ঘুরে গেছে। কী ভেবেছে কে জানে?

—থাক মা, আমি আর শুনতে চাই না। অন্য কোনও কথা থাকে তো বলো।

—মেয়েটা কিন্তু খুব সুন্দর... না রে টুম্পাই? কাল কত ক্ষণ গল্প করল আমার সঙ্গে। মেয়ে যেতেই চাইছিল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কথা জানতে চায়। তোর বউদির তো খুব ভাল লেগেছে দীপাকে। হ্যাঁরে টুম্পাই, ওরা কী জাত রে?

বাবার কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল। মায়ের প্রশ্নটা শুনে এ বার হাসি পেল।

বললাম— বলতে পারব না। তবে আমাদের মতো বেনে না।

—তুই আমায় অত মুখখু ভাবিস কেন রে? সে তো আমি জানি। ওরা কি ব্রাহ্মণ?

—বলতে পারব না। ওরা গুজরাতি। কিন্তু ওরা ব্রাহ্মণ কি না, জেনে তোমার লাভ?

—কাল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গেল কি না। তাই জিজ্ঞেস করছি। বামুনের মেয়ে যদি আমার পায়ে হাত দেয়, তা হলে তো আমাকে মহাপাতক হতে হবে রে। হ্যাঁরে। কাল ওকে একটা বেনারসি শাড়ি প্রেজেন্ট করেছি। আগ্রহ দেখিয়ে

নিয়ে তো গেল। বাড়ির কাজের মেয়েদের দিয়ে দেবে না তো? শুনেছি, ওরা না কি ভীষণ বড়লোক?

—ঠিকই শুনেছ। যে শাড়িটা ওকে দিয়েছ, সেটা তো তুঁতে রঙের।

শুনে মায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তুই জানলি কেমন করে? পরেছিল না কি?

—হ্যাঁ। রাতে রেস্টুরেন্টে ডিনার করার সময়। তখন ও-ই আমায় বলল, তোমার মা এই শাড়িটা আমায় প্রেজেন্ট করেছে। তোমার মা আর বউদিকে আমার কী দেওয়া উচিত, বলো তো?

—তুই কী বললি?

—কী বলব? বললাম, তোমার যা ভাল লাগে দেবে।

—হ্যাঁ রে টুম্পাই, আমাকে এক বার বোম্বাই নিয়ে যাবি? মেয়েটা যাওয়ার আগে বার বার আমায় বলে গেল। কিন্তু আমায় নিয়ে যাবে কে? সে কপাল করে কি আমি এসেছি? পুরীর জগন্নাথ মন্দির দেখার এত শখ আমার। সেখানেই যাওয়া হল না। তো, বোম্বাই। সে তো আরও দূর। তোর দাদু এক বার নিয়ে যাচ্ছিল পুরীতে। টিকিট ফিকিট সব কাটা। তোর বাবা আমায় যেতে দিল না। এমন হিংসুটে।

—তুমি মুম্বই কী করে যাবে মা?

—কেন রে?

—তুমি ট্রেনে যাবে? তোমার সব ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে না?;

—ফের ফাজলামি? আমি কি অত ছুঁচিবাই না কি? একটা রাত্তিরের তো ব্যাপার! সে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নিতাম।

—তা হলে চলো। আমি তোমায় নিয়ে যাব। কবে যাবে বলো।

—তা হয় না কি? তোর তো উঠল বাই, তো কটক যাই। হুট করে যাওয়া যায়? বউমার শরীরের এই অবস্থা। ফেলে যাই কী করে? জগন্নাথ দেব না টানলে তীর্থ হয় না, বুঝলি বাবা। যাই নিচে যাই। অনেক কাজ পড়ে আছে। আজ আবার ঝুলন পূর্ণিমা। এক বার ঠাকুরবাড়িতে যেতে হবে। তুই কখন বেরোবি?

—যেমন বেরোই। তার আগে এক বার টোটাদের বাড়ি ঘুরে আসব। মা দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গেছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল— টোটার সঙ্গে তোর কি ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছে?

অবাক হয়ে বললাম— না তো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে?

—না, ছেলেটা বেশ কয়েক দিন আমাদের বাড়িতে আসছে না। তাই জিজ্ঞেস

করছি। এমন তো কখনও হয় না। ওকে এক বার আসতে বলিস তো বাবা। একটু দরকার আছে।

পনেরো

কথাগুলো বলেই মা নিচে নেমে গেল। তখন মনে হল, সত্যিই তো, টৌটা প্রায় এক সপ্তাহ আমাদের বাড়িতে আসেনি। ঠিক মায়ের চোখে পড়েছে। কী হল টৌটার? ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল, আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর পরের দিন। সে দিন অনেক ক্ষণ গল্প করেছিল আমার সঙ্গে। মাসিমার হিরের আংটিটা শোধন করে ও পরেছিল। সেটা জানানোর জন্যই এসেছিল আমার কাছে। ওকে শেষ বার দেখি, পোস্তায়, পরশু রাতে।

একটা ট্রাকের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও কথা বলছিল বুলবুলের সঙ্গে। এত তাড়াতাড়ি বুলবুলের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাই বা হল কী করে, আমি ভেবে কূল পেলাম না। নাঃ, আজই এক বার ওদের বাড়িতে যেতে হবে।

সময় কাটানোর জন্য টিভি খুলে বসলাম। চ্যানেল সার্ফ করতে করতে হঠাৎ দেখি, হিরে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। বিবিসি চ্যানেলে। হিরে নিয়ে কোনও লেখা কোথাও চোখে পড়লে সঙ্গেসঙ্গে তা পড়ে ফেলি। আমার বহু দিনের অভ্যেস। টিভির খবরটা তাই মন দিয়ে দেখতে লাগলাম। অ্যান্টোয়ার্প শহরে ডায়মন্ড ডিস্ট্রিক্টসে বিশাল চুরি হয়েছে। বেশ কয়েক দিন আগে। তারই ফলো আপ খবর। প্রায় এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের হিরে নিয়ে চোররা পালিয়েছে। এখনও কেউ ধরা পড়েনি।

শুনেই আমার মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। পাঁচশো কোটি টাকার হিরে! ভাবা যায়? কী করে চুরিটা হল? অ্যান্টোয়ার্প শহরের কথা আমি জানি। পটেলভাইয়ের মুখে কালই শুনছিলাম। আমাদের সুরাতের মতো ওখানেও হিরে কাটা ও পালিশের কারখানা আছে। সে রকমই একটা কারখানার একশো পঁয়তাল্লিশটা ভল্টের মধ্যে একশো তেইশটা ভল্ট খালি করে দিয়েছে চোরেরা। কয়েক হাজার হিরের টুকরো নিয়ে তারা পালিয়েছে। সিকিউরিটির লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে এত হিরে কী করে চুরি হল, পুলিশ বুঝতেই পারছে না। ডি'বিয়ার্স কোম্পানি ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছে।

অ্যান্টোয়ার্প শহরে এখন না কি মারাত্মক হইচই। এক্স রে গেট ফাঁকি দিয়ে, ম্যাগনেটিক অ্যালার্ম এড়িয়ে চোর ওই বাড়িতে ঢুকল কী ভাবে? তার চেয়েও বড় কথা, ভল্ট খোলার নম্বরই বা জানল কী করে? এত বড় চুরি কারখানার লোকজনের সাহায্য ছাড়া সম্ভবই না। খবরে বলল, সন্দেহ করা হচ্ছে ওই বাড়িতেই বছর দুয়েক আগে খোলা অন্য একটা অফিসের দুই মহিলা ও এক পুরুষকর্মীকে। তাদের খোঁজ

চলছে। তার মানে দু'বছর আগে থেকে প্ল্যান চলছিল, হিরে চুরির। ইন্টারপোলের এক পুলিশকে বলতে শুনলাম, যে হিরে চুরি হয়েছে, তার বেশির ভাগই সুপারক্লাস ক্যাটাগরির।

সঙ্গেসঙ্গে মনে হল, অ্যান্টোয়ার্পের মতো জায়গায় অত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও যদি চুরি হয়ে যায়, তা হলে তো আমাদের শোরুমে যে-কোনও দিন হতে পারে; শো রুমে কয়েকটা মাত্র লুকোনো ক্যামেরা আছে। একটা এক্স রে মেশিন বসাতে বলেছিলাম বাবাকে। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল তখন। আমাদের এক একটা শোরুমে দু' থেকে আড়াই কোটি টাকার হিরে থাকে ভল্টে। সে সব যদি গায়েব হয়ে যায়, তা হলে আর ব্যাবসা করে খেতে হবে না। আমি মাঝেমধ্যে ওয়েবসাইটগুলো দেখি। তাই কিছুটা জানি, হিরে ব্যবসায় কত রকমের অপরাধ হয়। কেউ যদি হিরে কিনতে এসে, হিরে দেখার ফাঁকে আচমকা একটা টুকরো মুখে পুরে গিলে ফেলে, সে হাসতে হাসতে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে। গেটে এক্স রে মেশিন থাকলে কিন্তু সে ধরা পড়ে যেত।

অ্যান্টোয়ার্পে চুরির ঘটনাটা আমার খুব কৌতূহল বাড়িয়ে দিল। নাঃ রোজ এই চুরির খবরটা শুনতেই হবে। কোথায় গেল শেষ পর্যন্ত এত টাকার হিরে? এক আধ জনের কাজ এটা হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পিছনে বড় দল আছে। আমাদের এখানকার কাগজে হিরে চুরির কোনও খবর তেমন লক্ষ করিনি। কিন্তু বিবিসি খবরে দেখলাম, ইউরোপের প্রত্যেকটা কাগজে বড় বড় করে এই চাঞ্চল্যকর খবরটা বেরচ্ছে। আরও একটা ইন্টারেস্টিং খবর দেখলাম, হলিউড থেকে না কি পাঁচ-ছ'টা ফিল্ম কোম্পানির লোকজন অ্যান্টোয়ার্পে পৌঁছে গেছে, এই চুরির গল্প সংগ্রহ করতে। তারা ছবি বানাতে চায়।

হিরে চুরির খবর নিয়ে এত মশগুল হয়েছিলাম, টেরই পাইনি আটটা বেজে গেছে। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই লাফিয়ে উঠে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিলাম। ন'টা-সোয়া ন'টার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরে আসতেই হবে। সাড়ে দশটার মধ্যে আবার পৌঁছতে হবে তাজ হোটেলে। দীপাকে নিয়ে যাওয়ার কথা কালীঘাটের মন্দিরে। তার পর সেখান থেকে আসব আমাদের এ দিকে। কুমারটুলিতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে দীপার। কার মুখে যেন ও শুনেছে, কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়া হয়। ওকে এক বার বলেছিলাম মূর্তি গড়ার কাজ দেখতে হলে ওকে আসতে হবে সেপ্টেম্বর মাসে। ঠিক দুর্গাপুজোর আগে। ও শুনতেই চাইল না। কলকাতায় বাঙালির যা কিছু একেবারে নিজস্ব, সেটা ও দেখতে চায়। ওর কোনও আগ্রহ নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রাম লাইনের পাশ দিয়ে নতুনবাজারের দিকে এগোনোর সময় লক্ষ করলাম, বাবা স্নান সেরে ফিরল। ভাগ্যিস এক মিনিট দেরিতে বেরোইনি।

তা হলে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত। দূরে কোথাও মাইকে গান হচ্ছে। নতুনবাজারের পাশে ছোট্ট মন্দিরে ঝুলন উৎসব। আজকাল কোনও একটা অকেশন হলেই হল। হই-চই বেধে যায়। হাঁটতে হাঁটতে মন্দির পেরিয়ে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকলাম। পশ্চিম দিকে সোজা রাস্তায় এগোলেই পাথুরেঘাটা। টোটাদের বাড়ির একটু আগে একটা মিষ্টির দোকান আছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফুলকপির সিঙাড়া ভাজার গন্ধ নাকে এল। আগে টোটা আর আমি বিকেলের দিকে মাঝেমধ্যে নোনতা কচুরি আর সিঙাড়া খেতাম। ক্যারাটে শুরু করার পর থেকে আর বাইরের খাবার খাই না।

এই দোকানটায় নন্দু বলে একটা বাচ্চা ছেলে কাজ করত। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, ছেলেটা নেই। অনেক দিন লক্ষ করিনি। হয়তো কাজ ছেড়ে অন্য কোথাও সে চলে গেছে। ছেলেটার কথা মনে আছে একটা কারণে। এক বার সিঙাড়া খেতে এসে কাউন্টারের ওপর পার্সটা ফেলে রেখে আমরা চলে এসেছিলাম। আমার সেই পার্সে গোটা তিরিশ টাকার মতো ছিল। টোটার বাড়িতে চলে আসার পর হঠাৎ খেয়াল হয়ে ছিল, হিপ পকেটে পার্সটা নেই। টোটাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানের দিকে আসার সময় দেখি, নন্দু দৌড়তে দৌড়তে আমাদের দিকে আসছে পার্স ফেরত দেওয়ার জন্য। ছেলেটার সততা দেখে সে দিন খুব ভাল লেগেছিল। তার পর থেকে প্রায়ই ওকে আমি টিপস দিতাম।

তাজ হোটেলে পৌঁছতেই দীপা বলল—আজ আর বাইরে বেরোচ্ছি না, কুন্তলদা। প্রচণ্ড গরম। চলো, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বসে দুজনে মিলে লাঞ্চটা সেরে ফেলি।

টোটাদের বাড়ি থেকে ফেরার পর মনটা এত খারাপ ছিল, আজ কিছু না খেয়েই বেরিয়ে আসছিলাম। ঠিক বেরনোর সময় একটা প্লেটে করে বউদি দুটো সন্দেশ এনে দিল। না করতে পারলাম না। এখন প্রায় একটা। মারাত্মক খিদে পেয়েছে। দীপাকে তাই বললাম— তোমার সঙ্গে যেতে পারি। কিন্তু বিল মেটাব আমি।

দীপা হেসে বলল— মাথা খারাপ? তোমার পটেলভাই তা হলে আমায় আস্ত রাখবে না। আফটার অল, তুমি ওঁর গডব্রাদার। তোমাকে সেবা করা আমার কর্তব্য। কিন্তু তার আগে দাঁড়াও, একটা জিনিস এনশিওর করি, রেস্টুরেন্টে জায়গা আছে কি না। এই সময় এত ভিড় হয়, প্রথম দিন এসে কোনও খালি টেবিল পাইনি। আমাদের প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল লাউঞ্জে।

দীপার পরনে টাইট জিনস, হালকা আকাশি রঙের টপ। একেবারে অন্য রকম লাগছে ওকে দেখতে। গায়ের রংটা মাখনের মতো বলে এই মুহূর্তে ওকে বিদেশিনী বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়।

হামিদ ফোন করে ডাকল— জরুরি দরকার। পুরোনো ইট কেনার জন্য লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে। না গেলে চলবে না।

এলগিন রোড ঘুরে আসার জন্যই এত দেরি হয়ে গেল। তবে তাতে আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। আমার অ্যাটাচি কেসে-ও এখন ইট বিক্রির কড়কড়ে সত্তর হাজার টাকা। আর সে জন্যই দীপাকে ভরসা করে বলতে পারলাম, লাঞ্চের বিলটা আমিই দেব। সত্যি, হাতে টাকা থাকলে মানুষের আত্মবিশ্বাস কত বেড়ে যায়! আজকের আমিই তার প্রমাণ।

দীপা সোফা থেকে উঠে ফোনের কাছে গেল। আমি ঘরের চারদিকে নজর বোলাতে শুরু করলাম। কাল রাতে ডিনারের সময় পটেলভাইয়ের মুখে শুনেছিলাম, এটাই না কি তাজ হোটেলের সেরা সুইট। দিনে ভাড়া দশ হাজার টাকার মতো। শুনে আমি একটুও অবাক হইনি। এই সব সুইটে পটেলভাইয়ের মতো ধনীরাই থাকতে পারেন। কপাল করে এসেছিলেন ভদ্রলোক। ওঁর হরোস্কোপে দেখেছি, ছোটবেলাটা খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন। যা করেছেন নিজের চেষ্টায়। তবে এত ধন সম্পত্তি উনি কিন্তু কিছুই রাখতে পারবেন না। ওঁর জীবনবৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে ফের অতি সাধারণ অবস্থায় পৌঁছে। আর আটমাস পরেই উনি সেটা বুঝতে পারবেন।

আমি জানি, তবুও ওঁকে কিছু বলিনি। কেন-না, বলা আমার উচিত নয়। উনি কোনও দিন জানতেও চাননি। জ্যোতিষচর্চা করতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ করেছি, সমাজে খুব সফল মানুষরা দূর ভবিষ্যতের কথা বিশেষ জানতেও চান না। মানে, শেষ জীবনের কথা। এটা জানতে চান, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা। দেখুন তো, শেষ জীবন কষ্টে কাটবে কি না। ছেলেমেয়ের হাতে অপদস্থ হতে হবে কি না। এই ধরনের লোকেদের খুব আত্মবিশ্বাসের অভাব। আর অভাব হবে নাই বা কেন? সংসারের দায়িত্ব পালন করতে করতে তাঁরা যে শেষ জীবনের জন্য কিছুই রাখতে পারেন না।

ফোন ছেড়ে উঠে আসতে আসতে দীপা আমায় বলল— যা ভেবেছিলাম তাই। নিচে কোনও রেস্টুরেন্টে জায়গা নেই। তানিশ্‌ক কোম্পানির ডায়মন্ড একজিবিশন চলছে। দলে দলে লোক আসছে। বললাম— তা হলে? চলো বাইরে যাই।

দীপা বলল— কোনও দরকার নেই। রুম সার্ভিসকে বলে দিয়েছি। এখুনি খাবার দিয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে বসে রিল্যাক্স করে খাব।

—তার মানে?

—মানেটা এখুনি বুঝতে পারবে। বলেই দীপা পাশের কামরায় ঢুকে গেল। মিনিটখানেক পরই মহিলা কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে এল। 'ভরা থাক, ভরা থাক,

স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি/মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিও আনি।' লালির মুখে এই গানটা দু'তিনবার শুনেছি। গত বছরই পঁচিশে বৈশাখের দিন বউদির ঘরে সন্ধেবেলায় ও যখন গাইছিল, তখন কী একটা কারণে যেন আমি ঘরে ঢুকেছিলাম। চট করে সে দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

লালির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ই হাসিমুখে ঘরে ঢুকে দীপা সোফায় বসে বলল— গানটা কার, বলো তো, কুন্তলদা?

মুশকিল। আন্দাজে ঢিল— সুচিত্রা মিত্র?

— না। সুমিত্রা সেন। আজ সকালেই হোটেলের ম্যানেজার আমাকে এই সিডি-টা প্রেজেন্ট করে গেলেন। আচ্ছা, এখানে মিউজিক ওয়ার্ল্ডে না কি টেগোর সঙের সিডি পাওয়া যায়? আমাকে নিয়ে যাবে?

মিউজিক ওয়ার্ল্ডে আমি কোনও দিন যাইনি। শুনেছি, না কি পার্ক স্ট্রিটে। কারও কাছে জিজ্ঞেস করে নিলেই চলবে। লালিই বলে দিতে পারে। ওকে ফোন করে জেনে নিলে হবে। বললাম— আজ যাবে?

—গেলেই হয়। বিকেলের দিকে, রোদ পড়ে গেলে। তুমি একটু জেনে নিতে পারবে, হিন্দিতে এই গানগুলো কেউ গেয়েছেন কি না? মুম্বইয়ে আশা ভোঁসলের ক্যাসেটটা আমি কিনেছিলাম। আমার এক বন্ধু রঙ্গিতা, টেগোরের গান শুনবে বলে চেয়ে নিয়ে গেল, আর ফেরতই দিল না।

—মুম্বইয়ে তোমার বুঝি অনেক বন্ধু?

—তা আছে। তবে ছেলেবন্ধুর সংখ্যা বেশি। যাক গে। আমার কথার উত্তরটা কিন্তু তুমি দাওনি।

—কোনটা বলো তো?

—ওই যে জিজ্ঞেস করলাম, হিন্দিতে টেগোরের গান কেউ গেয়েছেন কি না? আমাকে একজন বলেছিল, সেন বলে একজন গেয়েছেন।

—ইন্দ্রাণী সেন?

—ইয়েস। ওঁর সিডি এ বার কিনে নিয়ে যাব। আর একটা ব্যাপারেও তোমার সাহায্য চাই।

—বলো।

—গুরুদেবের গল্প উপন্যাস নিয়ে ক'টা সিনেমা হয়েছে তুমি জানো? হিন্দিগুলো আমি জানি। বাংলায় কটা হয়েছে, সেটা জানতে চাই।

সিনেমা সম্পর্কে আমার কোনও দিনই আগ্রহ ছিল না। এখনও নেই। বললাম— ঠিক জানি না। তবে জেনে বলে দিতে পারি। হঠাৎ জানতে চাইছই বা কেন?

—আরে... মুম্বইয়ে আমার একটা অর্গানাইজেশন আছে, কাল তোমায় বলেছি। তার তরফে ডিসেম্বর মাসে আমরা টেগোর ফেস্টিভ্যাল করতে চাই। সাত দিনে সাতটা সিনেমা দেখাব গুরুদেবের। কোথায় যেন পড়েছিলাম, গুরুদেব নিজেও না কি কোনও একটা সিনেমায় অ্যাক্টিং করেছিলেন। সেই প্রিন্টটা যদি পাই আমি কিনে নিয়ে যাব। যত টাকা লাগুক, দেব। তুমি ব্যবস্থা করে দেবে কুন্তলদা?

রবীন্দ্রনাথ যে কোনও সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন, তাই আমি কোনও দিন শুনিনি। এই প্রথম আজ শুনলাম। সেই সিনেমার প্রিন্ট কার কাছে পাওয়া যেতে পারে, তাও জানি না। দীপার উজ্জ্বল মুখটার দিকে তাকিয়ে ওকে হতাশ করতে ইচ্ছে করল না। অভয় দিয়ে বললাম— চেষ্টা করা যাবে। তুমি আছ তো এখন কয়েকদিন। দেখি লোকজনের সঙ্গে কথা বলে।

এই সময় দীপা দুম করে বলে বসল— কে বলল আমরা কয়েকদিন আছি? ড্যাডিকে তুমি চেনো না। আজ রাতেই হয়তো কাঠমান্ডু থেকে ফিরে এসে বলতে পারে, এখুনি মুম্বই ফিরে যেতে হবে।

—হতেই পারে। ব্যস্ত মানুষ।

উত্তরে দীপা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে দরজায় টোকা। আমি আগে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। রুম সার্ভিসের দুজন লোক। ট্রলি করে খাবার নিয়ে এসেছে। মাই গড! এত খাবার কে খাবে? বাইরের খাবার আমি খাই না। চাইনিজ বলেই খাচ্ছি। পেটের কোনও গণ্ডগোল হয় না। লোক দুটোকে ভেতরে আসতে দিয়ে ফের আমি বসে পড়লাম সোফায়। দীপা উঠে গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল।

পাশের ঘরে একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে যাচ্ছে। একটু পরে আমরা দুজনই গান শুনতে শুনতে চুপচাপ খেতে লাগলাম। পুরুষকণ্ঠে গান হচ্ছে, 'বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে নাও/ ফিরায়ো না, জননী...।' কার গলা জানি না। এই প্রথম খুব খারাপ লাগল। আমাদের এত কাছে ঠাকুরবাড়ি, অথচ রবীন্দ্রনাথের কিছুই বলতে গেলে আমি জানি না। নাহ্, দীপার কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল।

গানটা শেষ হওয়ার পর খাওয়া থামিয়ে হঠাৎ দীপা বলল— কুন্তলদা, বিশ্বাস করে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি?

—বলো।

—ড্যাডি তোমাকে খুব বিশ্বাস করে জানি। কথাটা সে জন্যই তোমাকে বলছি। ড্যাডির হরোস্কোপে কি এমন কিছু আছে, তাতে বোঝা যায় ইন ফিউচার ড্যাডি খুব বিপদে পড়তে পারে?

চমকে দীপার দিকে তাকালাম। কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে তার পর বললাম— এ কথা বলছ কেন?

—ড্যাডি না... একটা ভিশিয়াস সার্কলের মধ্যে পড়ে গেছে। আমি আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু আমি বারণ করলেও শুনবে না।

—ভিশিয়াস সার্কল?

—হ্যাঁ। আননেসেসারি ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে ড্যাডি মুম্বইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডের অনেক লোকজনকে চটিয়ে ফেলেছে। রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য একদল লোক মুখিয়ে আছে। তুমি একটা উপকার করবে আমার? ড্যাডিকে তুমি বলতে পারবে, হরোস্কোপে লেখা আছে, ইলেকশনে নামলে আপনার ভাল হবে না।

—তুমি অনেক লেট করে ফেলেছ, দীপা।

—কেন?

—পটেলভাই অনেক দিন আগেই আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইলেকশনে নামবেন কি না।

—তুমি কী বলেছ?

—কনটেস্ট করতে বলেছি। কেন-না, উনি জিতবেন।

—তুমি শিওর?

—মোর দ্যান শিওর।

মুখটা ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠল দীপার। ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বলল— ড্যাডি তোমার অ্যাস্ট্রোলজির খুব প্রশংসা করে। তোমার ভবিষ্যদ্ববাণী না কি মিলে যায়। আমার হরোস্কোপটা তুমি দেখবে, কুন্তলদা?

—সঙ্গে এনেছ না কি?

—না। মুম্বইয়ে আছে। তোমাকে যদি আমার বার্থটাইম আর ডেটটা দিই, তা হলে?

—দেখে দিতে পারি। ঠিক কী জানতে চাও, বলো?

—তিনটে জিনিস।

—কবে বিয়ে হবে, কার সঙ্গে হবে, দাম্পত্য জীবন সুখের হবে কি না? এ সব আমি হরোস্কোপ না দেখেই বলে দিতে পারি।

—অসম্ভব। তা বলা যায় না কি?

—চেষ্টা করে দেখব?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলে দীপা—বলো তো। দেখি কেমন ক্ষমতা!

খাওয়া থামিয়ে এ বার খুব ভালো করে দেখতে লাগলাম দীপাকে। মানুষের মুখ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিতে পারতেন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য। এই একটা অসাধারণ

ক্ষমতা ছিল ভদ্রলোকের। অনেক সময় খুঁটিয়ে আমি জানতে চাইতাম। তাই মাঝেমধ্যে উনি আমার কৌতূহল মেটাতেন। এ ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা ঝুঁকির। আগে কখনও চেষ্টা করিনি। কিন্তু দীপা চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দেওয়ায় আমার জেদ চেপে গেল। ওর মুখটা খুঁটিয়ে দেখে আমি চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড ভাবতে থাকলাম। এই সময়টায় আমি যা বলি, ভেতর থেকে কে যেন তা বলিয়ে নেয়। আর সেটা অভ্রান্ত মিলেও যায়। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে দীপাকে বললাম— সাতাশ বছর বয়সে তোমার বিয়ে হওয়া উচিত। এখন ঠিক কত?

—ছাব্বিশ বছর আট মাস।

—তা হলে ডিসেম্বরের মধ্যেই... তৈরি থাকো।

খিলখিল করে হেসে উঠল দীপা। তার পর বলল—আমার হাজবেন্ড লোকটা কেমন হবে, এ বার বলো তো?

—ভেরি হ্যান্ডসাম। লম্বা হবে, ফর্সা। সে কোনও বিশেষ একটু গুণের অধিকারী হবে। বিয়ের মাত্র চার-পাঁচ মাস আগে সে তোমার জীবনে আসবে। বিয়ের সিদ্ধান্তটা তুমি হঠাৎই নেবে। প্রস্তাবটা যাবে তোমার দিক থেকে। তোমার ড্যাডি আপত্তি করবেন না। কিন্তু প্রবল বিরোধিতা হবে তোমার ইন ল'জ-দের দিক থেকে। তাঁরা অদ্ভুত কারণে তোমাকে মেনে নেবেন না।

শুনতে শুনতে মুখের রং বদলাচ্ছে দীপার। সেটা স্পষ্ট লক্ষ করলাম। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল—সেই ছেলেটি কি আমাদের কমিউনিটির হবে?

—না। বিয়ের পর পূর্বদিকের কোথাও তোমায় থাকতে হবে। মানে... এখন যেখানে আছ, তার পূর্বদিকে।

—তুমি কি কলকাতার কথা বলছ?

—হওয়া অসম্ভব নয়।

—এই কথাগুলো কি তুমি আন্দাজে বলছ কুন্তলদা?

—একেবারেই না। তোমার মুখে লেখা আছে। আমি পড়তে পারছি। বিশ্বাস করা বা না করা এখন তোমার।

—আমার দাম্পত্যজীবনটা কেমন যাবে, তা তো বললে না?

—আজ থেকে আট-দশ মাস পর মারাত্মক একটা ঝড় আসবে তোমার জীবনে। সেটা কনটিনিউ করবে বারো থেকে চোদ্দো মাস। সেই সময়টায় তুমি খুব মানসিক কষ্ট পাবে। সেটা ভোগ করবে তোমার ড্যাডির জন্য। তখন তোমাকে সামলাবে তোমার হাজবেন্ড। বিয়ের প্রথম সাতটা বছর তোমাদের সম্পর্ক বেশ ভাল থাকবে। তার পরের কথা এখন শুনতে চেও না। তখন আমার কাছে এসো।

একটু চুপ করে থেকে কী ভেবে দীপা জিজ্ঞেস করল— আট-দশ মাস পর

ড্যাডি কি খুব বিপদে পড়বে কুন্তলদা?

—সম্ভাবনা আছে। রাহু আর কেতু খুব খারাপ জায়গায় থাকবে তখন। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি, চরম শত্রুতা এমন একটা জায়গায় তোমার ড্যাডিকে নিয়ে যাবে, তখন চোখে উনি অন্ধকার দেখবেন। রাজরোষেও পড়বেন।

—রাজরোষ মানে?

—এখনকার দিনে তো রাজারাজড়ারা নেই। রাজরোষ মানে... পুলিশ বা প্রশাসনের কোপে পড়ে যেতে পারেন। তখন সম্মানহানি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

—এ সব কী বলছ তুমি কুন্তলদা? ড্যাডি জানে?

—না বলিনি। ঠিক সময়ে ওঁকে আমি সাবধান করে দেব।

আর কোনও কথা না বলে দীপা এ বার খাওয়ায় মন দিল। বুঝতেই পারছি, আমার কথা শুনে ওর মন খুব ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। ওর হরোস্কোপটা পেলে আরও নিখুঁত বলতে পারতাম। আজ সন্ধেয় আমার কোনও কাজ নেই। ইচ্ছে করলে দীপার হরোস্কোপটা বানিয়ে নিতে পারি। সেই কারণেই বললাম— তোমার বার্থ টাইম আর ডেটটা আমায় দিতে পারো, দীপা?

—হ্যাঁ। দাঁড়াও, খাওয়ার পর তোমায় লিখে দিচ্ছি।

খাওয়া সেরে দীপা যখন সোফায় এসে বসল, তখন খুব গম্ভীর। দেখে আমার খারাপই লাগল। পটেলভাই সম্পর্কে ওই কথাগুলো ওকে না বললেও পারতাম। বলতাম না। ও অবিশ্বাস করছিল দেখে, বলে ফেললাম। আট মাস পর পটেলভাই সত্যিই খুব গাড্ডায় পড়বেন। সেটা আগে থেকে দীপার জানা থাক। মনটাকে প্রস্তুত রাখতে পারবে। ধনীর দুলালী। কখনও বিপাকে পড়েনি। বাস্তবের মাটিটা যে কতটা রুক্ষ হয়, সেটা আর কিছু দিন পরই ও টের পাবে।

দরজায় ফের টোকা। আমি ওঠার আগেই দীপা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। রুম সার্ভিসের লোক। খাবারের ট্রলিটা নিয়ে যেতে এসেছে। ওরা ট্রলিটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই দীপা সোফায় বসে বলল— ড্যাডির জন্য ইদানীং খুব চিন্তা হচ্ছে কুন্তলদা। তুমি জানো কি না জানি না, লাস্ট ইয়ার ওঁর ওপর একটা অ্যাটেম্পট হয়েছিল। দুবাইয়ে। কপাল জোরে বেঁচে গেছেন।

বললাম—আমি জানি। আমায় বলেছেন। কিন্তু তুমি ভয় পেওনা। তোমাকে একটা ব্যাপারে অ্যাশিওর করতে পারি দীপা। পটেলভাইয়ের প্ল্যানেটারি পজিশন এত ভাল যে, অপঘাতে ওঁর মৃত্যু হবে না। ওঁর ক্ষতি করবেন, ব্যাবসার লোকজন। যাক গে, ওঁর কথা ছাড়ো। এখন কী করবে বলো। তুমি যদি চাও, তা হলে বিকেলের দিকে আমি এক বার আসতে পারি।

—আর একটু বোসো না, কুন্তলদা। তোমার সঙ্গে গল্প করি। তোমার সম্পর্কে

তো আমি কিছুই জানলাম না।

—বলো, কী জানতে চাও?

—তোমার মাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। শি ইজ বিউটিফুল লেডি। আমার যদি এমন একটা মা থাকত, তা হলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। হাউ ওল্ড ইজ শি?

—নিয়ারিং ফিফটি ফাইভ।

—মনেই হয় না। এই বয়সে এত সুন্দর নিজেকে রেখেছেন কী করে?

—মা-কেই জিজ্ঞেস করলে না কেন?

—ফের দেখা হলে নিশ্চয়ই জানতে চাইব। তোমাদের বাড়ি আবার কবে নিয়ে যাবে আমাকে?

—এখনই চলো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব একজনের।

—কে গো?

—লালি। আমার বন্ধুর বোন। তোমার মতোই রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত।

—তোমার গার্লফ্রেন্ড?

—না আমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই।

—ডোন্ট টেল মি দ্যাট। তোমার মতো হ্যান্ডসাম ছেলের কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

—বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ব্যাপার।

—আমার তো ধারণা ছিল, বাঙালি ছেলেদের মতো প্রেমিক হয় না। কুন্তলদা, তুমি কখনও কারও সঙ্গে প্রেম করেছ?

—এখনও সুযোগ হয়নি।

—কেউ তোমাকে প্রেম নিবেদন করেনি?

—এখনও টের পাইনি।

—তুমি তো টিপিক্যাল গুজরাতি ছেলেদের কথা বলছ। টাকা ছাড়া যারা জীবনে আর কিছু বোঝে না। তোমার একটা প্রেডিকশন হয়তো ঠিক হবে। আমি ঠিকই করে রেখেছি, আর যাকেই বিয়ে করি, কোনও গুজরাতি ছেলেকে করব না।

—আমার বাকি দুটো প্রেডিকশনও ঠিক হবে।

PATHAGAR

—এই শক্তিটা তুমি পেলে কী করে?

—সে একটা লম্বা কাহিনি। শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে না।

—বলেই দেখো।

দীপার সঙ্গে গল্পে মেতে গেলাম। বারো বছর আগে দেখা হওয়া সেই সাধুর কথা বললাম। সেই ব্রত পালনের কথাও। টোটা আর আমার— চিরকুমার থাকার

শপথ নেওয়ার কথা বলার সময় দীপার চোখে কৌতুকের ঝিলিক। আজ পর্যন্ত কোনও দিন একান্তে অনাত্মীয় কোনও মেয়ের সঙ্গে গল্প করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এত কথাও কারও সঙ্গে বলিনি। এমন কি, লালির সঙ্গেও না। দীপাই প্রথম। ওর আগ্রহ দেখে আমার খুব ভাল লাগতে শুরু করল।

আমি চুপ করার পর দীপা প্রশ্ন করল— সত্যি বলছ, তুমি গত বারো বছর একটাও মিথ্যে কথা বলোনি? আশ্চর্য। ড্যাডি তোমার সম্পর্কে তা হলে ঠিকই বলত।

—কী বলত আমার সম্পর্কে?

—ওই একটা মাত্র ছেলে আছে, চোখ বুজে যার হাতে আমার পুরো বিজনেসটা তুলে দেওয়া যায়। ড্যাডি কাল রাতে আমাকে আরও কী বলছিল জানো? কুন্তলকে যদি এক বার আমি মুম্বই নিয়ে যেতে পারি, তা হলে আর ফিরতে দেব না। তুই ওকে বুঝিয়ে বল, যাতে আমাদের সঙ্গেই ও মুম্বই যেতে রাজি হয়। চলো না আমাদের সঙ্গে। তুমি তো বলেছিলে, মুম্বইয়ে যাবে।

—যাব। তবে জানুয়ারির আগে সম্ভব না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব, দীপা? কিছু মনে করবে না বলো।

—অবশ্যই না। তুমি এত সংকোচ করছ কেন?

—পটেলভাইয়ের বিজনেস ভল্যুমটা ঠিক কত বড়?

—আমিও ঠিক জানি না। আন্দাজে বলতে পারি, পাঁচ-ছয় হাজার কোটি টাকার কম নয়। হিরের বিজনেস ছাড়াও ড্যাডির আরও চারটে কোম্পানি আছে। আমি তার ওয়ান অব দ্য ডিরেক্টর্স। রিসেন্টলি ড্যাডি ফিল্ম প্রোডাকশনেও নেমেছে। তবে নিজের নামে নয়। তাতেও দু'তিনশো কোটি টাকা খাটছে।

—এত বড় সাম্রাজ্য উনি চালান কী করে?

—সেটা না হয় ড্যাডিকেই জিজ্ঞেস কোরো। আর তুমি যদি মুম্বই যাও, তা হলে নিজের চোখেই দেখতে পাবে। ড্যাডির লাইফটা রূপকথার মতো। ছোটবেলায় খাবার জুটত না। সুরাতে একটা হিরে পলিশিংয়ের কারখানায় একশো টাকার মাইনের চাকরিতে ঢুকেছিল। সেই অবস্থা থেকে আজ কোথায় পৌঁছেছে। জানো, ড্যাডির লাইফ নিয়ে একটা ফিল্মও হয়েছে।

—তোমার মায়ের কথা কিন্তু উনি কোনও দিন আমায় বলেননি। যদিও আমি জানি, ওঁর কী হয়েছিল।

—কী জানো বলো।

—উনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

দীপা চমকে উঠে বলল— তুমি জানলে কী করে?

—ভেরি সিম্পল। পটেলভাইয়ের হরোস্কোপে তার ইন্ডিকেশন আছে।

—নাহ, তোমাকে এ বার থেকে বিশ্বাস করতেই হচ্ছে আমাকে। তোমরা অ্যাস্ট্রোলজাররা তো দেখছি ডেঞ্জারাস মানুষ। খুন করেও মনে হয়, তোমাদের হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। তুমি ঠিকই বলেছ। মা সুইসাইড করেছিলেন। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। তবুও আমার মনে আছে।

— তার পর পটেলভাই আর বিয়ে করলেন না কেন?

— আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। তবে ড্যাডির বেশ কয়েকজন গার্লফ্রেন্ড আছে। যখন যে দেশে যায়, সেখানে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকে। মিস দুম বলে যে ভদ্রমহিলাকে কাল ব্রেকফাস্ট টেবলে তুমি দেখেছ, সে ড্যাডির গার্লফ্রেন্ড।

— তোমার খারাপ লাগে না?

— খারাপ লাগবে কেন? আমাদের সোসাইটিতে এ সব কোনও ব্যাপারই না। ড্যাডির কীই বা এমন বয়স? এই বয়সে একজন মহিলার প্রয়োজন হতেই পারে। তবে ড্যাডির লিগ্যাল ইয়ার একমাত্র আমি। আর কেউ ক্লেম করতে পারবে না। আমি থাকি আমার জগৎ নিয়ে। ড্যাডি ওঁর জগতে। কোনও ক্ল্যাশ নেই।

—মুম্বইয়ে তুমি সারাটা দিন কাটাও কী করে?

—কেন, ব্যাবসাপত্তর দেখি। দিনের প্রথম ভাগটা কেটে যায় ওই কাজ নিয়ে। বিকেলের দিকটা আমার টেগোর ইনস্টিটিউটে দিই। সমাজসেবা করি। তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমি তা হলে আরও অনেক বড় কাজে নামতে পারি। তোমার ভেতর আশ্চর্য কিছু ক্ষমতা আছে। এখানে পড়ে থেকে সেগুলো তুমি নষ্ট কোরো না। মুম্বইয়ে গেলে তুমি কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারবে। এ বারই আমার সঙ্গে মুম্বই চলো। বলো, যাবে?

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সুইচ অন করে কানে দিতেই ও প্রান্তে মায়ের গলা— টুম্পাই, তুই এখন কোথায়?

গলা শুনেই বুকটা আমার কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি বললাম— দীপার কাছে। কেন মা, কী হয়েছে?

—মারাত্মক কাণ্ড। তোর বউদি তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে।

— সে কী! তার পর?

— নৃপেন ডাক্তার এসেছিল। বলল, এখুনি বড় কোনও নার্সিংহোমে নিয়ে যান। না হলে পেটের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারবেন না। তোর দাদা বেলভিউ নার্সিং হোমে নিয়ে গেছে বউমাকে। তুই এখুনি ওখানে চলে যা।

ষোলো

বাড়িতে যখন ঢুকলাম, তখন রাত প্রায় আটটা। আমাকে দেখেই মা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল— কেমন আছে রে বউমা? জ্ঞান ফিরেছে?

বৈঠকখানার সোফাতেই বসে পড়লাম। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, তবুও বললাম— একটু ভাল মা।

— তোর বাবা ফেরেনি?

— দাদার গাড়িতে আছে। এখুনি এসে পড়বে।

উল্টোদিকের সোফায় মা বসে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল— কী পাপ করেছিলুম কে জানে? রাধেশ্যাম জিউ আমাকে এমন শাস্তি দেবেন ভাবতেও পারিনি। বংশের প্রথম সন্তান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে গেল।

—মা, বউদির কথা ভাবো।

—আর কত ভাবব, বল তো? মেয়েটাকে এত করে বলতাম, সিঁড়ি ভাঙাভাঙি কোরো না। সাবধানে হাঁটাহাঁটি কোরো। কে কার কথা শোনে?

—বউদি পড়ে গেল কী করে মা?

—হারামজাদা নন্তুটার জন্য। কার্পেট কেচে আজই ওর ছাদে শুকুতে দেওয়ার দরকার হল। ভিজে কার্পেট নিয়ে ছাদে ওঠার সময় সিঁড়িগুলোয় জল ফেলতে ফেলতে গ্যাছে। বউমা বুঝতে পারেনি। তেতলা থেকে নামার সময়... উফ, পিছলে পড়ার সময় মা বলে একটা চিৎকার করেছিল। ছুটে গিয়ে দেখি রক্তে জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে। ঝুলনের দিন... কেন এ রকম হল বল তো? ঠাকুর কি কোনও কারণে রুষ্ট হলেন?

নন্তু আমাদের কাজের ছেলে। এত বড় বাড়ি, মতি একা সামলাতে পারে না। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার জন্য নন্তুকে কিছু দিন আগে নিয়ে এসেছে মতির মা। ওদের বস্তিতেই থাকে। সকালবেলায় কাজ সেরে ও স্কুলে চলে যায়। ওর দোষে বউদি পিছলে পড়ে গেছে, এই কথাটা যদি বাবার কানে যায়, তা হলে ওকে জুতো পেটা করবে। নন্তুকে বাঁচানোর জন্যই বললাম— মা, অ্যাক্সিডেন্ট কি দিন দেখে হয়? হয়ে গেছে। কী আর করা যাবে!

—হ্যাঁ রে, বউমাকে কি রক্ত দিতে হয়েছে?

—হ্যাঁ, দু'বোতল।

—ডাক্তার কী বলল, তুই শুনেছিস?

—না। দাদা কথা বলেছে। দীপাও। দাদা এলে তুমি শুনে নিও।

দীপার নাম শুনে মা অবাক হয়ে বলল— তোর পটেলভাইয়ের মেয়ে? ও কার সঙ্গে নার্সিংহোমে গেল?

— আমার সঙ্গেই ছিল।

— তোর সঙ্গে... ওকে তোর বাবা দেখেছে?

— দেখেছে। বাবার কথা ওঠায় আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম— কেন, তাতে কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হল, মা? ও নার্সিংহোমে যাওয়ায় আজ তো বউদি বেঁচে গেছে। দাদা এলে শুনে নিও।

—তুই এত দাদা দাদা করছিস কেন রে টুম্পাই? মা রেগে উঠে বলল— তুই নিজে বল না। সারাটা দুপুর বুকে খালি ধুকুর পুকুর। এই বোধহয় খারাপ খবর এল। আর তুইও আমায় এড়িয়ে যাচ্ছিস? নিশ্চয়ই ডাক্তার খারাপ কিছু বলেছে। হ্যাঁ রে, বউমা আবার ফিরে আসবে তো?

বলেই মা কেঁদে উঠল। কান্নাকাটি করা মায়ের একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস। অন্য সময় হলে একটু বিরক্তই হতাম। সকাল থেকেই মনটা এত খারাপ, মায়ের কান্না দেখে আমারই বুকটা হু হু করে উঠল। নার্সিংহোমে বউদিকে মাত্র এক মিনিটের জন্য দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাও কাচের জানলার এ পাশ থেকে। স্যালাইন চলছে। রক্তের বোতলও ঝোলানো বেড-এর পাশে। বউদির মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। দেখে আমার চোখে জল এসে গেছিল। মায়ের প্রশ্নটা যেন বুকে এসে ধাক্কা মারল। সত্যিই, বউদি ফিরে আসবে তো? যেন আসে। না এলে এ বাড়ি শ্মশান হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময়েই বাবা এসে দাঁড়াল বৈঠকখানার দোরগোড়ায়। মাকে কাঁদতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে এক বার আমার দিকে তাকিয়ে তার পর বসে পড়ল সোফার অন্য কোনায়। আর তখনই নজরে এল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিষ্টুকাকা ইশারায় আমাকে বাইরে যেতে বলছে। সিংদরজার কাছে কোনও গাড়ি এসে থামার আওয়াজ পাইনি। বাবা কি তা হলে দাদার গাড়িতে আসেনি? বাবা তো ট্যাক্সিতে ওঠার লোক না? হঠাৎই মনে হল, বউদির বাবা শীলমশাইও এত ক্ষণ নার্সিংহোমে ছিলেন। বাবা হয়তো ওঁর গাড়িতেই ফিরেছে।

উঠে গেলে বাবা কিছু মনে করতে পারে। তাই চোখের ইশারায় বিষ্টুকাকাকে বুঝিয়ে দিলাম, ওপরে যেতে। বাবার সামনে প্রায়ই আমি আর বিষ্টুকাকা চোখে চোখে কথা বলি। অন্য কেউ বুঝতেও পারে না। বিষ্টুকাকার সঙ্গে অনেক দিন আলাদা কোনও কথা হয়নি। নিশ্চয়ই এমন কিছু কথা জমে আছে, এখন তা বলতে চায়। নার্সিংহোমে বলার মতো সুযোগ ছিল না। তখন আমরা সবাই খুব টেনশনে।

কান্না থামিয়ে মা ঘোমটা টেনে দিয়েছে। ঘোমটার আড়াল থেকেই বাবাকে বলল— বউমাকে কবে ছাড়বে, কিছু বলেছে?

প্রশ্নটা শুনে বাবার রেগে ওঠার কথা। কিন্তু বাবা রাগল না। শান্ত গলাতেই বলল— তিন-চার দিনের আগে নয়।

তার মানে বউদির দুর্ঘটনায় বাবার মতো লোকও দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

সারাটা দিন বাবা নার্সিংহোমের লাউঞ্জে বসেছিল। মুখে কোনও কথা নেই। মাঝে ওষুধ কিনতে গিয়ে কিছু ক্ষণ আমি ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি বাবা দীপার সঙ্গে বসে কথা বলছে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে। বলবেই তো। পটেলভাইকে বাবা ভাল মতো জানে। ওঁকে খুশি রাখতে না পারলে বাবার ব্যবসাই চৌপাট হয়ে যাবে।

মা বাবাকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে, কেটে পড়ার এটাই সময়। উঠতে গিয়েও আমি বসে পড়লাম। দেখি, লালি একটা ট্রে-তে করে শরবতের গ্লাস নিয়ে ঢুকছে। লালি এ বাড়িতে? কখন এল? পরনে নীল রঙের সালোয়ার-কামিজ। ওড়নাটা দু'পাশে এমন ভাবে ঝুলছে, ওকে ডানাওয়ালা পরির মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু ওর মুখটা শুকনো শুকনো মনে হল। বউদির জন্য মন খারাপ হতে পারে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলে গেলাম, আজ সকালে ও আমার সঙ্গে ঠান্ডা ব্যবহার করেছে।

বাবার হাতে শরবতের গ্লাস তুলে দিয়ে লালি আমার কাছে এল। ট্রে-টা বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল— শাড়িটা ফেরত দিয়েছিলে বউদিকে?

বললাম— হ্যাঁ।

—বউদি কী বলল তখন?

—একটু অবাক হল।

—ছি ছি। শাড়িটা নিজে এসে দেওয়া উচিত ছিল আমার।

হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস আমি তুলে নেওয়ার পর লালি মায়ের কাছে গেল। বাবার সামনে মাকে কোনও দিন কিছু খেতে দেখিনি। যেমন বাবার সামনে বউদিকে। আমাদের বেনেদের অদ্ভুত সব নিয়ম। জানতাম, মা শরবত খাবে না। লালি তাই পীড়াপীড়িও করল না। ট্রে নিয়ে চলে গেল বিষ্টুকাকার কাছে। তার পর ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সকালে টোটার বাড়িতে যা হয়েছিল, সারাদিন ভুলে ছিলাম। লালিকে সামনে দেখে সব মনে পড়ে গেল। টোটার ঘরে বইয়ের ভেতর থেকে বুলবুলের ছবিটা পাওয়ার পর সত্যিই একটা শক খেয়েছিলাম। টোটার বইয়ে বুলবুলের ছবি! যে ছেলেটা কোনও দিন মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়েও কথা বলত না, সে একটা মেয়ের ছবি লুকিয়ে রেখেছে, বইয়ের ফাঁকে? বিশ্বাস করা কঠিন। ঘরে একা বসে থাকতে থাকতে এক বার মনে হয়েছিল, ছবিটা টোটা নিজে নাও রাখতে পারে। হয়তো লালিই ওর বন্ধুর ছবি কোনও কারণে বইটার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু তাই যদি সত্যি হত, তা হলে বইটা টোটার বালিশের তলায় থাকবে কেন?

বইটা তাড়াতাড়ি আমি ফের বালিশের নিচে রেখে দিয়েছিলাম। নাহ, টোটা জানুক, এটা আমি চাইনি। তা হলে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নষ্টও হয়ে যেতে পারে। কোনও কারণে ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হোক, আমি চাই না। ঘরে বসে বসে

হঠাৎই তখন মনে হয়েছিল, বুলবুলের সঙ্গে যদি টোটার কোনও ভালবাসা হয়ে থাকে, তা হলে আমার কিছু যায়-আসে না। বুলবুলের হরোস্কোপ দেখে তো আমার নিজেরই মনে হয়েছিল, টোটার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হয়, তা হলে আইডিয়াল ম্যাচ হবে। পরে নিজেই একবার কথাটা পরিষ্কার করে জানতে চাইব, টোটার কাছ থেকে, বুলবুলের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ঠিক কী?

টোটার ঘরে বসে অন্য একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। স্বামীজির ওপর লেখা বই। মুক্তানন্দ নামে একজনের। অনেক ক্ষণ পর মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন— এ কী, তুমি বসে আছ? আমি তো ভাবলাম, চলে গেছ।

—টোটা যে আমায় বসতে বলল মাসিমা।

—সে তো অনেক ক্ষণ বেরিয়ে গেছে। কী ছেলে বলো তো? তোমাকে না বলেই চলে গেল?

শুনে খটকা লাগল। কিন্তু মাসিমাকে কিছু বুঝতে দিলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম— হয়তো ভুলে গেছে। আমি চলি।

যাবে? কিন্তু কিছুই তো খেলে না বাবা। ঘরে আম আছে। কেটে দেবো?

—না মাসিমা। এখন ইচ্ছে করছে না। এখনি ভাত খেয়ে বেরোতে হবে।

—তা হলে এসো। আবার এসো কিন্তু।

—আসব মাসিমা।

উঠোন পেরিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছি। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লালি। ওর হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল— এটা বউদিকে দিয়ে দেবে, টুম্পাইদা।

—কী আছে এতে?

—একটা জামদানি শাড়ি। বন্ধুর বিয়েতে গেছিলাম। বউদি আমায় পরতে দিয়েছিল। অনেক দিন আমার কাছে পড়েছিল।

—তুমি নিজেই তো ফেরত দিয়ে আসতে পারতে লালি?

এখন আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া হবে না, টুম্পাইদা। তোমাদের বাড়ি যাওয়ার মুখ আমার নেই।

কেন? হঠাৎ কী হল?

সে অনেক কথা। এখন বলা সম্ভব না। প্লিজ, শাড়িটা তুমি নিয়ে যাও। আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লালি ফের রান্নাঘরে ঢুকে গেছিল। বারো ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই লালি ফের আমাদের বাড়িতে! এত দিনের সম্পর্ক, কখনও পারে এড়িয়ে যেতে? শরবত খেতে খেতেই মনে মনে ঠিক করে নিলাম, আজ যে করেই হোক, জেনে নেব— কী কারণে সকালে ও আমায় বলেছিল,

আমাদের বাড়িতে আসার মুখ আর ওর নেই।

একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল বাবা বলছে— পটেলভাইয়ের মেয়েটা নার্সিংহোমে না গেলে আজ খুব মুশকিল হত, না রে টুম্পাই?

বাবা আমার নাম ধরে কথা বলছে, এটা আমার সৌভাগ্য। কত দিন পর ডাকল, পরে মনে করার চেষ্টা করব। একটা উত্তর দেওয়া দরকার বলেই বললাম— হ্যাঁ।

—শিক্ষিত মেয়ে। চোস্ত ইংরেজি বলছিল কী রকম দেখলি? আমাদের বাঙালির ঘরে এমন মেয়ে পাওয়া কঠিন।

শুনে মনে মনে হাসলাম। এমন মেয়ে পাবে কী করে? তোমার মতো বাবা তো বাঙালির ঘরে ঘরে। বউদির অত ইচ্ছে ছিল, এম. এ. করার। তুমি কিছুতেই পড়তে দিলে না। কী, না... বেনেবাড়ির বউ... অত পড়ার দরকার নেই, দাদাও তখন কিছু বলল না। ভাগ্যিস আমার নিজের বোন নেই। থাকলে তার বিদ্যের দৌড় হত, রামজয় শীল পাঠশালার ক্লাস টেন পর্যন্ত। তার বেশি বাবা তাকে পড়াতই না। পড়াশুনা করানোর জন্য মেয়ের পিছনে যে টাকা লাগে, সেটা অপচয় ছাড়া আর কিছু না। তার চেয়ে ওই টাকা জমিয়ে, বিয়ের সময় মেয়েকে সোনার গয়না দেওয়া অনেক শ্রেয়।

বাবার সামনে মা কখনও বাবার বিরুদ্ধ মত পোষণ করে না। আমার চোখে তা কোনও দিন পড়েনি। দীপার প্রশংসায় মা কী একটা বলতেই বাবা বলে উঠল— ভাগ্যিস মেয়েটাকে নিয়ে গেছিল টুম্পাই। ওকে দেখে নার্সিংহোমের বড় ডাক্তার তো পায়ে পড়ে যায় আর কী! কী খাতির! আমাদের আর ছোটাছুটি করতে হল না। ওরাই ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

দীপার আলোচনা এখন আমাদের বাড়িতে অনেক দিন ধরে চলবে। আমি জানি। নার্সিংহোমে আজ যা হয়েছে, তা খুব স্বাভাবিক। দীপাকে নিয়ে আমি যখন লাউঞ্জে বসে ছিলাম, তখন ওর পরিচিত এক গায়নোকলজিস্টের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ডা. যোশী আগে মুম্বইয়ের যশলোক হসপিটালে ছিলেন। পটেলভাই বোধহয় কোনও সময় ওঁর কোনও উপকার করেছিলেন। দীপাকে দেখে চিনতে পেরে উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওঁর চেম্বারে ডেকে নিয়ে যান। তার পরই হইচই গেলে যায়। নার্সিংহোমের সি ই ও চলে আসেন। বউদির জন্য মেডিকেল বোর্ড বসে যায়। এত খাতির দেখে বাবা তো মুগ্ধ হবেই।

মাকে বাবা বলছে— বউমা ভাল ডাক্তারের হাতেই পড়েছে। চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। এই পর্যন্ত শুনে আমি উঠে পড়লাম। বিষ্টুকাকা ফের ইশারা করছে। বিষ্টুকাকাকে আমি উপরে যেতে ইঙ্গিত করেছিলাম। কিন্তু ওপরে না গিয়ে

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফোয়ারার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে নিলেই হবে। সারাদিন মারাত্মক গরম ছিল। এখন বেশ বাতাস বইছে। ফোয়ারার সামনে দাঁড়ালে তাই বিন্দু বিন্দু জল চোখে মুখে এসে লাগে। ছোটবেলায় খুব ভাল লাগত সেই জলে ভিজতে। সন্ধেবেলায় হাস্নুহানার গন্ধ নিতে এখন সেই ফোয়ারা আছে, আছে হাস্নুহানা। কিন্তু আমার সময় নেই ফোয়ারার কাছে এসে দু'দণ্ড বসার।

সিংদরজার পাশে একটা ছোট্ট ঘর আছে। সেখানে থাকে রামশরণ। ও আমাদের বাড়ির ড্রাইভার। খুব বিশ্বস্ত। মা-বউদিরা কখনও কোথাও গেলে ও নিয়ে যায়। অন্য সময় ওর কাজ, লোহার বড় দরজাটা বন্ধ করা, খুলে দেওয়া। বাগানের পরিচর্যা করা। ইদানীং ফোয়ারা চালু রাখার কাজটাও ওর কাঁধে চেপেছে। বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্রই দেখি, ছোট্ট উনুনে রামশরণ রান্না চাপিয়েছে। দিনেরবেলায় ও আমাদের বাড়িতেই খেয়ে নেয়। রাতে কেন যে নিজে রান্না করে জানি না।

কয়েক সেকেন্ড পর বিষ্টুকাকা এসে বলল—কাল দোকানে কী কাণ্ড হয়ে গেছে, কিছু শুনেছ?

মা সকালে বলেছিল বটে, কাল রাতে দোকান থেকে ফেরার পর বাবার মুখ খুব গম্ভীর ছিল। কিন্তু কী কারণে সেটা জানতে পারেনি। তাই কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞেস করলাম— না তো। কিছুই শুনিনি।

—তোমার দাদাও তোমাকে কিছু বলেনি?

—না। দাদার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। আসলে কাল রাতে পটেলভাই ডিনারের জন্য আমায় আটকে রেখেছিলেন। পৌনে দশটার সময় ফিরেছি। কী হয়েছিল দোকানে?

—ফ্রড। গালে চড় মেরে পৌনে দু'লাখ টাকার গয়না নিয়ে চলে গেছে দু'জন।

—মানে?

—বিকেলের দিকে বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক এলেন মেয়ের বিয়ের গয়না কিনতে। দেখেশুনে ভাল ফ্যামিলিরই মনে হয়েছিল। প্রায় পৌনে দু'লাখ টাকার গয়না পছন্দ করে তোমার বাবাকে উনি বললেন, নগদ টাকা দিয়ে কিনব। আমার কোনও রিসিট চাই না। তা হলে কি দাম কিছু কমাবেন? তোমার বাবা রাজি হয়ে গেলেন।

রিসিট না নিলে ট্যাক্সের টাকাটা বাদ চলে যায়। ফলে গয়নার দাম কিছু কমে। যদিও এটা করা উচিত না। সরকারকে ফাঁকি দেওয়া। তবুও কোনও কোনও সময় কাস্টমারের আবদার মেটাতে আমাদের করতে হয়। বললাম— তার পর?

—টাকা মিটিয়ে তো উনি চলে গেলেন। দোকানে তখন আরও কাস্টমার। দু'জন ভদ্রমহিলাও ছিলেন তাদের মধ্যে। দেখে মনে হচ্ছিল মা আর মেয়ে। ওঁরাও

পৌনে দু'লাখ টাকার ঠিক একই ডিজাইনের গয়না পছন্দ করলেন। তার পরই যা বলতে শুরু করলেন, শুনে আমাদের মাথায় হাত।

বিষ্টুকাকার কথা শুনে আমি আন্দাজ করতে পারলাম, এর পর কী হয়েছিল। তাই বললাম— এর পর ওই দুই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই দাবি করলেন, নগদ টাকায় অলরেডি ওঁরা পেমেন্ট করে দিয়েছেন, তাই না? নোটের নম্বর পর্যন্ত ওঁরা বলে দিতে পারবেন। গয়না না দিলে তখনই পুলিশ ডাকবেন। এবং পুলিশের সামনেই সিন্দুক খুলে ভেরিফাই করবেন, ওঁদের দেওয়া নোটের নম্বর ঠিক কি না?

আমার কথা শুনতে শুনতে বিষ্টুকাকার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। নিজেকে সামলে বলল— তুমি কী করে জানলে?

—জানি। কেন-না, এই গ্যাংটা কলকাতার আরও কয়েকটা দোকানে ও রকম ফ্রড করেছে। প্রথমে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি আর এই দুই মহিলা একই গ্যাংয়ের। কখনও ভদ্রমহিলা প্রথমে আসেন। রিসিট ছাড়াই গয়না নিয়ে যান। তার পর ভদ্রলোক এন্ট্রি নেন। কখনও উল্টো। যাক গে, তার পর কী হল বলুন? বাবা কী করল?

—কী আর করবেন? মা আর মেয়ে প্রথমে এমন কান্নাকাটি জুড়ে দিল, দোকানের অন্য কাস্টমারদের কাছে আমাদের গুডউইল চলে যাওয়ার মতো অবস্থা। এত ভালো অ্যাক্টিং তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। প্রমোদবাবুকেই চোর বানিয়ে দিল। উনি কড়া কথা বলায়, তখন দু'জনের একেবারে অন্য রকম চেহারা। এমন হম্বিতম্বি শুরু করল, পারলে মোবাইলে তখনই থানায় খবর দেয়।

প্রমোদবাবু বিবেকানন্দ রোডে আমাদের শো-রুমের ক্যাশিয়ার। বিষ্টুকাকার মতো দাদুর আমলের বিশ্বস্ত লোক। ভদ্রলোকের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। দোকানে পুলিশ এলে উনি খুব মুশকিলে পড়ে যেতেন। এমন একটা লোককে যারা ঠকিয়ে গেছে, তাদের ওপর আমার রাগই হল। বললাম— বাবা কেন পুলিশে খবর দিল না? সি পি তো বাবার পরিচিত। লালবাজারে ফোন করলেও তো পারত।

—জানি না। আমি এক বার বলেছিলাম। উনি পাত্তাই দিলেন না।

—দাদাকে খবর দেয়নি?

— তোমার দাদা তখন তাজ হোটেলে। তানিস্ক-এর একজিবিশনে। ও ফিরে আসার আগেই গয়না নিয়ে ওই দু'জন চম্পট। টাটা সুমো করে এসেছিল। কৈলাস গাড়ির নম্বর নিয়ে রেখেছিল। পরে খোঁজ করে দেখা গেল, ওটা ভাড়ার গাড়ি।

—দাদা আমাকে খবর দিল না কেন?

— কী করে দেবে? অনেক চেষ্টা করেছে। তোমার মোবাইল তখন অফ করা

ছিল। যাক গে, এ সব কথা যেন তোমার বাবাকে বলতে যেও না। বললেও আমার নামটা আবার করে বোসো না।

এটা বিষ্টুকাকার অভ্যেস। জানে যে বাবার সঙ্গে এ নিয়ে আমার আলোচনার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তবুও বলে। কাল বিকেলে দাদা যে আমাকে ফোনে ধরতে পারেনি, তার কারণ আছে। ওই সময়টায় আমি আর দীপা আইনক্সে ছিলাম। এলগিন রোডে আমাদের নতুন শো-রুমের বাড়িটা কোথায় হচ্ছে ও তা দেখতে চেয়েছিল। তাই সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গেছিলাম। খুব কাছেই আইনক্স মাল্টিপ্লেক্স। দীপার উৎসাহে আমি ওখানে ঢুকি। আগে কোনও দিন যাইনি। কাল গিয়ে মনে হয়েছিল, নাহ কলকাতা শহরটা এগিয়ে যাচ্ছে।

সতেরো

বিষ্টুকাকা হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। সেটা লক্ষ করে আমি বললাম—ওই গয়না আর ফেরত পাওয়া মুশকিল। আমি থাকলে পুলিশ ডাকতাম। যাক গে, বাবার একটু শিক্ষা হওয়ার দরকার ছিল। আমি আর কত বার বাঁচাব? বিষ্টুকাকা কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মা দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই চুপ করে গেল। মায়ের পাশে লালি। ওর হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার। দেখেই বুঝলাম, ঝুলনের প্রসাদ। ওর হাত দিয়ে মা টোটার জন্য পাঠাচ্ছে। তার মানে টোটা আজ আসেনি। ও কি জানে না, বউদি নার্সিংহোমে? নিশ্চয়ই জানে না। জানলে ওর মতো ছেলে চুপ করে বসে থাকত না। শুনেই আগে নার্সিংহোমে ছুটে যেত।

দরজার কাছ থেকে মা আমাকে বলল— টুম্পাই, লালিকে তুই একটু এগিয়ে দিবি বাবা? এত রাত্তিরে মেয়েটাকে একা ছেড়ে দিতে ভরসা পাচ্ছি না। মেড়ো ছেলেগুলো আজকাল খুব বদমাশ হয়েছে...।

মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। বললাম— একটা রিকশা ডেকে দেব মা?

—জ্বালাস না তো। তা'লে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলব কেন? রামশরণই তো রিকশা ডেকে দিতে পারত। হতভাগা ছেলে কোথাকার।

—তা'লে গাড়িটা বের করি?

শুনে মা হেসে ফেলল—তোর যা ইচ্ছে কর।

পকেটে গাড়ির চাবিটা আছে। দরজা খুলে লালিকে বললাম— আসুন।

খিলাত ঘোষ লেন থেকে বেরিয়ে আমি বাঁ দিকে না গিয়ে ডান দিকে বিবেকানন্দ রোড ধরলাম। আমার বাঁ পাশে লালি। উল্টো দিকে রাস্তায় যেতে দেখে ও বলল— এ কী, তুমি যাচ্ছটা কোথায়?

—ভয় করছে?

—ভয় করবে কেন? আমি মায়ের কথা ভাবছি। মা সারাদিন উপোস করে আছে। আমি এই প্রসাদ নিয়ে গেলে তবে উপোস ভাঙবে।

—উপোস তুমি করোনি?

—আমার কথা ছাড়ো।

—আমার ওপর খুব রাগ হয়েছে না?

—বুঝলে কী করে?

—আজ সকালে তো আমাকে চিনতেই পারছিলে না।

—কাল তুমি চিনতে পেরেছিলে আমাকে? রবীন্দ্রভারতীতে? বলেই চুপ করে থেকে লালি মুচকি হেসে বলল— বুলবুলকে আমি যে কথাটা এক দিন বলেছিলাম, সেটাই বোধহয় সত্যি হয়ে গেল।

—কী বলেছিলে ওকে?

—তোমার মনে নেই? তোমাকে তো বলেছিলাম। একজনের সঙ্গে তোমার প্রেম আছে। সে মুম্বইয়ে থাকে।

— মোটেই ঠিক বলোনি।

— তোমার সঙ্গে খুব মানাবে, টুম্পাইদা। কাল তোমরা যখন হেঁটে আসছিলে, তখন গোপা বলে আমার একটা বন্ধু আমার সঙ্গে ছিল। তোমাদের দেখে ও কী বলেছিল জানো? মেড ফর ইচ আদার।

— মেয়েটা আচ্ছা পাকা তো।

— তোমার ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বোধহয় আলাপ করা হবে না। অত বড়লোকের মেয়ে, আমাদের সঙ্গে হয়তো ভাল করে কথাই বলবে না।

—ভুল ধারণা। তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য দীপা মুখিয়ে আছে। সত্যি বলতে কী, আমি তো ভাবছিলাম, ওকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। কাল বা পরশু। তুমি থাকবে?

—আমার কথা বলেছ না কি?

—অনেক। ও খুব রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তোমার গান শুনতে চায়। ও কলকাতায় এসেছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রিসার্চ করবে বলে। ওকে তুমি একটু সাহায্য কোরো।

কথা বলতে বলতেই আমি বাঁ দিকে টার্ন নিলাম। সোজা পুবমুখী এগোলেই কোম্পানি বাগান। পাশ দিয়ে চলে গেলে পুথারেঘাটায় যাওয়া যাবে। কোম্পানি বাগানের কাছে গাড়ি পৌঁছতেই লালি হঠাৎ বলল— বুলবুলের ভূত তোমার ঘাড় থেকে নামল বোধহয়, টুম্পাইদা।

—কার ঘাড়ে চাপল কিছু শুনেছ না কি?

—দাদার ঘাড়ে।

—মানে?

—দাদা বেশ কিছু দিন ধরেই পড়াচ্ছিল বুলবুলকে। তুমি কি সেটা জানো?

—না। টোটা তো আমায় কিছু বলেনি।

—বলবে কোন মুখে? পড়াতে পড়াতে দাদা এখন প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

—তাতে অন্যায়ের কী হল লালি?

—তার মানে? দাদা জানত না, তোমার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চলছে? তা হলে কেন সেই মেয়ের দিকে এগোবে?

—এটা তুমি ঠিক বলছ না লালি। ও জানে, আমার সঙ্গে বিয়ের কথা হলেও আমার কোনও সায় নেই তাতে। যাক গে, এখন কী অবস্থা বলো।

—বুলবুলের বাবা গিরিজাবাবু সুযোগ পেলেই মাঝেমাঝে ডেকে পাঠাচ্ছিলেন দাদাকে। কাল নেমন্তন্ন করে একটা জিনিস বুঝিয়ে দিলেন।

দাদার সঙ্গে বুলবুলের বিয়ে দিতে চান। আমাকেও সেটা শুনিয়ে দিলেন।

—ভালোই তো।

—এর মধ্যে তুমি কী ভাল দেখলে টুম্পাইদা? বিয়ের প্রস্তাবটা তো ভদ্রলোকের আগে মায়ের কাছে এসে দেওয়া উচিত ছিল। আগে দাদাকে বলতে গেলেন কেন?

—এ সব দোষ ত্রুটি ধরতে যেও না লালি।

—আমার কথাটা এখনও শেষ হয়নি টুম্পাইদা। গিরিজাবাবু কাল কিন্তু আর একটা কথাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন। বিয়ে হলে দাদাকে পোস্তায় গিয়ে থাকতে হবে। বুলবুল আমাদের বাড়িতে থাকবে না। দাদাকে ঘরজামাই হতে হবে।

—কী বলছ তুমি? কথাটা শুনে এমন অবাক হলাম, ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলাম পার্কের ধারে।

এলগিন রোডের বাড়িটা পুরো ভাঙা হয়ে গেছে। হামিদ এসে বলল— আমার কাজ শেষ, টুম্পাইবাবু। কাল থেকে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।

চালাঘরের নিচে বাড়ির প্ল্যানটা নিয়ে বসেছিলাম। কথাটা শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। হামিদ লোকটাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। এ রকম সৎ লোক জীবনে কমই দেখেছি। অন্য দিন ওর পরনে থাকে লুঙ্গি আর ফতুয়া। কাজের পোশাক। আজ ঢোলা পায়জামা আর পাঞ্জাবি। ওকে অন্যরকম লাগছে। উল্টো দিকের চেয়ারটা দেখিয়ে বললাম— বোসো। অন্য দিন চালাঘরে কথা বলতে এলে কখনও ও বসে

না। আজ সঙ্কোচের সঙ্গে বসে বলল— আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।

কী, বলো?

কথাটা আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। তবুও বলছি।

আরে; বলোই না। এত সঙ্কোচ করছ কেন?

টুম্পাইবাবু, এ বাড়িতে জিন আছে।

চমকে উঠে বললাম— কী আছে?

জিন। আমরা পুরনো বাড়ি ভাঙার কাজ করি। তিরিশ বছর ধরে এই কাজই করছি। আমরা বুঝতে পারি।

কী বলছ তুমি! জিন... মানে এ বাড়িতে ভূত আছে?

আছে। আমার লেবারদের জিজ্ঞেস করুন। ওরাও একই কথা বলবে। লাস্ট ইয়ার স্ট্রান্ড রোডে পুরনো একটা বাড়ি ভাঙার কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলাম। বাড়ি ভাঙার পর সেই বাড়ির মালিককেও বলেছিলাম, জিন আছে, আমার কথা উনি মানলেন না। হেসে উঠে তাড়িয়ে দিলেন। পরে ছয়তলা তুলেছেন। কিন্তু এখনও সে বাড়িতে ঢুকতে পারেননি।

আপনাকে অ্যাড্রেস দিতে পারি। গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবেন।

হামিদ এ কী অদ্ভুত কথা বলছে! ওর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো আমাদের সব প্ল্যানই চৌপাট হয়ে যাবে। জানুয়ারি মাসে আর শো-রুম খোলা যাবে না। অনেক টাকা ঢুকে থাকবে এই বাড়ির পেছনে। ঠিক টাইমে ব্যবসা শুরু করতে না পারলে খুব মুশকিল হতে পারে। হামিদ যা বলছে, তা সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু ও কী করে বুঝল, এ বাড়িতে ভূত আছে, সেটা আমার জানা দরকার।

বললাম— তুমি টের পেলে কী করে, হামিদ?

—বলছি। এ বাড়ি ভাঙার কাজ যেদিন শুরু করেছিলাম, সে দিন আমার এক লেবারের রক্তপাত হয়েছিল। সে দিনই বুঝেছিলাম, কেউ আছে। এত দিন শান্তিতে ছিল। আমরা তা নষ্ট করেছি। তার পর থেকে প্রায়ই প্রবলেম হয়েছে। আপনাকে কিছু বলিনি। আমার এক লেবার ভেতরের ঘর ভাঙতে গিয়ে সেই জিন দেখেওছে। খুব ফর্সা, মুখে দাড়ি গোঁফ। সাহেব জিন। আমিও প্রায় টের পেতাম নামাজ পড়ার সময়। কেউ আমার আসন সরিয়ে দিত পানির ঘড়া উল্টে দিত। আপনারা লেখাপড়া জানা লোক। শুনলে বিশ্বাস করবেন না। তাই এত দিন চুপ করেছিলাম।

হামিদ মিথ্যে কথা বলার লোকই না। আমাকে ভয় দেখানোর পিছনে ওর কোনও বদ মতলব আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তা বোঝাও যাচ্ছে। নিশ্চয় ও কিছু অনুভব করেছে। না হলে মুখ ফুটে বলত না। বাস্তুশাস্ত্র বলে একটা কথা আছে। আমি সেটা জানি। বাড়ির প্ল্যান করার আগে বাস্তুশাস্ত্র জানা

কোনও লোককে দিয়ে সেটা দেখিয়ে নিলে ভাল হত। আজকাল বড় বড় প্রোমোটাররাও বাস্তুশাস্ত্রকারদের সাহায্য নিচ্ছে। ইস, কেন যে সেটা করলাম না, ভেবে আপসোস হতে লাগল। হামিদ খুব সিরিয়াস মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর কথাগুলো আমি গুরুত্ব দিচ্ছি কি না, তা ঠিক বুঝতে পারছে না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে হামিদ ফের বলল— আমার একটা কথা শুনবেন? বাড়ির মেন গেট আগের মতো উত্তর দিকে করবেন না। তা হলে কিন্তু জিন বাড়ি ছেড়ে যাবে না।

আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী, বাড়ির মেন গেট উত্তর দিকে হওয়ারই কথা। তা হলে তিনটে বড় রাস্তার মোড় পাওয়া যাবে। শো-রুম করার পক্ষে আদর্শ জায়গা। কিন্তু তা করে যদি পরে কোনও প্রবলেমে পড়তে হয়, তা হলে তো কোনও লাভই হবে না। বাড়ির প্ল্যান সাবমিট করা হয়ে গেছে কর্পোরেশনের কাছে। এখন বদলাতে গেলে নানা হ্যাপা পোহাতে হবে। বলবটাই বা কী? বাড়িতে জিন আছে বলে বদলাতে চাইছি? হামিদের কথা যেমন উড়িয়ে দিতে পারছি না, তেমনই মনে খটকা লাগছে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করাটা কি ঠিক হচ্ছে?

বললাম কী করা যায়, বলো তো হামিদ?

আমাদের ওখানে এক পির আছে। আপনি যদি বলেন, তা হলে তাকে নিয়ে আসতে পারি। ঝাড়ফুঁক করে জায়গাটাকে বেঁধে দিয়ে যাবে। আর আপনিও পারলে, বাড়ির প্ল্যানটা একটু অন্য রকম করুন।

কথাগুলো বলেই হামিদ উঠে দাঁড়াল দেখে বললাম—টাকা পয়সা সব বুঝে নিয়েছ?

হ্যাঁ। এই তো আপনাদের বাড়ি থেকেই এলাম। বড়বাবু সব মিটিয়ে দিলেন। আপনি তখন ছিলেন না। বড়বাবু বললেন, আপনি না কি সকাল সকাল বেরিয়ে এসেছেন। তোমাকে যদি দরকার হয়, কোথায় পাব হামিদ?

সোনারপুরে। একটা কাজ ধরেছি ওখানে। কাল থেকে শুরু করব। আমাকে যদি দরকার হয়, তা হলে সেন কনস্ট্রাকশনে খোঁজ করবেন। বড়বাবুর কাছে নাম্বারটা দেওয়া আছে। আজ চলি।

হামিদ চলে যাওয়ার পর চালাঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। পুরো জায়গাটা এখন ফাঁকা মাঠের মতো মনে হচ্ছে। কাল কনস্ট্রাকশনের লোকজন আসবে। পুরো জায়গাটা ঘিরে দেবে টিন দিয়ে। দিন সাতেকের মধ্যেই ভিত পুজো। এমনই কথা হয়ে আছে। কিন্তু ভিত পুজো হবে কী করে, জানি না। বাড়িতে সবাই ব্যস্ত বউদিকে নিয়ে। দিন দুয়েক আগে নার্সিংহোম থেকে বউদি বাড়ি ফিরে এসেছে। কিন্তু বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এমন একটা শক পেয়েছে, একেবারে শয্যাশায়ী। দিন-রাত কান্নাকাটি করছে।

ডাক্তারবাবু বলছেন, নর্মাল হতে আরও কয়েকটা দিন লাগবে। তার মানে, বউদি সেরে না ওঠা পর্যন্ত বাবা ভিত পুজো নাও করতে পারে।

কথাটা মনে হতেই হামিদের মুখটা চোখের সামনে এক বার ভেসে উঠল। ভিত পুজোয় বাধা। হামিদ তো তা হলে ঠিক কথাই বলে গেল। এই বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। হ্যাঁ হতে পারে। অনেক দিনের পুরনো বাড়ি। হয়তো এখানে গুপ্তহত্যা বা আত্মহত্যার কোনও ঘটনা ঘটেছে। সেই অতৃপ্ত আত্মা রয়ে গেছে। গুপ্তধন পাওয়ার পর থেকেই জানতাম, একটা কোনও অঘটন ঘটবেই আমাদের ফ্যামিলিতে। সেটা বউদির ওপর দিয়ে গেল। নাহ, বাগবাজার টোলের রঘু পণ্ডিতের কাছে আজ সন্ধেয় একবার যেতে হবে। পুরো ব্যাপারটা ওকে এক বার জানিয়ে রাখা দরকার। এ সব ব্যাপারে মা-র খুব বিশ্বাস রঘু পণ্ডিতের ওপর।

চালাঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে আসার মুখে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে দীপা। বলল— কী ব্যাপার, আজ এত দেরি। আসছ কখন?

বেলা বারোটার সময় হোটেল থেকে দীপাকে আমার তুলে নেওয়ার কথা। হামিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর কথা আমি ভুলেই মেরে দিয়েছি। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় বারোটা। তাজ বেঙ্গলে যেতে মিনিট পনেরো লাগবে। তার পর দীপা আমার সঙ্গে যাবে আমাদের বাড়িতে। বউদিকে দেখতে। কাল সন্ধেবেলাতেই যেতে চেয়েছিল। আমরা তখন ড. পবিত্র সরকারের বাড়ি থেকে ফিরেছি। সেই গড়িয়া-পাটুলি থেকে। সে সময় ওকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে গেলে ফের রাতে এ দিকে আসতে হত। তাই এড়িয়ে গেছিলাম। দীপাকে বললাম— তুমি রেডি?

— সেই সক্কালবেলায়। জানো, কাল রাতে ডিনার করতে নেমে কী হল?

—কী বলো তো?

—হঠাৎ দেখা ড. যোশীর সঙ্গে। কী একটা কাজে উনি হোটেলে এসেছিলেন। দেখে তো আমি অবাক। দু'জনে মিলে ডিনার করলাম। ভদ্রলোকের যে আরও একটা গুণ আছে, জানতামই না। হি ইজ আ পেন্টার। ছবি আঁকেন। ওকে দেখে মনেই হয় না। তাই না?

পেন্টিং সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তবুও বললাম— এত ব্যস্ত ডাক্তার, উনি ছবি আঁকেন কখন?

—আরে, সেটাই তো আমি জানতে চাইলাম। উনি কী বললেন জানো? পেন্টিং এত ভালবাসেন, ডাক্তারিটা ছেড়ে দেবেন কি না, ভাবছেন।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস বলে একটা গ্যালারিতে না কি উনি ছবির একজিবিশন করছেন। ওপেন করবেন মকবুল ফিদা হুসেন। আচ্ছা, জায়গাটা ঠিক

কোথায় বলো তো?

দিন দুই আগে দীপাকে নিয়ে নন্দনে গেছিলাম। তাই ওকে বললাম—নন্দনের খুব কাছে। তোমার হোটেল থেকে গাড়িতে মিনিট পাঁচেকও লাগবে না।

—তুমি এসো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। ছাড়ছি তা হলে। বলেই দীপা ফোনের লাইনটা কেটে দিল।

বউদি নার্সিংহোমে থাকার ক'দিন দীপা রোজই বউদিকে দেখতে গিয়েছে। তখন ডা. যোশীর চেম্বারে মাঝেমধ্যেই ঢুকে যেত। ডা. যোশীও খুব খুশি হতেন ওকে দেখে। ভদ্রলোক খুব হ্যান্ডসাম। বয়স বেশি না। আমার থেকে দু'তিন বছরের বড় হবেন। বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। কথায় কথায় দীপা এক দিন আমায় বলেছিল, ডা. যোশীকে ও না কি এক বারই মুকেশ অম্বানীদের কোনও এক পার্টিতে দেখেছিল। ফের এখানে দেখা হবে ভাবতেই পারেনি।

দিন সাতেক হয়ে গেল, পটেলভাই সেই যে কাঠমান্ডু গেছেন, ফেরার নামই নেই। তবে দীপার মুখে শুনেছি, উনি রোজই মোবাইলে ফোন করছেন। আমি রোজ যাচ্ছি কি না, তার খোঁজ নিচ্ছেন। আমিও দীপার কাছে জানতে চাইছি, পটেলভাই ফিরবেন কবে? ফিরলে আমি অন্তত বেঁচে যাব। কলকাতা শহর সম্পর্কে দীপার আগ্রহ দিনকে দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। সব কাজকর্ম ছেড়ে আমাকে ওর সঙ্গ দিতে হচ্ছে। ওর আবদার মেটাতে মেটাতে আমার প্রাণান্তকর অবস্থা। তাজ বেঙ্গলের দিকে গাড়ি ছোটানোর সময় দীপার কথাই মনে হতে থাকল। ও যে মাল্টি মিলিয়নেয়ারের মেয়ে তা বোঝাই যায় না।

মুম্বইয়ের ওই অভিজাত মহলে বাস করেও মেয়েটা একেবারে সহজ সরল রয়ে গেছে। এক দিন টুকরো টুকরো অনেক কথাই হয়েছে ওর সঙ্গে। এক দিন বলল, সপ্তাহে সাত দিনই ওকে বিভিন্ন পার্টিতে যেতে হয়। সিনেমা আর্টিস্টদের সঙ্গে না কি খুব ভাল সম্পর্ক। মনীষা কৈরালা বলে কে একজন আর্টিস্ট প্রায়ই না কি ওদের বাড়িতে আসেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কে মনীষা কৈরালা? ও তখন খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। পর দিন লালির কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, মনীষা কৈরালাকে ও চেনে কি না? ও সে দিন বউদিকে দেখতে এসেছিল। মনীষা কৈরালার নামটা আমার মুখে শুনে ও খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। তার পর বলেছিল—আজকাল তোমার খুব অধঃপতন হয়েছে টুম্পাইদা। অবশ্য হবেই না কেন? তোমার বন্ধুও তো অনেক বদলে গেছে। যাক গে, ও সব বলে এখন আর লাভ নেই। 'নাইনটিন ফরটি টু আ লাভ স্টোরি' বলে একটা সিনেমা এসেছিল। মনীষা কৈরালা ছিল তার নায়িকা। দিন চার-পাঁচেক ধরেই লালির সঙ্গে দীপাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ মনে হল, আজ লালিকে ডেকে

নিলেই তো হয়। লালি যদি আমাদের বাড়িতে আসে তা হলে দু'জনের দেখা হয়ে যেতে পারে। ও অবশ্য বাড়িতে এখন থাকবে না। নিশ্চয়ই কলেজে গেছে। কিন্তু বিকেলের দিকে এলেও চলবে। দীপা তত ক্ষণ থাকবে। বরং মাসিমাকে বলে রাখা যাক।

কথাটা মনে হওয়া মাত্রই রাস্তার ধারে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে মোবাইলে টোটাদের বাড়িতে ফোন করলাম। অনেক ক্ষণ রিং হয়ে গেল, কিন্তু কেউ রিসিভার তুলল না। এই সময় আর কেউ থাকুক না থাকুক, মাসিমার থাকার কথা। তা হলে কেন ফোন ধরছেন না? পুজোর ঘরে ঢুকেছেন না কি? হতে পারে। আমি জানি, পুজোর ঘরে ঢোকা মানে মাসিমার ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। তার আগে বেরোবেনই না। থাক, বাড়িতে পৌঁছে না হয়, আর এক বার চেষ্টা করা যাবে।

তাজ বেঙ্গলে যে আমার জন্য বড় সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে, তা আমি ভাবতেই পারিনি। তিনতলায় দীপার ঘরে গিয়ে দেখি, ও নেই। বার বার ডোর বেল টেপা সত্ত্বেও কেউ দরজা খুলল না। কী হল মেয়েটার? এই মিনিট কুড়ি আগে ফোন করে আমাকে আসতে বলল। অথচ হোটেলেই নেই। গেল কোথায়? কলকাতায় ওর এমন কোনও পরিচিত নেই, যার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে। তা হলে কি নিচের কোনও রেস্তোরাঁতে গেছে? চিন্তিত মুখে আমি নিচে নেমে এলাম। দিন সাত আট ধরে তাজ বেঙ্গলে আসছি। দীপার জন্য হোটেলের সব জায়গা আমার জানা হয়ে গেছে।

তিন তিনটে রেস্তোরাঁ। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দীপা কোথাও নেই। কোনও শো রুমেও ঢোকেনি। ডিসকো থেক ইনকগনিটো-তে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানেও নেই। রিসেপশনে খোঁজ নিতে সেখানেও বলল, মিস পটেল চাবি জমা দিয়ে যাননি। আর জানিয়েও যাননি, কোনও গেস্ট এলে কী বলতে হবে। লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কী করা যায়। এমন সময় মনে হল, ওর মোবাইলে ফোন করে দেখা যাক। আছে কোথায়? কিন্তু ফোন নাম্বারটা আমার জানা নেই। তখনই মনে হল, কিছু ক্ষণ আগেও আমার মোবাইলে ফোন করেছিল। তার মানে রিসিভড কল থেকে ওর নাম্বারটা জেনে যাওয়া যাবে।

সুইচ টিপে টিপে নাম্বারটা বের করে ওকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু যত বারই করি, তত বারই বলে, দ্য নাম্বার ইজ বিজি। প্লিজ কল আফটার সামটাইম। আচ্ছা মুশকিল হল। ওর জন্য কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করব কি না, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। বেলা সাড়ে বারোটা বাজে। না হয় দীপার জন্য আধ ঘণ্টা লাউঞ্জে বসে থাকা যাবে। কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ উধাও হল কোথায়, সেই ভাবনায় কপালে ভাঁজ পড়তে লাগল। এক বার ভাবলাম, হোটেলের সিকিউরিটিকে ব্যাপারটা

জানাই। পরক্ষণেই মনে হল, আরও কিছু ক্ষণ দেখা যাক।

ঘড়ির কাঁটা যত এগোতে লাগল, ততই আমার চিন্তা বাড়তে থাকল। এত বড় একটা মেয়ে, পাঁচ পাঁচটা কোম্পানির ডিরেক্টর, সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে। হোটেলে একা থাকতে অভ্যস্ত। সে নিজের ইচ্ছে ছাড়া গায়েব হয়ে যাবে, আমার মন তা মানতে চাইল না। এত নামী একটা হোটেল থেকে কেউ ওকে গায়ের জোরে তুলে নিয়ে যাবে, তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই হোটেলে কারও সঙ্গে দীপার দেখা হয়ে গেছে। অথবা ফোন করে কেউ ওকে ডেকেছে। তার সঙ্গে কোথাও গেছে। কিন্তু যাওয়ার আগে আমাকে একটা ফোন করে জানিয়ে দিল না কেন? এই প্রশ্নটা মনে হতেই ফের দুর্ভাবনা শুরু হল।।

দিনটাই বাজে যাচ্ছে। হামিদ কী সব ভূতের ভয় দেখিয়ে গেল। তার পর দীপার এই উধাও হয়ে যাওয়া। আমার পুরো দিনের প্রোগ্রামটাই নষ্ট। বেলা একটার সময় আমি সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আর তখনই পিছন থেকে কে যেন বলল— মিস্টার দত্তা, আপনি কি মিস পটেলের জন্য ওয়েট করছেন?

দাঁড়িয়ে পড়তেই দেখি, পটেলভাইয়ের সেই সিকিউরিটির লোকটা। প্রথম দিন সে আমাকে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। পটেলভাই নেই, তবুও এঁরা এখানে কী করছেন? প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। বললাম— হ্যাঁ, ওর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

—কোথায় গেল বলুন তো?

বললাম— আমিও তো সেটা জানতে চাইছি।

—আমি এখুনি ডিউটিতে এলাম। মিস পটেল তো আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়ে গেলেন।

—আপনারা কি ওঁর সিকিউরিটির দায়িত্বে আছেন?

—অফ কোর্স। মি. পটেল সে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমাদের ওপর। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা ওঁকে ফলো করছি। এর আগে মুম্বইয়ে দু'-দু'বার ওঁকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হয়েছে। সে জন্যই মি. পটেল আমাদের অ্যাপয়েন্ট করেছেন।

বলে কী লোকটা? গত কয়েকদিন দীপাকে নিয়ে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছি, অথচ জানতেও পারিনি। আমাদের পিছনে সিকিউরিটির লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার চেয়েও বড় কথা, দু'বার দীপাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হয়েছে, সে কথা ঘুণাক্ষরেও ও আমায় বলেনি। বললে এত হুটহাট করে ওকে নিয়ে বেরোতাম কি না সন্দেহ। একটু অসন্তোষ দেখিয়ে বললাম— তাই যদি হয়, তা হলে দীপা কোথায় গেল, আপনারা তার ট্র্যাক রাখতে পারেননি কেন?

—স্যার, আমার ডিউটি বেলা একটা থেকে। আমার পার্টনারের খোঁজ পাচ্ছি

না। ওরই চার্জ বুঝিয়ে যাওয়ার কথা। মোবাইলে অনেক ক্ষণ ওকে ধরার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোনও রেসপন্স নেই।

দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক! ধৈর্যচ্যুত হয়ে কিছু বলে ফেলার আগে আমি দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। লোকটাকে আমার ফোন নাম্বার দিয়ে গেলে ভালো হত। কিন্তু এত ক্যালাস, কথা বলতেই আর ইচ্ছে করল না। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। অনেক ক্ষণ এম্পটি স্টমাকে আছি বলে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার।

আঠারো

তাজ বেঙ্গল থেকে বেরোনোর সময়ই বুঝতে পারলাম, আকাশ আজ ঢালবে। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। দু'তিন দিন ধরে চিটচিটে গরম চলছিল। বৃষ্টির জন্য লোকে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। যাক, তবুও গরমটা কমবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির বাঁ দিকে টার্ন নেওয়ার সময়ই ঝড় উঠল। প্রেসিডেন্সি জেলের মাথায় বিদ্যুতের চমক। ভাল করে বৃষ্টি নামার আগেই আমাকে বাড়ি পৌঁছতে হবে। চিৎপুরের রাস্তায় জল জমে। ও দিকে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর কোনও কোনও জায়গাতেও।

কারবুরেটরে জল ঢুকে গেলে মুশকিল। উফ, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য! ভালই হয়েছে দীপা আজ সঙ্গে নেই। বৃষ্টিতে এই শহরের যা হাল হয়, তা দেখলে ওর কলকাতা প্রীতি অনেকাংশেই কমে যেত।

উত্তর দিকে যত এগোতে থাকলাম, ততই আকাশ থেকে মেঘ উধাও হতে থাকল। তার মানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এ দিকে নেই। নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগলাম, রোদ্দুরটা কমে গেলে আজ বিকেলের দিকে একবার জোড়াবাগান পার্কে যেতেই হবে। বডিটাকে এক বার মাসাজ করানো দরকার। ক্লাবে নিয়মিত যেতে পারছি না বলে শরীরে জং পড়ে গেছে। দু'দিন আগে গবা এক বার ফোন করেছিল। জাপান থেকে না কি একটা চিঠি এসে পড়ে আছে আমার নামে। বললাম, বাড়িতে দিয়ে যা। তবুও দিয়ে যায়নি।

বেশ কিছু দিন ধরে বুঝতে পারছি, রোজ এক বার করে না গেলে ক্লাবটা আর আমার হাতে থাকবে না। সমীর বড়াল নামে একটা ছেলে দল পাকাচ্ছে। একটা পয়সা এনে দেওয়ার মুরোদ নেই। ক্লাবের কোনও কাজে আসে না। কিন্তু সব ব্যাপারে সমালোচনা করা চাই। টিপিক্যাল বেনেবাড়ির ছেলে। থাকে পার্কের ঠিক পেছনে। মাধ্যমিকের বেশি এগোয়নি। কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পারি, আমায় খুব হিংসে করে। গবার মুখে শুনেছি, এক বার না কি ক্লাবে ও বলেছিল, কে কত ভাল ছেলে আমার জানা আছে! আমার মুখ আর খোলাস না। টুম্পাই কেন টোটাদের

বাড়ি যায়, সব জানি। তার পর থেকেই ছেলেটার ওপর আমার ভীষণ রাগ।

বাড়ি পৌঁছলাম, বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ। দরদর করে ঘামতে ঘামতে। তিন তলার ঘরে উঠে জামা আর গেঞ্জিটা খুলে ফুল স্পিডে পাখাটা চালিয়ে দিলাম। নিচে তিনটে ঘরে এ সি মেশিন আছে। দাদা আমার ঘরেও লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি চাইনি। শরীরের পক্ষে খারাপ বলে। এখন মনে হচ্ছে, ঘরে এ সি থাকলে বোধহয় ভাল হত। ইদানীং প্রায় রোজই তাজ হোটেলে যাচ্ছি। অনেকটা সময় ওখানে কাটাচ্ছি। কই, শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

—হ্যাঁ রে, দীপা আজ এল না?

মা কখন ওপরে উঠে এসেছে, বুঝতে পারিনি। বললাম— সে তো দেখতেই পাচ্ছ।

—ওকে আনতে যাসনি?

—গেছিলাম। গিয়ে দেখলাম ও নেই।

—সে কী? ও আসবে বলে এত রান্না করালাম। তোর বাবাও অনেক ক্ষণ ওয়েট করল একসঙ্গে খাবে বলে। আর ও-ই এল না। কেন রে?

চোখ বুজে পাখার হাওয়া খেতে খেতে বললাম— ও কোনও দিন এলে ওকেই না হয় জিজ্ঞেস করে নিও।

—অমন বেঁকিয়ে টেরিয়ে কথা বলছিস কেন রে টুম্পাই? একটা কথার জবাবও কি তুই সোজাসুজি দিতে পারিস না?

চোখ খুলে বললাম— আমি আবার বেঁকিয়ে কথা বললাম কখন?

—এই তো বলছিস। মায়ের সঙ্গে কখনও এই ভাবে কথা বলতে হয়? যা, তোর সঙ্গে আমি কথাই বলব না।

মা রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, প্রায় দৌড়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম। প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে। হাসি চেপে বললাম— ঠিক আছে, পরে কথা বন্ধ করে দিও। এখন তো বলে যাও, মতির মাকে দিয়ে কী রান্না করিয়েছ?

—ছাড় ছাড়। তোর ঘাম সব আমার গায়ে লেগে যাচ্ছে। ছ্যাং ফের আমায় চান করতে হবে।

—তোমার হাজব্যান্ডের লাঞ্চ হয়ে গেছে?

—ও কী কথা? এমন কথা বলিস, গায়ে চিড়বিড় করে। জানিস টুম্পাই, বউমা না আজ আবার তোর বাবাকে পরিবেশন করে খাইয়েছে। কী ঝড়ই না গেল মেয়েটার ওপর দিয়ে!

—বউদি এখন কোথায় মা?

—তোকে খেতে দেবে বলে বসে আছে। তোর দাদাও তো এই মাত্র এল।

চল, দুই ভাই একসঙ্গে খাবি।

—তা হলে চলো।

নিচে নামার জন্য দু'পা এগিয়ে মা হঠাৎ বলল—আজ তুই বেরিয়ে যাওয়ার পরই লালি আর ওর মা এ বাড়িতে এসেছিল।

—কেন গো?

—সে অনেক কথা। ছেলে, না শত্তুর! টোটার মতো ছেলে যে অমন বদলে যাবে, আমি ভাবতেও পারিনি। তুই কি কিছুই জানিস না?

—না তো?

—টোটা তোকে কিছুই বলেনি? ও তোর কেমন বন্ধু রে?

—ওর সঙ্গে তো আমার দেখাই হচ্ছে না।

—গিরিজাবাবু ওকে ঘরজামাই করতে চাইছে।

কয়েক দিন আগেই লালি এ খবরটা আমায় দিয়েছিল। ওর মুখে আমি সব শুনেছি। এই ব্যাপারটা নিয়ে ওদের ফ্যামিলিতে একটা টেনশন হচ্ছে, সেটা সে দিন লালির কথা থেকে টের পেয়েছিলাম। কিন্তু মাঝে কী এমন হল, মাসিমাকেও এ বাড়িতে ছুটে আসতে হল? তার মানে আজ তাজ বেঙ্গলে যাওয়ার সময় যখন টোটাদের বাড়িতে আমি ফোন করেছিলাম, তখন ওদের বাড়িতে কেউ ছিল না। তাই কেউ ফোন ওঠায়নি। বললাম— খারাপ কী মা? পোস্তা আর পাথুরেঘাটার মধ্যে কী এমন দূরত্ব? টোটা তো স্বচ্ছন্দে দু'দিকই সামলাতে পারবে।

—তুই বলছিস কী রে, হতভাগা? সামলাতে পারবে? গিরিজাবাবুকে তুই কতটা চিনিস? এ বিয়ে হলে লালির সর্বনাশ হয়ে যাবে যে! আমি বেঁচে থাকতে তা কিন্তু হতে দেব না। এই তোকে বলে রাখলাম।

—কিন্তু তোমার কীই বা করার আছে মা? এটা ওদের ফ্যামিলির ব্যাপার। তুমি কেন নাক গলাতে যাবে?

—তার মানে? এমন একটা সোনার প্রতিমার মতো মেয়ে জলে চলে যাবে, চোখের সামনে সেটা আমায় দেখতে হবে না কি? তুই বলছিস কী? মেয়েটাকে একটুকু থেকে দেখছি। কী চেহারা হয়েছে এখন দেখেছিস? দেখে তো আমি চিনতে পারি না, এমন অবস্থা। ওর মা বলল, মেয়ের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেছে। খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। না রে টুম্পাই, আমি কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকব না।

—আমি তো বুঝতেই পারছি না, লালি এত আপসেট হয়ে গেল কেন?

—তুই কি জানিস, লালির গায়ে এক দিন হাত পর্যন্ত তুলেছে টোটা? আমি তো ঠিক করেছি, ছেলেটার মুখ পর্যন্ত দেখব না। ছ্যা।

শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। যে টোটাকে কোনও দিনও উঁচু গলায় কথা

বলতে শুনিনি, লালিকে সে মারধর করেছে! ভাবতেই পারি না। ওদের ভাই-বোনের মধ্যে কী সুন্দর সম্পর্কই না ছিল! বোনের জন্য ও পাগল ছিল। নিজের চোখে দেখেছি, লালির কম অত্যাচার সহ্য করেছে ও? কোনও রকমে বললাম— এই ক'দিনে এত বদলে গেল কী করে টোটা?

—তুই জানিস। তোরই তো বন্ধু। কোনও দিন হয়তো দেখব, তুইও মাকে ছেড়ে কোথাও পালিয়েছিস। পুরুষের জাত তো। তোদের বিশ্বেস নেই।

বলতে বলতে মায়ের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। না, এ আমার ছিঁচকাঁদুনে মা নয়। মায়ের এই চেহারাটা আমি কোনও দিন দেখিনি। মুখের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা ক্রোধ ফুটে বেরোচ্ছে। যেন টোটাকে ভস্ম করে দেবে। লালিকে মা এত ভালবাসে, জানতামই না। মাকে শান্ত করার জন্যই বললাম— টোটার সঙ্গে আজই আমি কথা বলব, মা।

—না, বলবি না। বলার দরকার নেই। যা করার, আমি করব। লালিকে আমি এ বাড়ির বউ করে আনব। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। বল বাবা, তুই রাজি?

—গডব্রাদার, তোমাকে কেমন যেন অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড মনে হচ্ছে? হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে প্রশ্নটা করলেন পটেলভাই। মুখে মৃদু হাসি। নরম সোফায় গা এলিয়ে বসে আছেন। আমার ঠিক উল্টোদিকে। আজ বিকেলেই উনি ফিরেছেন কাঠমান্ডু থেকে। হোটেলে পৌঁছেই আমাকে ফোন— যেখানেই থাকো, এক্ষুনি চলে এসো। তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকার। কখন আসতে হবে, দেশমুখের কাছ থেকে সেই টাইমটা তুমি জেনে নাও।

দুপুরে এই হোটেল থেকে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। আবার আসতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু বাড়িতেও এমন চাপা টেনশন, শেষ পর্যন্ত পটেলভাইয়ের ডাক আর উপেক্ষা করতে পারলাম না। ওঁর পি এ যতীন দেশমুখ আমাকে বললেন, সন্ধে সাতটা থেকে পৌনে আটটা পর্যন্ত আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছি। এই কয়েক মিনিট আগে দেশমুখ অন্যদের বিদেয় করে দিয়েছেন। পটেলভাই আর আমি এখন মুখোমুখি। দীপা একটু আগে মুখ দেখিয়ে কোথায় যেন কেটে পড়ল। যাওয়ার আগে মুচকি হেসে এক বার 'সরি' বলে গেল। ওকে জিজ্ঞেস করাই হল না, দুপুরে কোথায় গেছিল?

পটেলভাই আমার উত্তরের অপেক্ষায়। সেটা বুঝে বললাম— না,-না। আমি ঠিক আছি। কেন ডেকে আনলেন, সেটা বলুন।

—এত তাড়াতাড়ির কী আছে, গডব্রাদার? একটু বোসো না। আমাকে হাঁফ নিতে দাও। গত কয়েকটা দিন এত হেকটিক গেছে, দম ফেলার সময় পর্যন্ত পাইনি। মাঝে দু'দিনের জন্য লাটাভিয়া গেছিলাম। বড় একটা ভেঞ্চারে নামছি। তার আগে

তোমার অ্যাডভাইস নিতে চাই।

আমার অ্যাডভাইস মানে... জ্যোতিষ। প্রতি বারই বড় কোনও বিজনেস ভেঞ্চারে নামার আগে পটেলভাই আমার কাছ থেকে জেনে নেন, টাকাপয়সা লগ্নি করা উচিত হবে কি না? কী বিজনেসে নামছেন এবং কাদের সঙ্গে— সেটাও খোলসা করে বলেন। গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে আমি তখন বলে দিই, কোনটা করা ঠিক হবে, অথবা বেঠিক। সবার ভাগ্যে সব ব্যবসা হয় না। হরোস্কোপ দেখে সেটা বলে দেওয়া যায়। গত বছরই পটেলভাই অনেক টাকাপয়সা নিয়ে নামতে চেয়েছিলেন হোটেল বিজনেসে। পাঁচশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করে ফেলছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে কী মনে হওয়ায় মুম্বই থেকে আমাকে ফোন করেন। আমি মানা করে দিই। এ বার কী ব্যবসার কথা ভাবছেন, সেটা আগে বলুন, তার পর অ্যাডভাইস দেওয়া যাবে।

হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিলেন পটেলভাই। তার পর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললেন— তোমার মুম্বই যাওয়ার কী হল, গডব্রাদার?

—যাওয়ার তো খুব ইচ্ছে আছে আমার। কিন্তু গিয়ে কী করব, সেটা আগে ঠিক করতে হবে। ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমার সঙ্গে কাজ করতে চাও?

—কী কাজ?

—পার্টনারশিপে কোনও বিজনেস?

—কিছু ভেবেছেন না কি?

—অত ভাবাভাবির কী আছে? ব্যবসার জগৎটা কীরকম, জানো গডব্রাদার? ব্যবসাটা যে করতে জানে, তার জন্য একশোটা দরজা। একটা খুললেই দেখতে পাবে, সামনে আর একটা দরজা। সেটা খুললেই দেখতে পাবে, সামনে আর একটা দরজা। তুমি যদি ডায়মন্ড দিয়ে শুরু করো, তা হলে ডায়মন্ড লিঙ্কড আর একটা ব্যবসার দরজা তোমার সামনে খুলে যেতে পারে।

—আপনার কথা আমি ঠিক ফলো করতে পারছি না।

—দাঁড়াও, তোমায় বোঝাচ্ছি। তার আগে বলো, তোমাদের ফ্যামিলি বিজনেসে তোমার স্টেটাস ঠিক কী?

সত্যি কথাটাই বললাম— আমার কোনও স্টেটাস নেই।

—মানে? প্রশ্নটা করেই পটেলভাই সিধে হয়ে বসলেন। তার পর বললেন— দত্ত জুয়েলার্সে তোমার কোনও শেয়ার নেই? এর পর তুমি নিশ্চয়ই বলবে, কোম্পানির ডিরেক্টরও তুমি নও।

—ঠিক তাই। আমার কোনও মালিকানাই নেই।

—তা হলে মালিকানা কার?

—বাবা, মা এবং দাদার।

—তুমি নও কেন?

—জানি না। কোনও দিন জিজ্ঞেস করিনি।

—হাউ ফানি। জিজ্ঞেস করোনি, বাট হোয়াই? তুমি কি তোমাদের বিজনেসে ইনভল্‌ভড্‌ নও? তাই বা হবে কী করে? তুমিই তো আমার সঙ্গে লিয়াজোঁর কাজটা করে থাকো। দাঁড়াও, দাঁড়াও গডব্রাদার। আমার সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। এই যে তুমি দত্ত জুয়েলার্সের হয়ে এত কাজ করো, বিনিময়ে তুমি কোনও পারিশ্রমিক পাও না?

—একটা টাকাও না।

—তা হলে, কাজ করো কেন? আশ্চর্য! মুম্বইয়ে আমরা তো ভাবতেই পারি না। ওখানে ফ্রি সার্ভিস বলে কোনও কথা ডিকশনারিতে লেখা নেই। দত্তসাহেবকে বলো, টাকা না দিলে তুমি ইন ফিউচার কোনও রকম এক্সপার্টাইজ দেবে না। ইয়ারকি না কি?

পটেলভাই বেশ উত্তেজিত। কথা বন্ধ করে এক চুমুকে হুইস্কি শেষ করে উনি ফের গ্লাসে ঢালতে লাগলেন। কথাগুলো উনি মন্দ বলছেন না। সত্যিই তো, আমাকে খাটিয়ে নেবে অথচ বাবা পারিশ্রমিক দেবে না, কেন? এই যে এলগিন রোডের বাড়িটার পিছনে আমি এত সময় দিলাম, তার কোনও মূল্য নেই? নাহ, কথাটা বলতে হবে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে বাবা আর দাদাকে। মাল যদি না দাও, আমি নেই। তা হলে অন্য লোককে দিয়ে করাও। বেগার খাটতে আমি আর রাজি নই।

—তুমি আমার সঙ্গে মুম্বাই চলো, গডব্রাদার। তোমার যা কোয়ালিটি আছে, তাতে মাল্টিমিলিয়নেয়ার হয়ে যেতে পারবে। আই অ্যাম শিওর।

—কবে ফিরছেন আপনি, পটেলভাই?

—কাল সকালেই। কাল দুপুরেই আমার ডায়মন্ড কোম্পানির বড় মিটিং আছে মুম্বইয়ে। দীপা আর আমাকে অ্যাটেন্ড করতেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। পিছনের দিকে আর তাকিও না। বাবার কোম্পানিতে বেকার খেটে লাভ কী?

—আমায় দু'তিনটে দিন ভাবার সময় দিন।

—অত ভাবতে যেও না। তোমরা বাঙালিরা বড্ড বেশি ভাবো। তাই তোমাদের নিয়ে মুশকিল। আমি একটা নতুন কোম্পানি স্টার্ট করছি গডব্রাদার। তোমাকে পার্টনার হিসেবে নিতে চাই। কোম্পানিতে আরও দু'জন থাকবে। তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয়ও হয়েছে। ব্লিচ আর মিস দুম।

—কী ধরনের কোম্পানি পটেলভাই?

—সেটা এখনই বলব না। আগে তুমি মুম্বইয়ে এসো। তার পর আলোচনা

করা যাবে। এখন তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে ব্লিচ আর দুম এর বার্থ ডেট আর টাইম তোমাকে আমি দিচ্ছি। তুমি বলে দাও, ওদের সঙ্গে আমার বনবে কি না। যে ব্যবসায় নামতে যাচ্ছি, তাতে হাই রিস্ক ইনভল্‌ভড। সে জন্যই জানতে চাইছি।

—এঁদের আপনি কত দিন ধরে চেনেন?

—মিস দুমকে বছর দুয়েক তো বটেই। আর ব্লিচকে দিন দশেক। মিস দুমই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে ব্লিচের।

—আপনার ইলেকশনে নামার কী হল?

—নামছি। তুমি গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছ বলেই নামছি। ইদানীং মনে হচ্ছে, আমার একটা শেলটার দরকার। প্রচুর শত্রু হয়ে গেছে। সুরাত থেকে প্রায় ভিখারির অবস্থায় আমি মুম্বই গিয়েছিলাম। ওখানে শুধু টাকা কামিয়ে গেছি। আজ আমার টাকা খায় কে? এই জন্যেই কিছু লোক আমার পিছনে লেগেছে। রিসেন্টলি একটা ঝামেলাতেও পড়েছি।

—কী ধরনের ঝামেলা?

—তোমাকে বলা হয়নি। বছর সাতেক আগে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম। তবে অনেক পিছন থেকে। তোমার সঙ্গে তখনও আমার আলাপ হয়নি। একজন খুব নামী ডিরেক্টর আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল বলে তখন টাকাটা দিয়েছিলাম। মুম্বইয়ে ব্লাস্ট হওয়ার পর শুনলাম, যে কোম্পানিটা ফাইনান্স করছিল, তারা দুবাইয়ের একটা মাফিয়া গ্রুপের টাকাও নিয়েছে। ব্লাস্টের সঙ্গে ওই মাফিয়া গ্রুপই জড়িত। কাজেই ইনভেস্টিগেশন করার সময় পুলিশ আমার কাছে এসেছিল। তখনই আমার নামটা কাগজে ফ্লাশ হয়ে যায়। সেই মামলা এখনও চলছে।

দীপা গল্প করার সময় এক দিন বলেছিল বটে, পটেলভাইয়ের সঙ্গে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খুব যোগাযোগ আছে। কিন্তু মুম্বইয়ের বম্ব ব্লাস্টের সঙ্গে ওঁর নামটাও জুড়ে আছে, আমি তা ভাবতেও পারিনি। আমার গণনা তা হলে ঠিক। দীপাকে বলেই দিয়েছিলাম, পটেলভাই রাজরোষে পড়বেন। কথাটা তখন দীপার বোঝা উচিত ছিল। পটেলভাই আর কী বলেন, শোনার জন্য বললাম— তার পর?

—দুবাইয়ের মাফিয়া গ্রুপের সঙ্গে আমার নামটা জুড়ে যাওয়ায় একটা পলিটিক্যাল পার্টি আমার সঙ্গে বারগেন শুরু করে। ইলেকশন ফান্ডে টাকা দাও, আমরা বাঁচাব। কিন্তু ওই পার্টির লোকদের আমার ঠিক পছন্দ নয়। তাই আমি রুলিং পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকি। ওরা বলেছে, কেস থেকে আমার নামটা বাদ দেবে। তার জন্য যাদের কেনার দরকার, আমি কিনে রেখেছি।

—আপনি কি রুলিং পার্টির হয়েই ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন?

—হ্যাঁ। ইচ্ছে করেই দাঁড়াতে চাইছি। এক বার জিতে গেলে পার্টি আর

আমায় গাড্ডায় ফেলতে পারবে না। তখন নিজেদের ইন্টারেস্টেই ওরা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। অন্তত পার্টির বদনাম এড়ানোর জন্য, ওদের তা করতেই হবে।

—মামলার রায় বেরবে কবে, কোনও আইডিয়া আছে?

—ঠিক জানি না। তবে মনে হয় মাস আটেকের আগে না।

কথাটা শুনেই আমি চমকে উঠলাম। হরোস্কোপ ধরেই পটেলভাইয়ের জীবনটা তা হলে এগোচ্ছে। আটমাস পর ওঁর লাইফ হেল হয়ে যাবে। কোনও পার্টিই পটেলভাইকে আর বাঁচাতে আসবে না। আমি জানি। আত্মবিশ্বাসী যে লোকটা আজ আমার সামনে নরম সোফায় বসে আছে, তখন তাঁকে কাটাতে হবে ছোট্ট সেল-এর কন্দরে।

—জানো গডব্রাদার, আমার মাথায় একটাই চিন্তা। এমন একটা ছেলের হাতে দীপা আর আমার বিজনেসের ভার দিয়ে যেতে চাই, যে দুটোই সামলাতে পারবে। কিন্তু এমন ছেলে চোখেই পড়ছে না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, দীপাকে তোমার কেমন লাগল, গডব্রাদার?

— খুব ভাল।

— তোমাকে কোনও ট্রাবল দেয়নি তো? আমি ফিরে আসার পর থেকেই তো দেখছি, ও তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সারাক্ষণ তোমার কথাই বলছে। তোমাদের বাড়ির কথা বলছে, তোমার মায়ের কথা। এই দ্যাখো, জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি, তোমার সিস্টার ইন-ল'র কথা। কেমন আছেন এখন?

—ভালো।

কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন পটেলভাই, এমন সময় দরজা খুলে ঢুকলেন দেশমুখ। হাতে মোবাইল সেট। কেউ বোধহয় ফোন-টোন করেছে। মোবাইল সেটটা উনি এগিয়ে দিলেন পটেলভাইয়ের দিকে। দেশমুখ ঘরে ঢোকা মানে আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ তাই। সাতটা চল্লিশ। তার মানে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। পটেলভাইয়ের জীবন চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে, আমাদের মতো নয়।

উনিশ

ফোনে খুব নিচু গলায় কথা বলছেন পটেলভাই। কী ভাষায়, বুঝতে পারছি না। কাল সকালেই যদি উনি কলকাতা ছেড়ে চলে যান, তা হলে ওঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হচ্ছে না। যা করার আমায় করতে হবে, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় আজ বুদ্ধি করে হিরের আংটিটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এলগিন

রোডের বাড়িটা থেকে পাওয়া সেই আংটি। পটেলভাইয়ের কাছে বিক্রি করতে চাই। আংটিটা আমি এ ক'দিন লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার দেরাজের ভেতর।

আজ দুপুরের পর থেকে বাড়ির যা পরিবেশ, তাতে আর নিজের কাছে এটা রাখা ঠিক হবে না। বাড়ির কথা মনে হওয়া মাত্রই আমার মুখটা তেতো হয়ে গেল। নাহ, আজ যা হয়েছে, এর পর বাড়িতে আমার আর থাকা উচিত না। পটেলভাই যদি আংটিটা কিনে নেন, তা হলে আমি বেঁচে যাব।

কথা শেষ করে পটেলভাই মোবাইল সেটটা দেশমুখের দিকে এগিয়ে দিতেই ফাঁক পেয়ে আমি বললাম— আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। একটু আলাদা বলতে চাই।

বলো।

পটেলভাইয়ের ইশারায় দেশমুখ বেরিয়ে যেতেই আমি বললাম— একটা জিনিস আপনাকে দেখাতে এনেছি। সেটা বিক্রি করতে চাই।

—কী জিনিস, গডব্রাদার?

একটা অ্যান্টিক ডায়মন্ড। খুব রেয়ার পিস।

কই দেখি।

পকেট থেকে হিরের আংটিটা বের করে দিতেই পটেলভাইয়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন— সত্যিই রেয়ার! পেলে কোথায়?

কোথায় পেয়েছি, বললাম। শুনে পটেলভাই বললেন—আশ্চর্য! ঠিক এই রকমই একটা পিস আমি খুঁজছিলাম। পাঁচ- সাড়ে পাঁচ ক্যারাটের। আমার এক ক্লায়েন্ট আছেন ফ্রান্সের লিওঁ শহরে। মাস তিনেক পর তাঁর মেয়ের বিয়ে। মেয়েকে উনি একটা খুব দামি হিরে উপহার দিতে চান। প্রাইস ডাজ নট ম্যাটার। এই পিসটা তাঁকে গছানো যাবে। চার-পাঁচশো বছরের পুরোনো বলে মনে হচ্ছে। এর পিছনে কি কোনও হিস্ট্রি আছে, তুমি জানো?

চিঠির কথা বললাম। লেসলি ওয়াটসন আর কলিঙ্গরাজ আঙ্খারিদেবের কথাও। শুনে পটেলভাই বললেন— পারফেক্টলি এই জিনিসই আমার দরকার ছিল। এখন দাম বলো, গডব্রাদার। ফরটি ল্যাকস। উইল ইট বি অলরাইট?

পটেলভাই এই ক'দিন আগে ইয়াকুবের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে দরকষাকষি করা যায় না। বললাম— হ্যাঁ।

দামটা নেবে কীভাবে? ক্যাশ? অত টাকা তো এখানে তোমায় দিতে পারব না। এক কাজ করো, দেশমুখের কাছ থেকে লাখ পাঁচেক নিয়ে যাও। বাকি টাকা তুমি যখন মুম্বই যাবে, তখন নিও। বলেই হাসলেন পটেলভাই— এই টাকাটার জন্যও যদি তোমায় মুম্বই নিয়ে যেতে পারি, সেটাই আমার লাভ।

...মিনিট পনেরো পর ট্যাক্সিতে উঠে বাড়ির দিকে ফেরার সময় পটেলভাইয়ের কথাই বার বার মনে হতে লাগল। অদ্ভুত জীবন! টাকার গদির ওপরে বসে আছেন। কিন্তু মনে কোনও শান্তি নেই। এই বিশাল উপার্জন কার হাতে দিয়ে যাবেন, সেই চিন্তায় ওঁর ঘুম হচ্ছে না। আজ যদি আমি সত্যি কথাটা বলে দিতাম, আর বছর দুয়েকের মধ্যে আপনি ফের নিঃস্ব হয়ে যাবেন, তা হলে? উনি কি সহ্য করতে পারতেন? না, পারতেন না। হয়তো বলতেন আমার যা আছে, বাকি জীবনটায় দু'হাতে বিলিয়ে দিলেও শেষ হবে না।

রেসকোর্সের কাছে এসে হঠাৎ মনে হল, একটু আগে পটেলভাই কেন আমার কাছে জানতে চাইলেন, দীপাকে আমার কেমন লেগেছে? উনি কি অন্য কিছু ভাবছেন? কেন তাকেই বা শুনিয়ে দিলেন, এমন একজনের হাতে দীপা ও বিজনেসের ভার তুলে দিতে চান— যে দুটোই সামলাতে পারবে? আমাকে মুম্বই নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাই বা ওঁর মধ্যে এ বার এত প্রবল কেন? প্রশ্নের পিছনে প্রশ্ন এসে জড়ো হতে লাগল। আমাকে ওঁর বিজনেসে পার্টনার করতে চান। তার পিছনেও কি অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে? নাহ, এ সব নিয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে। আমার যা রাশি আর লগ্ন, তাতে পটেলভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ বাধার কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্য কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি করি। উনি আমার কোনও ক্ষতিই করতে পারেন না। এই যে নিশ্চিন্ত মনে ওঁর হাতে হিরেটা তুলে দিয়ে এলাম, উনি কখনও সেটা অস্বীকার করবেন না। হোটেলে আসার সময় আমি অস্বস্তিতেই ছিলাম, হিরে বিক্রির কথাটা ওঁর কাছে তুলব কী করে? কিন্তু সেই পরিস্থিতিটা উনিই তৈরি করে দিলেন, দত্ত জুয়েলার্সে আমার মালিকানা আছে কি না সেই প্রসঙ্গটা তুলে। আশ্চর্য, পটেলভাই জানতেও চাইলেন না, হিরেটা আমি বিক্রি করছি কেন? বুদ্ধিমান লোক। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হয়তো ঠিক আন্দাজ করে নিয়েছেন। প্রতিবার দেখা হলে বাবার কথা উনি জানতে চান। আজ কিন্তু চাইলেন না।

মেট্রো সিনেমা পেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে পৌঁছনো মাত্র মনটা ভার হয়ে গেল। বাড়িতে যেতেই ইচ্ছে করছে না। এ রকম কখনও হয়নি। হঠাৎই মনে হল, এই রাতে বাড়িতে গিয়ে যদি দেখি, আমার জন্য বাড়ির দরজা বন্ধ, তা হলে আমি কোথায় যাব? কোথায় গিয়ে থাকব? এই শহরে লতাপাতায় আমাদের অনেক আত্মীয়। কিন্তু বাবার সঙ্গে সবারই এমন সম্পর্ক, কোথাও যাওয়া যাবে না। আমার বন্ধু বলতে এক ওই টোটা। ও ছাড়া আর কেউ নেই, যার কাছে গিয়ে বলতে পারি, আজ রাত্তিরটুকু তোদের বাড়ি থাকতে দিবি? কিন্তু টোটাও মনে হয়, আমার কাছ থেকে দূরে ,সরে গেল। আমি কি একা হয়ে যাচ্ছি? কথাটা মনে হতেই বেশ ভয় ভয় করতে লাগল।

দুপুরের পর এই প্রথম আমার মনে হল, ওই কথাটা মাকে তখন না বললেও পারতাম। মা আমাকে বলল— লালিকে আমি ও বাড়ির বউ করে আনব। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। বল, তুই রাজি? তখন মা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। সেই চাউনিতে ছিল আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু লালির কথা শুনে তখন আমার কী যে হল, নির্বোধের মতো বলে ফেললাম— তা হয় না, মা। উত্তরটা শুনে মা দপ্ করে নিভে গেল। মায়ের চোখের কোল ভরে উঠল জলে। বিড়বিড় করে মা শুধু বলল— শত্তুর...শত্তুর পেটে ধরেছিলাম। তার পর আর কিছু না বলে মা নিচে নেমে গেছিল।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে মায়ের ওই কান্নাভেজা মুখটাই আমাকে কষ্ট দিতে লাগল। খুব অন্যায় করেছি। মাকে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমি তো টোটার মতোই হয়ে গেলাম। একটা মেয়েকে পাওয়ার জন্য টোটা মা আর বোনকে ছেড়ে ঘরজামাই হতেও রাজি হয়ে গেছে। আর আমি? একটা মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে না চেয়ে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আত্মীয়স্বজনেরা শুনলে আড়ালে হাসাহাসি করবে মাকে নিয়ে। ছেলে ছেলে করে গর্ব করতিস, সেই ছেলে তো তোকে পুঁছলও না। এটাই মায়ের পক্ষে ভয়ানক লজ্জার হবে।

ভেবেই পেলাম না, আমি এত বদলে গেলাম কী করে? স্কুলে পড়ার সময় টোটা আর আমি এক বার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাদের মাকে কোনও দিন কষ্ট দেব না। কী কারণে প্রতিজ্ঞাটা করেছিলাম, সেটাও মনে আছে। বাংলা স্যার সে দিন পড়িয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। মাকে দেওয়া কথা রাখতে এক বার না কি বিদ্যাসাগর মশাই সাঁতরে দামোদর নদ পেরিয়ে বাড়িতে যান। বাংলা স্যার বলেছিলেন, মাকে যে ছেলে ভক্তি করে না, তার জীবনে কিছুই হবে না। তোমরা সবাই মাকে ভক্তি করবে। স্যারের কথা শুনে আমি আর টোটা সে দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কোনও কাজে যাওয়ার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তার পর যাব। এত দিন সেটা মেনেও এসেছি। আমরা দু'জনেই তা ভুলে গেলাম কী করে?

—স্যার, এ বার কোন দিকে যাব?

ড্রাইভারের গলা শুনে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, গণেশ টকির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। বললাম— ডান দিকে। একটু এগিয়ে বড় বড় থামওয়ালা বাড়িটার সামনে রেখে দেবেন।

আর তখনই মনে পড়ল, আমার সঙ্গে একটা ক্যারি ব্যাগে পাঁচ লাখ টাকা রয়েছে। পাছে ট্যাক্সি থেকে নামার সময় ভুলে যাই, টাকার ব্যাগটা কোলের কাছে তুলে নিলাম। এই টাকার কথা বাড়ির কাউকে বলা যাবে না। কেননা, আমার না। আসল মালিক মা। ব্যাগটা মাকেই দিয়ে দেওয়া উচিত। এলগিন রোডের বাড়ির

দরজা জানালা আর ইট বিক্রির টাকাটা সে দিন মাকে দিতে গেছিলাম। মা নিতে চায়নি। আমার কাছে রেখে দিতে বলেছিল। সেই টাকা রয়ে গেছে আমার দেরাজে। এখন কাজে লাগবে।

ট্রাম লাইনের কাছেই ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। বাড়িতে ঢুকে দেখি, বেশির ভাগ আলোই নেভানো। এমনটা কখনও হয় না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখলাম মায়ের ঘর অন্ধকার। বারান্দার ও পাশে রান্নাঘরে বউদি আর মতির মা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। পাছে বউদির চোখে পড়ে যাই, তাড়াতাড়ি তিনতলায় উঠে এলাম। টাকার ব্যাগটা কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার। আমার নিজের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। মা এক বার করে দিতে চেয়েছিল। আমি গা করিনি। ইস, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকলে এই টাকা স্বচ্ছন্দে সেখানে রাখা যেত।

বাইরে থেকে এলে চান করাটা আমার অনেক দিনের অভ্যেস। কিন্তু আজ চানঘরে ঢুকতেই ইচ্ছে করল না। বিকেলের দিকে জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে এখন বেশ ঠান্ডা। চান না করলেও চলবে। পোশাক বদলানোর পরই মনে হল, ঘরে আলো জ্বলছে দেখলে বউদি নিচ থেকে উঠে আসতে পারে। তাই চট করে আলোটা নিভিয়ে দিলাম। বউদির সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছিল না।

—ভাই, তুমি কোথায়?

এই ভয়টাই আমি করেছিলাম। বউদি উঠে এসেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালিয়ে বললাম— এখানে।

ঘরের ভেতর ঢুকে বউদি বলল— এ কী, ঘর অন্ধকার করে রেখেছ কেন, ভাই? মন খারাপ না কি?

মুখ হচ্ছে মনের আয়না। হয়তো আমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, মন ভাল নেই। বউদি সবে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সাংসারিক জটিলতার মধ্যে টেনে লাভ নেই। মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললাম— না, না। মন খারাপ হবে কেন?

—তা হলে তোমার কানে কিছুই যায়নি।

—কী হয়েছে বুলবুল?

—থাক তোমার শুনে কাজ নেই। তুমি কষ্ট পাবে। তোমার দাদা তো শোনার পর রেগে ফোন করতে যাচ্ছিল ও বাড়িতে। বাবা শেষ পর্যন্ত থামান। মেয়েটা যে এত খারাপ, ভাবতেও পারিনি। মা অবশ্য প্রথম থেকেই আপত্তি তুলেছিল। দেখলাম, মা অনেক বেশি লোক চেনে। কী হত বলো তো, ওই মেয়ে যদি ও বাড়িতে এসে উঠত?

—ও যা বলেছে, সেটা কিন্তু এখনও আমায় বলোনি।

—বলেছে... তোমার না কি এক পয়সাও রোজগার করার মুরোদ নেই। বাবা

আর দাদার ঘাড়ে বসে খাচ্ছ। তোমার মতো ছেলের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসার চেয়ে গঙ্গায় ডুবে মরা অনেক ভাল।

শুনেই বুঝলাম, কথাগুলো বলে গেছে লালি। ক'দিন আগে আমায় ও বলেছিল, আমাকে পাওয়ার জন্য বুলবুল না কি মা সন্তোষীর পুজো শুরু করেছে। আমাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না। ওই কথাগুলো সত্যি, না আজকের কথা? ওর কোনও কথাই অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না। এত বড় মিথ্যেবাদী বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। শুনে তাই গুরুত্বই দিলাম না। বউদিকে বললাম— এই কথাগুলো কে এসে বলে গেল? নিশ্চয়ই লালি?

—না গো, লালি না। আজ সকালে তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরই মায়ের কাছে এসেছিল কমলা ঘটকি। ও-ই বলে গেল। শুনে তো মা ওকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিল। টুম্পাইয়ের জন্য এমন মেয়ে আনব, তার পায়ে বুলবুল গড়াগড়ি খাবে।

—কিন্তু বুলবুল তো ঠিকই বলেছে বউদি।

কী বলছ তুমি, ভাই? বিস্ময় ঠিকরে বেরল বউদির গলা থেকে—

বুলবুল ঠিকই বলেছে? তোমার যা আছে, জানো? তুমি তিন বার ওদের কিনে ফের বেচে দিতে পারো।

ও সব কথা থাক, বউদি। আমি জানি, আমার নিজের কিছু নেই। কয়েক পা এগিয়ে আমার কাছে এসে বউদি বলল, তোমার কী হয়েছে, ভাই? এমন কথা বলছ?

বললাম— কেন বলব না, বলো? আজ বুলবুল বলছে, কাল আরও পাঁচজন বলতে শুরু করবে। কার মুখ তুমি চাপা দেবে? আমার কি সত্যিই রোজগার আছে? বাবার ব্যবসায় আমি বেগার খাটছি। এ বার বোধহয় সেই সময়টা এসে গেছে। আমার নিজের রাস্তা আমার নিজেকেই দেখে নিতে হবে।

—এ সব বোলো না, ভাই লক্ষ্মীটি। শুনলে বাবা আর মা কষ্ট পাবে। আজ দুপুরে কী হয়েছে, কে জানে? মা সেই যে চুপ করে শুয়ে আছে, একটা কুটোও মুখে দেয়নি। অত করে বললাম, কিচ্ছু খেল না।

শুনে আমার বুকটা হু হু করে উঠল। বউদি না জানুক, আমি তো জানি, কার ওপর রাগ করে মা আজ খায়নি। বললাম— বাবা জানে?

—সে আর এক অশান্তি। হামিদ এসে কী যেন বলে গেছে বাবাকে। তারপর থেকে উনি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

—কী বলে গেছে হামিদ?

—এলগিন রোডের বাড়ি থেকে না কি শুধু নীলা পাওয়া যায়নি। তার সঙ্গে দুটো হিরের আংটিও ছিল। দুপুরে খেতে বসে তোমার দাদাকে বাবা বলছিল, তুমি না কি হিরের কথা চেপে গেছ। তোমার দাদা অনেক করে বলল, টুম্পাই মিথ্যে কথা

বলার ছেলে নয়। বাবা মানতেই চাইছিল না। সত্যিই গয়নার বাক্সে হিরের আংটি ছিল না কি ভাই?

হিরের আংটি এখন পটেলভাইয়ের জিম্মায়। স্বীকার করলেও আমি আর ফেরত আনতে পারব না। কিছু টাকা নিয়ে ফেলেছি। কী হল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— কই তা না তো?

বলার পরই খেয়াল হল, মাই গড, এ আমি কী করলাম? বারোটা বছর ধরে একটা ব্রত পালন করে, সেটা ভেঙে ফেললাম? শেষ পর্যন্ত আমিও মিথ্যে কথা বললাম!

ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে পটেলভাই আমাকে বললেন— কাল রাতে তুমি ঘুমোওনি না কি গডব্রাদার?

বললাম— না। ভাল ঘুম হয়নি।

—মায়ের কথা মনে হচ্ছিল বুঝি?

—ঠিকই ধরেছেন। আসলে বাড়ির বাইরে কখনও থাকিনি।

—তুমি যে মুম্বইয়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছ, তোমার মা জানেন?

—না। বলিনি। বললে আসতে দিতেন না। আশা করি আপনিও আমাদের বাড়িতে এখন কিছু জানাবেন না।

—কাউকেই কিছু বলোনি?

—না।

—আমিও তোমার মতোই বাড়িতে কিছু না বলে এক দিন পালিয়ে গেছিলাম মুম্বইয়ে। তবে তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য হচ্ছে, আমার বাড়িতে সে দিন বলেছিল, আপদ গেছে। আর তোমার বাড়িতে আজ হইচই হবে। কথাগুলো বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন পটেলভাই। তার পর ফের বললেন— মুম্বই পৌঁছতে এখনও ঘণ্টা তিনেক লাগবে। ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো।

পটেলভাই নিজের সিটে বসে পড়লেন। জীবনে কোনও দিন কোনও প্লেনের ভেতর ঢুকিনি। পটেলভাইয়ের জন্য সেই সুযোগটা পেয়ে গেলাম। ছোট্ট টেন সিটার প্লেন। খুব সাজানো গোছানো। প্রথম ঢুকেই মনে হয়েছিল, ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটের মতো। রেস্ট নেওয়ার জন্য ডিভান, খাবার জন্য ডাইনিং টেবল— সব আছে। প্লেনে উঠেই দীপা আমার পিছনের সিটে বসেছে। সামনের দিকে রয়েছেন পটেলভাই। আর মাঝখানে আমি। আমরা তিনজন ছাড়াও আর একজন মহিলা আছেন। মনে হয়, এদের এয়ারহোস্টেস। তিনি ব্রেকফাস্টের আয়োজন করছেন। কাল রাত এগারোটার সময়ে পটেলভাইকে ফোন করে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম, ওঁর সঙ্গে যদি মুম্বই যাই,

তা হলে ক'টার সময় আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে? তখন উনি বলেন, সাড়ে ছটার মধ্যে পৌঁছলে ভাল হয়। ভোর পাঁচটার সময়ই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। মাত্র একটা কিটব্যাগ নিয়ে। কয়েকটা জামা-প্যান্ট, জ্যোতিষচর্চা করার বই, আর হঠাৎ পেয়ে যাওয়া টাকাগুলো ছাড়া আর কিছুই নিইনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার। এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন এখনও টেক অফ করেনি। ককপিটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পটেলভাই কথা বলছিলেন পাইলটের সঙ্গে। তখন শুনলাম, এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল না কি এখনও সিগন্যাল দেয়নি। ফ্লাইট টাইম পেলে তবে প্লেন উড়বে। তাই কলকাতার সঙ্গে নাড়ির টান আমার এখনও কাটেনি। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। বাড়িতে এখনও মা, দাদা আর বউদি জানতে পারেনি, আমি উধাও হয়েছি। ওরা জানবে আর ঘণ্টা খানেক পর। বউদি বা মতির মা যখন জলখাবার নিয়ে ওপরে উঠবে তখন আমায় দেখতে না পেলে। তার পর সত্যিই কি বাড়িতে হইচই হবে?

হোক, না হোক, আমার কোনও ইচ্ছে নেই, পিছন দিকে ফিরে তাকানোর। আজ থেকেই আমার নতুন জীবন শুরু হয়ে যাবে। জানলার ধারে বসেছি। রানওয়ে আর টারম্যাক দেখতে পাচ্ছি। একটা প্লেন এসে নামল। পটেলভাইয়ের তুলনায় অনেক বড়। একটা সিঁড়ি গিয়ে দাঁড়াল প্লেনের খোলার কাছে। তার পর দরজা খুলে যেতেই সিঁড়ি দিয়ে বেশ কিছু লোক নেমে এলেন। এঁরা দু'তিন ঘণ্টা আগেও নিশ্চয়ই অন্য কোনও শহরে ছিলেন। প্লেনের জন্য কত কম সময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়! ট্রেনে যদি মুম্বই যেতাম, তা হলে এক-দেড় দিন তো লাগতই। সেখানে ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যেই আমরা পটেলভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছে যাব।

কার যেন মোবাইল সেটে ফোন এসেছে। রিং টোনটা থেমে যাওয়ার পর মনে হল, আরে... এটা তো আমারই ফোন। দুদিন আগে রিং টোন বদলে ছিলাম। সেটা মনে ছিল না। পকেট থেকে সেটটা বার করে মিসড কল-এর নাম্বারটা দেখেই ইরেজ করে ফেললাম। দাদার নাম্বার। তার মানে দাদা আমাকে চেষ্টা করছে ফোনে ধরার। না, বাড়ির কারও ফোন এলে ধরবই না। মোবাইল সেটটা বন্ধ করে ফের পকেটে রেখে দিলাম। ভাগ্যিস, সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে থাকার সময় একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। সময় কাটানোর জন্য সেটাই চোখের সামনে মেলে ধরলাম। মুম্বইয়ে বাংলা কাগজ দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না কে জানে? প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে ভেতরের পৃষ্ঠা খুলতেই হঠাৎ একটা খবরের দিকে নজর গেল। 'পোস্তা থানার ও সি সাসপেন্ড'। তাড়াতাড়ি খবরটা পড়তে শুরু করলাম। এক মহিলাকে ভয় দেখিয়ে নিয়মিত শয্যাসঙ্গিনী করার অভিযোগে পোস্তা থানার ও সি প্রকাশ বিশ্বাসকে

সাসপেন্ড করা হয়েছে। অলকা হাজরা নামে এক মহিলা এই অভিযোগটা করেছেন।

প্রকাশবাবুকে যা বলেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই হল। হাতে স্পষ্ট ইন্ডিকেশন ছিল। কলঙ্ক, বদনাম, পারিবারিক জীবনে দুর্যোগ। ইস, ভদ্রলোককে পরে আমার কাছে আসতে বলেছিলাম। এলেন না। মানুষের এক এক সময় কী যে হয়! খারাপ গ্রহ টেনে নিয়ে যায় কুকাজের দিকে। তখন লোকে বুঝতে পারে না। ফল ভোগ করে অনেক পরে। তখন আপসোসের সীমা থাকে না। প্রকাশবাবুও এখন নিশ্চয়ই হাত কামড়াচ্ছেন।

খবরে দেখলাম, অলকা হাজরার সঙ্গে প্রকাশবাবুর সম্পর্ক প্রায় দু'-বছরের। সম্পর্কটা কখনও এক তরফা হতে পারে না। ঘনিষ্ঠতার সময় উনি বুঝতেও পারেননি, পরিণতিটা এ রকম দাঁড়াবে। আমার কাছে আগে এলে হয়তো ওঁকে আটকাতে পারতাম না কিন্তু সাবধান করে দিতে পারতাম। এটাই জ্যোতিষীর কাজ।

বিবেকানন্দ রোডে আমাদের শো-রুমে জ্যোতিষচর্চা করার সময়, এ রকম আর একটা কেস চোখে পড়েছিল। সে দিন আমার কাছে এসেছিলেন স্বামী-স্ত্রী দু'জন। বেনেটোলার দিকে থাকেন। দু'জনেরই বয়স চল্লিশের নিচে। হরোস্কোপে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্ত্রীর চরিত্র ভাল নয়, কিন্তু স্বামী খুব ভালবাসেন ভদ্রমহিলাকে। গণনা করার সময় দেখলাম, স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, স্বামী ভদ্রলোকের মৃত্যুযোগ আছে বছর দেড়েকের মধ্যে। অস্বাভাবিক মৃত্যু। ষড়যন্ত্রে স্ত্রীর যোগসাজশ থাকতেও পারে। ঘেন্নায় আমি ভদ্রমহিলার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিলাম না। ভদ্রলোককে পরে এক বার আসতে বলেছিলাম। উনি আসেন। তখন ওঁকে সাবধান করে দিই, স্ত্রীর দিকে নজর দিন। এক সপ্তাহ পরে ভদ্রলোক নিজে এসে আমাকে বলে গিয়েছিলেন— আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার অনুমানই ঠিক। এ বার দয়া করে বলুন, স্ত্রীকে নিয়ে করবটা কী? তখন ওঁকে টোটার কাছে পাঠিয়েছিলাম। ডিভোর্স মামলার জন্য।

কুড়ি

বেলভিউ নার্সিংহোমের গেটে কাচের দরজা ঠেলতেই প্রথম যাকে চোখে পড়ল, সে টোটা। ওকে না দেখার ভান করে লাউঞ্জে ঢুকে যাচ্ছিলাম, এমন সময় টোটা এগিয়ে এসে বলল— টুম্পাই, তুই কোথায় ছিলি রে?

ওর ওপর রাগ দেখানোর সময় এটা নয়। মা কেমন আছে জানি না। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক মানে গুরুতর ব্যাপার। রাগ আর বিরক্তি চেপে বললাম— আলিপুরে। মায়ের ঠিক কী হয়েছে রে? মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কাল রাতে বউদির সামনে একটা মিথ্যে কথা বলেছি। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে হিরে পাওয়া নিয়ে।

গত বারো বছরের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার মিথ্যে কথা বললাম। নিজেই

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মিথ্যে কথাটা বলার জন্য আমার মধ্যে কোনও অনুতাপ হল না দেখে। টোটা বলল— ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলিনি। আমি একটু পরে এসেছি। তোর দাদা বলতে পারবে, ঠিক কী হয়েছে।

এই হচ্ছে আসল টোটা। ভেবেচিন্তে, মেপে কথা বলে। এই টোটাকেই আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। টোটার পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, লাল টি শার্ট। খুব হ্যান্ডসাম লাগছে ওকে দেখে। শেভ করা মুখ। ওর শরীর থেকে ডিওডোরেন্টের গন্ধ ভেসে আসছে। নিজের সম্পর্কে এতটা সচেতন ওকে আগে কখনও দেখিনি। পাঁচ-ছ'দিন বলার পর ও এক দিন দাড়ি কামাত। মানুষ প্রেমে পড়লে বোধহয় নিজের সম্পর্কে আর উদাসীন থাকতে পারে না।

টোটার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এ দিক ও দিক তাকাতে লাগলাম। এক কোণে বাবা বসে আছে। পাশে বিষ্ণুকাকা দাঁড়িয়ে। বাবার পাশে বসে লালি। পরনে সাধারণ একটা সালোয়ার কামিজ। বোধহয় এই পোশাকেই বাড়িতে ছিল। খবর পেয়ে পোশাক বদলানোর সময় পায়নি। ওকে দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। মায়ের অসুস্থতা আর আমার একগুঁয়েমির মাঝে এই মেয়েটা। কী মলিন লাগছে লালির মুখ! কাল যদি মায়ের অনুরোধ মেনে নিতাম, তা হলে আজ এখন আমাদের সবাইকে এই নার্সিংহোমে ছুটে আসতে হত না।

বাড়ির কেউ কি জানে? মায়ের অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণটা? মা যা চাপা স্বভাবের তাতে কাউকে বলেছে বলে মনে হয় না। কী জানি? বলতেও পারে। যদি বলে থাকে আর মায়ের খারাপ কিছু হয়ে যায়, তা হলে সারাজীবন আমাকে সবাই দোষারোপ করবে। মনটা খুব ছটফট করতে লাগল। ফোনে বউদি অবশ্য আমাকে কিছু বলেনি। বাবা জানলেও আমাকে বলবে না। এক বলতে পারে লালি। ওর পেটে কোনও কথা চাপা থাকে না। লালিকে এখন ডাকা যাবে না। বাবা তা হলে চটে যাবে। ঠিক করে রাখলাম, লালিকে একটু আলাদা পেলেই প্রসঙ্গটা তুলব।

এই ক'দিন আগেই বউদির জন্য এই নার্সিংহোমে সকাল বিকাল পড়ে থেকেছি। এত শিগগির আবার আসতে হবে, কে জানত? সে বার আমিই বউদির জন্য ছোটাছুটি করেছি। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওষুধ কিনতে দৌড়েছি। আর আজ মনে হচ্ছে, পরিবার থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। না হলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি কেন? কথাটা মনে হতেই খারাপ লাগল।

রিসেপশনে গিয়ে মায়ের সম্পর্কে খোঁজ নেব কি না ভাবছি, এমন সময় দেখি লিফটের দিক থেকে দাদা হেঁটে আসছে। মুখটা শুকিয়ে গেছে। আমাকে দেখতে পেল কি না ঠিক বুঝতে পারলাম না। লাউঞ্জে এসে দাঁড়াতেই দাদাকে সবাই ঘিরে দাঁড়াল। দাদা কোনও রকমে বলল— ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে এলাম। চারটে

টেস্ট করে ফেলেছে। এখন কী যেন করবে বলছে।

কথাগুলো বলে দাদা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছার ভান করতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। আমার গালে কে যেন ঠাস করে একটা চড় মারল। তার মানে মায়ের অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার কোনও আশার কথা শোনায়নি। দাদা রেখে ঢেকে বলল। কান্না জিনিসটা খুব ছোঁয়াচে। লালি চোখের জল মুছতে শুরু করেছে। দাদাকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখে বাবা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। আমি চোখের জল আটকানোর জন্য বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মানুষ এই রকম অবস্থায় পড়লে মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়ে। অথবা জ্যোতিষীর কাছে ছোটে। আমার কাছে প্রায়ই এই ধরনের আশঙ্কা নিয়ে লোক আসে। গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে বলে দিই, কী হতে যাচ্ছে। মৃত্যু নিয়ে কখনও আমি ভবিষ্যদ্বাণী করি না। করা উচিত নয় বলে। জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ে— এই তিনটে মানুষের জীবনে ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তবুও নার্সিংহোমের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে ক্যালকুলেশন করতে লাগলাম। মায়ের হরোস্কোপটা গুপ্তধন পাওয়ার দিনই এক বার দেখেছি। প্ল্যানেটরি পজিশনগুলো ঠিকঠাক মনে আছে। নাহ, এখনই মায়ের মৃত্যুযোগ নেই। দুপুর তিনটে পাঁচ পর্যন্ত আমাদের উদ্বেগের মধ্যে রাখবে। তার পর চোখ মেলে তাকাবে। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বিষ্টুকাকা দাদাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে— বুবাই, মনকে শক্ত করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। শুনে দাদা আরও ফোঁপাতে লাগল। এই প্রথম দাদার ওপর আমার রাগ হল। একটু পূর্ণ বয়স্ক লোক, এত ভেঙে পড়বে কেন? দাদা অবশ্য কোনও কালেই শক্ত মনের লোক না। কী আর করা যাবে? বাবার ছায়ায় পড়ে থাকলে এ রকমই হবে। ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে কফিশপে গিয়ে বসা ভাল। সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি। মারাত্মক খিদে পেয়েছে। চুপচাপ সরে এসে কফিশপে ঢুকলাম।

কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসতেই দেখি, টোটা আমায় খুঁজছে। হাত তুলে ওকে কাছে ডেকে নিয়ে বললাম— আমি স্যান্ডউইচ নিচ্ছি। তুই কিছু নিবি?

চেয়ারে বসে টোটা বলল— না রে। কোর্টে যাওয়ার জন্য খেয়েদেয়ে তৈরি হয়েছিলাম। এমন সময় বোন ফোন করে জানাল, মাসিমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে।

—লালি তখন আমাদের বাড়িতে ছিল?

—ও তো কাল থেকেই তোদের বাড়িতে। সন্ধেবেলায় তোদের বাড়ি গেছিল। মাসিমা ওকে ফিরতে দেয়নি। কেন, কাল রাতে তুই বাড়ি ছিলি না?

—ছিলাম। রাত দশটার সময় ফিরে আর নিচে নামিনি। পটেলভাই

কলকাতায়। ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম তাজ বেঙ্গলে।

—আজ সকালে উঠে তুই কোথায় গেছিলি রে, টুম্পাই?

—বললাম তো আলিপুরে...তাজ বেঙ্গলে। যাক গে, তোর খবর কী বল?

—আমার আবার খবর কী? চলছে। গোয়াবাগানের বাড়িটা পেয়ে গেলাম। কেনার লোকও পেয়ে গেছি। ভাবছি, পাথুরেঘাটার বাড়িটাও বিক্রি করে দেব। লাখ ষাটেক পাওয়া যাবে। কথাবার্তা চলছে এক মারোয়াড়ির সঙ্গে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম— বসতবাড়ি বিক্রি করে দিবি?

—কী হবে অত বড় বাড়ি রেখে? মেনটেন করতে পারছি না। দেখেছিসই তো বাড়িটার অবস্থা। ভেঙে নষ্ট হওয়ার থেকে এখনই ঝেড়ে দেওয়া ভাল। পরে আর দাম পাওয়া যাবে না।

—মাসিমা আর লালির কী হবে?

—খুব শিগগির লালির বিয়ে টিয়ে দিতে হবে। ঘটকি তো মায়ের পেছনে লেগে রয়েছে। ওই যে রে, বড়াল বাড়ির সমীর বলে ছেলেটা। তোদের ক্লাবে যায়। সেই ছেলেটার সঙ্গে বোনের সম্বন্ধ করার জন্য ঘটকি মায়ের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আমি ভাবছি, মন্দ কী। মায়ের অবশ্য মত নেই।

সমীর বড়াল! মাই গড। ওর সঙ্গে লালির বিয়ে? দপ করে মাথায় রাগ উঠে গেল। টোটা ভাবছেটা কী? নিজের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য যারতার হাতে গছিয়ে দেবে লালিকে? দিক দেখি। সমীরকে আমি খুব ভালো করে চিনি। আমার বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছে ক্লাবে। ওদের বাড়ির নাড়িনক্ষত্রও আমি জানি। ওদের কোনও ভাই মানুষ না। সব অশিক্ষিত। টিপিক্যাল বেনে বাড়ির ছেলে। বড়ালরা আমার বউদিদের কোনও এক তরফের আত্মীয়। বউদির মুখে ওদের ফ্যামিলির কথা শুনেছি বলেই সমীরের সঙ্গে আমি কথা বলি না। ও ভীষণ হিংসে করে আমায়। টোটাদের বাড়ি আমি যাই বলে সমীর ক্লাবে মাঝেমধ্যেই আড়ালে আমার নামে টিপ্পনি কাটে। সেটা লালিকে নিয়ে। ও ইচ্ছে করেই ঘটকিকে টোটাদের বাড়ি পাঠিয়েছে। টেক্কা দেবে আমাকে। মহা শয়তান। ফেলে ছড়িয়ে এখনও ওদের যা সম্পত্তি আছে, তা যথেষ্ট। কিন্তু লালির পাশে সমীর— ভাবতে পারছি না। শয়তানটা একেবারে শেষ করে দেবে লালির জীবনটাকে। আমি থাকতে সেটা হতে দেব না। আমি চুপ করে আছি দেখে টোটা বলল— কী করা যায় বল তো টুম্পাই?

—কী ব্যাপারে?

—এই... বোনের বিয়ের ব্যাপারে। রাজি হয়ে যাই, কী বল? ছেলেটা অবশ্য লেখাপড়া তেমন করেনি। মা এখানেই খুঁতখুঁত করছে।

—লালি কী বলছে?

—ওর আর মত কী? আমরা যেখানে দেব, সেখানেই রাজি হয়ে যাবে। বোনকে তো তুই জানিস। আমরা বললে এ বিয়েতে অমত করবে না।

—তবুও ওকে তোদের জিজ্ঞেস করা উচিত।

কথাটা টোটার মনঃপুত হল না। চুপ করে গেল। এই সময় বেয়ারা স্যান্ডউইচের প্লেটটা টেবলের ওপর রাখতেই বললাম— শুনলাম, তোরও না কি বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে? আমাকে তো কিছু জানাসনি।

—কে বলল তোকে? লালি বুঝি?

—না। বাড়িতে শুনলাম। গিরিজাবাবু না কি তোকে ঘরজামাই করে রাখতে চেয়েছেন।

—বলেছেন বটে, আমি এখনও রাজি হইনি। ভেবে দেখি। কতকগুলো সুবিধা আছে। আবার অসুবিধাও।

—লালির না হয় বিয়ে দিয়ে দিবি। মাসিমার কী হবে?

—সে ব্যবস্থাও উনি করে দিচ্ছেন। বৃন্দাবনে ওঁদের তিন-চারটে বাড়ি আছে। একটা বাড়ি আমার নামে লিখে দিচ্ছেন। মা গিয়ে থাকবে সেখানে। শেষ জীবনটা আর সংসার না-ই বা করল। থাক ঠাকুর দেবতা নিয়ে।

টোটার উত্তরগুলো আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও সেটা বুঝতে পারছে। চোখ সরিয়ে নিল। আমার পরামর্শ ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত ও নেয়নি। এই সব বড় বড় ডিসিশন ও নিয়ে ফেলল আমার সঙ্গে কথা না বলে, এই অপরাধবোধ থেকেই এখন আর আমার দিকে তাকাতে পারছে না। বরাবর দেখিছি, ও যখন টেনশনে পড়ে তখন থুতনির কাছটায় চুলকোয়। সেটা শুরু করার সঙ্গেসঙ্গে আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। ওর আঙুলে হিরের আংটিটা জ্বলজ্বল করছে। যে ভাবে হোক, ওটা আমায় খুলে নিতে হবে।

স্যান্ডউইচ মুখে দিয়ে নিশ্চিন্তে চিবোতে লাগলাম। টোটার বিয়েটা ভেস্তে দিতে হবে। সমীর উল্লুকটার সঙ্গে লালির বিয়েটাও। টোটা যেমন আগে ছিল, তেমনই পুনর্মূষিকভব হয়ে যাবে। সমাধান করে ফেলেছি, ব্যস। টোটার প্ল্যানেটরি পজিশনটা চিন্তা করতে লাগলাম। হিরের আংটি খুলে নিলে শুক্রের প্রভাব কমে যাবে। টোটার মধ্যে ফের আধ্যাত্মিক ভাবনা প্রবল হবে। বুলবুলের দিক থেকে ও মুখ ফিরিয়ে নেবে। গিরিজাবাবুর কোনও কথাই ও আর শুনতে চাইবে না। হঠাৎ বললাম— তোর আংটিটা খুলে দে তো রে।

টোটা জিজ্ঞেস করল— হঠাৎ আংটিটার দিকে তোর নজর গেল?

—মনে হচ্ছে, হিরেটার ভেতর গন্ডগোল আছে। পরার পর থেকে ফল পাচ্ছিস?

—মনে হয়। এটা পরার পর থেকে অনেকগুলো সুযোগ এসে গেল। তুই ঠিক বলেছিলি আমাকে। কথাগুলো বলতে বলতে আংটিটা খুলে দিল টোটা।— দ্যাখ তো কী গন্ডগোল আছে?

হাতের তালুতে কিছুক্ষণ রেখে হিরেটা দেখতে লাগলাম। অ্যাকটিং করা দরকার। আমার জ্যোতিষজ্ঞান সম্পর্কে টোটার কোনও সন্দেহই নেই। এই আংটিটা আমার কথা মতোই ও এক দিন পরেছিল। আমি বললে, নিশ্চিন্তে ও আমার কাছে রেখে দেবে। সেই বিশ্বাস থেকে ওকে বললাম— এটা আমার কাছে থাক, বুঝলি। এক বার দোকানে নিয়ে গিয়ে গ্লাসের সামনে ফেলতে হবে। পরে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিস।

—থাক তা'লে তোর কাছে।

চুপ করে স্যান্ডউইচ চিবোচ্ছি। টোটার হাতে খবরের কাগজ। সেটা চোখের সামনে মেলে ধরেছে। সকালে বাড়িতে কাগজ পড়ার সময় পায় না। ও কোর্টে গিয়ে কাগজ পড়ে। এ কথাটা এক বার বলেছিল আমাকে। তখনই বুঝেছি, কত ব্যস্ত। ওর দ্বারা ওকালতি সম্ভবই না। মিথ্যে কথা বলতেই পারে না। আমার দ্বারাও এত দিন সম্ভব হত না। এখন হতে পারে। ব্রত আমি ভেঙে ফেলেছি। টোটার দিকে তাকিয়ে হেসে আমি মনে মনে বললাম— আমি পাল্টে গেছি। এ বার তুইও পাল্টাবি।

মা অসুস্থ হয়ে কয়েকতলা ওপরে শুয়ে আছে, অথচ আমার মধ্যে কোনও তাপ উত্তাপ নেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও দিন মাকে অসুস্থ হতে দেখিনি। মা-ই আমাদের সবার সেবা করেছে। সেই মা ওপরে শুয়ে আছে অচেতন হয়ে। নাকে নল, হাতে স্যালাইনের ছুঁচ। পাশে টিভিতে নিশ্চয়ই মায়ের হার্টের অবস্থা মনিটর করা হচ্ছে। দৃশ্যটা চিন্তা করতেই আমার অস্বস্তি শুরু হল। কাল বাড়িতে মায়ের সঙ্গে আমার শেষ বার যখন কথা হয়, তখন মা আমার উদ্দেশে বলেছিল শত্তুর... শত্তুর পেটে ধরেছিলাম। মা এত রেগে যাবে আমি চিন্তা করতে পারিনি। মা তো আমাকে অন্য ভাবে বোঝাতে পারত। ওই কথাটা না বলে যদি আমায় মাথায় হাত বুলিয়ে বলত— দ্যাখ বাবা, কবে বলতে কবে মরে যাব, আমার শেষ ইচ্ছেটা তুই ঠেলিস না। তা হলে সঙ্গেসঙ্গে আমি রাজি হয়ে যেতাম। লালিকে অন্য কোনও ছেলের পাশে বিয়ের পিঁড়িতে দেখলে আমি সহ্য করতে পারব? মোটেই না। সেই ছেলেটাকে তো আমি খুনই করে ফেলব। আজ থেকে ও আমার মনের ভেতর? সেই ছোটবেলা থেকে, যখন স্কুলে পড়তাম। দু'বেণী ঝুলিয়ে ও যখন আমার সামনে আসত।

লালির সেই চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে। কফি শপে বসেই শুনলাম, মাইকে বলছে— মি. কুন্তল দত্ত, ইউ

আর রিকোয়েস্টেড টু মিট ডা. যোশী ইমিডিয়েটলি।

ঝট করে উঠে দাঁড়ালাম। ডা. যোশী আমায় ডাকছেন? কেন? তা হলে কি মায়ের কিছু হল? উনিই বা কী করে জানলেন আমি নার্সিংহোমে এসেছি? পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে টেবলে রেখেই হনহন করে হাঁটতে লাগলাম। ডাঃ. যোশীর চেম্বারটা.আমি চিনি। দীপার সঙ্গে দু'একবার গেছি। দীপার কথা মনে হতেই বুঝলাম, এটা দীপারই কাজ। হোটেল থেকে হয়তো ডা. যোশীর কাছে ফোন করেছিল। আমার খোঁজ করতে বলেছে। সঙ্গেসঙ্গে পায়ের গতি কমে গেল। এত দ্রুত হাঁটার কোনও দরকার নেই।

একুশ

দোতলায় ডাক্তারদের চেম্বারে যেতেই ডা. যোশী বললেন— আরে, আপনিই কুন্তল? আজ সকালে দীপা আপনার কথা বলছিল। আপনার খুব দুর্ভাগ্য, মুম্বই যাওয়া আটকে গেল।

—আমার দুর্ভাগ্য? বলুন সৌভাগ্য।

—কেন বলুন তো?

—মুম্বই চলে গেলে মায়ের জন্য পরের ফ্লাইটেই ফিরে আসতে হত।

—ঠিকই বলেছেন। পাশেই বসা এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে ডা. যোশী বললেন— আগে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ডা. পটনায়েক। হার্ট স্পেশালিস্ট। আপনার মাকে দেখছেন। আমার বিশেষ বন্ধু।

হাত তুলে নমস্কার করলাম। বয়স বেশি নয়। আমার থেকে দু'তিন বছরের বড় হবেন। নিশ্চয়ই ঘ্যাম ডাক্তার। অনেক বিদেশি ডিগ্রি-টিগ্রি আছে। না হলে এ রকম একটা নার্সিংহোমে চাকরি পেতেন না। উনি পাল্টা নমস্কার করতেই বললাম— মা কেমন আছেন ডা. পটনায়েক?

—আপনাকে বলেই বলছি, ভয়ের কিছু নেই। অন্য কেউ হলে বলতাম, বাহাত্তর ঘণ্টার আগে কিছু বলা যাচ্ছে না।

শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, জ্যোতিষবিজ্ঞান তা হলে মিথ্যে নয়। তখন দাদাটা এমন ভাব করল, যেন মা মৃত্যুশয্যায়। বললাম— কী হয়েছে, বলুন তো?

—হঠাৎ কোনও কারণে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছিলেন। ব্লাড প্রেশার ফল করে গেছিল। আচ্ছা, যে ভদ্রলোক একটু আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, উনি আপনার কে হন?

—আমার দাদা। কেন বলুন তো?

—খুব ঘাবড়ে গেছেন। আমার পুরো কথাটা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হল

না। সে তুলনায় দেখছি, আপনি খুব স্ট্রং মাইন্ডের।

ডা. যোশী বললেন— মি. কুন্তলের আর একটা পরিচয় আছে। হি ইজ আ ভেরি গুড অ্যাস্ট্রোলজার।

—তাই নাকি। শুনে ডা. পটনায়েক বেশ উৎসাহী— অ্যাস্ট্রোলজি আপনার প্রফেশন না কি? আই মিন... আপনি অন্য কিছু করেন, না কি শুধু অ্যাস্ট্রোলজি করেন?

—আমাদের জুয়েলারির বিজনেস আছে।

—তাই বলুন। ইউ মাস্ট বি ভেরি রিচ দেন। আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—বলুন।

—আমার এই বন্ধুটির ভবিষ্যৎ কী বলুন তো?

—হরোস্কোপ না দেখলে ভাল করে বলতে পারব না। তবে একটা কথা বলতে পারি, ডা. যোশীকে খুব বেশি দিন ডাক্তারি করতে হবে না।

—কী বলছেন আপনি? ডা. যোশী বলে উঠলেন— ডাক্তারি না করলে খাব কী? মানে পেট চলবে কী করে আমার?

—একজন মাল্টিমিলিওনেয়ার মেয়ের সঙ্গে খুব শিগগির আপনার বিয়ে হবে।

কথাটা শুনে ডা. যোশী আর ডা. পাটনায়েক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। দু'জনের মুখ থেকে বিস্ময় ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমাকে অবশ্য খুব বেশি জ্যোতিষী করতে হয়নি। সকালে প্লেনে বসে দীপার যা টেলিফোনালাপ শুনেছিলাম, তার ওপর ভরসা করেই মন্তব্যটা ছুড়ে দিয়েছি। ওঁরা নির্বাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে বললাম— নির্ভয়ে এগিয়ে যান ডা. যোশী। এই বিয়েটা আপনার সুখের হবে। অন্তত যাকে স্ত্রী হিসাবে পাবেন, সে আপনাকে খুব ভালবাসবে। আরও ডিটেল যদি শুনতে চান, তা হলে আপনার জন্মস্থান আর জন্ম তারিখ ও সময়টা লিখে দিন। বিচার করে সব বলে দেব। এখন তো রোজই আমাকে আসতে হবে।

ডা. পটনায়েক উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডা. যোশীর দিকে— কনগ্রাটস বিবেক। কদম কদম বাড়ায়ে যা। আমি চলি। আমাকে তো ডাক্তারি করে খেতে হবে। আমার কপালে মাল্টিমিলিওনেয়ার জুটবে না। চলি মিঃ. কুন্তল। আমি আছি। কোনও প্রবলেমে পড়লে যোগাযোগ করবেন।

ঘরে ডা. যোশী ও আমি মুখোমুখি বসে। একটা কাচের পেপার ওয়েট ঘোরাতে ঘোরাতে ডা. যোশী বললেন— আপনি ঠিকই বলেছেন কুন্তল। আমি একটু আলাদা বসতে চাই আপনার সঙ্গে। আজ রাতে কী করছেন? চলে আসুন না আমার

ডেরায়। আমি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে থাকি। একসঙ্গে ডিনার করা যাবে।

আমার মোটেই ইচ্ছে নেই ডা. যোশীর সঙ্গে ডিনার করার। সব কিছু জট পাকিয়ে গেছে। সেগুলো আগে ছাড়ানো দরকার। তাই বললাম— মাফ করবেন। মায়ের এই অবস্থা। কোনও কিছু ভাল লাগছে না। পরে কোনও এক দিন বসা যাবে।

—নো প্রবলেম। চলুন ওঠা যাক। আমার একটা অপারেশন আছে। পরে না হয় ফের যোগাযোগ করা যাবে।

দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। নিচে নেমে লাউঞ্জে এসে দেখি, বউদি আর লালি পাশাপাশি চেয়ারে বসে। বাবা, দাদা, টোটা বা বিষ্টুকাকা কেউ নেই। গেল কোথায়? এ দিক ও দিক তাকানো সত্ত্বেও ওদের কোথাও চোখে পড়ল না। আমাকে দেখে বউদি উঠে এসে বলল— এত ক্ষণ কোথায় ছিলে ভাই? তোমার দাদা খোঁজ করছিল।

বললাম— ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। দাদা কোথায় গো?

—ওপরে গেছে। মায়ের জ্ঞান ফিরেছে। এখান থেকে বাড়ি যেতে চাইছে। বাড়ির লোক খুঁজছিল। তাই সব্বাই দেখা করতে গেল।

—তুমি গেলে না?

—ওরা এলে তার পর যাব। উফ, সারাটা সকাল যা গেল। বাড়িতে থাকলে টের পেতে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাই? তোমার সঙ্গে মায়ের কি কথা কাটাকাটি হয়েছিল কাল? কী হয়েছিল বলো তো?

বুকটা ধড়াস করে উঠল। তার মানে মা কাউকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে। বউদির মনে প্যাঁচ ট্যাচ নেই। তাই সরল মনে কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেলল। হঠাৎই লালির দিকে চোখ গেল। সঙ্গেসঙ্গে ও চোখ নামিয়ে নিল। নার্সিংহোমে আমি ঢোকার পর থেকে ও আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। এটাই সন্দেহজনক। আমার ওপর মায়ের রাগের আসল কারণটা যদি ওর কানে গিয়ে থাকে, তা হলে আমি নিশ্চিত কোনও দিন আমাকে ও ক্ষমা করবে না।

মিথ্যে কথা এখন আমার মুখে আর আটকাচ্ছে না। উত্তরের আশায় বউদি আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম— না তো, আমার সঙ্গে কিচ্ছু হয়নি।

—বাবাকে আমিও তাই বললাম। কিচ্ছু হলে আমার কানে নিশ্চয়ই যেত। ওই তো ওরা সবাই এসে গেছে। চলো, মাকে গিয়ে দেখে আসি।

বউদিকে নিয়ে আমি ওপরে ওঠার জন্য এক পা এগোতেই বাবা হঠাৎ খুব কড়া গলায় বলল— বউমা, শোনো। লালিকে নিয়ে তুমি ওপরে যাও। আর যেন কেউ তোমার মাকে দেখতে না যায়।

কথাটা শুনেই আমার পা-টা মেঝের সঙ্গে আটকে গেল। বউদির চোখে

বিস্ময়। দাদা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। টোটা বাবার দিকে তাকিয়ে। লালির চোখ ছলছল করছে। অপমানে আমার মুখটা শুকিয়ে গেল। বউদি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল— কেন বাবা?

বাবা বলল—তোমার মা বলে দিয়েছে, ছোট ছেলের মুখ আর কোনও দিন দেখবে না।

বাবার কথা শুনে মনে হল, কে যেন আমার কানে জ্বলন্ত সিসে ঢেলে দিল। মা এই কথা বলেছে! মা? কোনও দিন আর ছোট ছেলের মুখ দেখবে না? আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। ছোটবেলায় কত দুষ্টুমি করেছি! মায়ের কত অবাধ্য হয়েছি। কই, মা তো কোনও দিন আমায় একটা চড় পর্যন্ত মারেনি। উল্টে, পিসিমা যখন আমার নামে কোনও কমপ্লেন করত, তখন মা বলত, বলিহারি যাই, দিদি! একরত্তি একটা ছেলের নামে নালিশ জানাচ্ছ। মা বলত, টুম্পাই আমার বুকের একটা পাঁজর। ওর সম্পর্কে কেউ কিছু বললে, সেটা আমার বুকে এসে লাগে। আমি জানি, কেন তখন মা এই কথাটা বলত। পিসিমার মুখে শুনেছি! দাদা জন্মানোর পর মা একটা মেয়ের আশা করেছিল। আমি হওয়ার পর অবশ্য নিরাশ হয়নি। তবুও আমার দু' আড়াই বছর পর্যন্ত মা আমাকে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে রাখত। মেয়েদের মতো আমায় সাজাত। পিসিমা বলেছিল, তোর মায়ের পাগলামি দেখে সবাই খুব হাসাহাসি করত। শেষে বৃন্দাবন থেকে আমাদের কুলগুরু এসে মাকে খুব ভয় দেখান। ছোটবেলা থেকে মেয়ে সাজিয়ে রাখলে আমার ভেতর রাধা-ভাব এসে যেতে পারে। তখন খুব মুশকিল হবে।

বাবা কোনও কালেই আমাকে পছন্দ করত না। মা-ই ছোটবেলায় আমায় আগলে আগলে রাখত। সেই মা, কোন মুখে বলল, আমার মুখ দেখবে না? কথাটা মা কাকে বলেছে? এক বার মনে হল, প্রশ্নটা বাবাকে করি। মা কখন কথাটা বলল? কে শুনেছে? তার নাম আমায় বলতে হবে। কিন্তু নার্সিংহোমে অতগুলো লোকের সামনে প্রশ্নটা তোলা ঠিক হবে না। বাবাকে আমি চিনি। দুম করে একটা কথা বলে বসবে। আমাকে বেইজ্জত করে দেবে। লোকটার কোনও জ্ঞানগম্যি নেই। কোথায় কী বলতে হয়, তা জানে না। জানলে হাটের মাঝে এই কথাটা বলে বসত না।

বউদি মারাত্মক অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে অগ্রাহ্য করতে পারছে না। আবার আমার মনেও কষ্ট দিতে চায় না। বাবার সামনে দাদা বরাবরই বাধ্য ছেলে। লালি বউদির হাত ধরে রেখেছে। আমার অপমানে ওর মুখটাও যেন কেমন হয়ে গেছে! আসলে আমাকে কোনও দিন কারও কাছে হেরে যেতে দেখেনি। সে জন্যই ওর চোখটা ছল ছল করছে। পলকে সবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে চট করে

সিদ্ধান্ত নিলাম। বউদিকে বললাম— তুমি যাও, বউদি। মাকে বলো আমিও বলেছি, আমিও কোনও দিন দত্তবাড়ির কারও মুখ দেখব না। কথাটা আমি শেষ করলাম, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। স্পষ্ট দেখলাম, বাবার মুখের রং পাল্টে গেল। জ্বলন্ত চোখে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে বললাম, ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আমার লড়াই আজ থেকে শুরু হয়ে গেল। দত্ত জুয়েলার্সকে যদি আমি রাস্তায় টেনে নামাতে না পারি, তা হলে আমার নাম কুন্তল দত্ত না। মনে মনে কথাটা শেষ করেই আমি ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম। শেষ... আমার সঙ্গে এত দিন যাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল, তাদের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। আজ থেকে সত্যিই আমার নতুন জীবন শুরু হল। কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে টোটা ডাকল— টুম্পাই, প্লিজ একটু দাঁড়া। তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমার সঙ্গে দত্ত বাড়ির কোনও সম্পর্ক নেই। টোটার সঙ্গে আমার কিছু হয়নি। তাই দাঁড়িয়ে বললাম— বল, কী বলবি। আমার তাড়া আছে।

—এই ভরদুপুরে কোথায় যাচ্ছিস টুম্পাই?

—তাজ বেঙ্গলে। ওখানে আমার জন্য পটেলভাই ওয়েট করছেন।

—তুই হঠাৎ এত রেগে গেলি কেন ভাই?

—ছাড়। ও সব কথা ভাল লাগছে না।

—মাসিমা হয়তো অভিমান করে একটা কথা বলেছেন, সে জন্য সবার ওপর রাগ করলে চলে? আমার মাও তো ইদানীং রোজ উঠতে বসতে কত কথা বলছে আমার নামে। তা'লে তো আমারও বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

টোটা সেই আগের টোটার মতো কথা বলছে। আমি জানি, এর পর ও কী বলতে পারে। কথার পিঠে কথা বাড়বে। আমি সেটা হতে দিতে চাই না। একটু কড়া গলাতেই বললাম— শোন, একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিই। দত্তবাড়ির প্রয়োজন আমার কাছে ফুরিয়ে গেছে। ও বাড়িতে আমার থাকা বা না থাকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

—সে জন্যই কি তুই আজ সকালে সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেছিলি? কথাটা শুনে মনে মনে চমকে উঠলাম। কিন্তু টোটাকে বুঝতে দিলাম না। ওঃ, সবাই তা হলে জানে। আর জানে বলেই নার্সিংহোমে আসা ইস্তক বউদি ছাড়া কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি। দাদার মতো লোকও মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। নাহ, সোজাসুজি বলে দেওয়াই ভাল। বললাম— আমি মুম্বই চলে যাচ্ছি রে।

—পটেলভাইয়ের সঙ্গে যাচ্ছিস? কিন্তু কেন?

—এখানে বেগার খেটে কী লাভ বল? আমায় দোকানে বসতে হবে, অথচ আমার কোনও শেয়ার নেই। ফালতু পরিশ্রম আমি করতেই বা যাব কেন? মুম্বইয়ে

আমি নিজের বিজনেস করব। দেখি কিছু রোজগার করতে পারি কি না?

—সেটা তো এখানে থেকেও করতে পারিস। তার জন্য পটেলভাইয়ের সঙ্গে যাওয়ার দরকার কী?

—দত্তবাড়িতে থেকে আমি আলাদা বিজনেস করব, এ কথা তুই ভাবতে পারলি কী করে? যাক গে, তোর সঙ্গে এ সব কথা আলোচনা করার কোনও মানেই হয় না। চলি, ফের যদি কখনও কলকাতায় আসি, তা'লে দেখা হবে।

কথাগুলো বলেই হনহন করে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। বড় রাস্তায় এসে হঠাৎ মনে হল, টোটার হিরের আংটিটা আমার কাছেই রয়ে গেল। ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। যখন ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম, তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, দত্ত ফ্যামিলির সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি বিচ্ছেদ ঘটে যাবে? নার্সিংহোমে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব না। থাক আংটিটা আমার কাছে। কলকাতা ছাড়ার আগে কাউকে দিয়ে ওর হাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্লাই ওভারের নিচে এসে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়ালাম। এখান থেকে তাজ বেঙ্গল এমন কিছু দূরে না। পশ্চিম দিকে সোজা হেঁটে গেলেই শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন, নন্দন। তার পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে রেসকোর্স। ফ্লাই ওভারের নীচ দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে যাওয়া... মন্দ কী? কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করলাম। খুব টায়ার্ড লাগছে। হোটেলে গিয়ে একটু রেস্ট নেওয়া দরকার।

সকালে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার সময় মাঝ রাস্তায় আমি নেমে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পটেলভাই আমাকে নামতে দেননি। সোজা নিয়ে তোলেন তাজ হোটেলে। সারাক্ষণ গুম হয়ে বসে ছিলেন গাড়িতে। মুম্বই ব্লাস্টের খরবটায় খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন। আমার ওপর পটেলভাইয়ের প্রচণ্ড আস্থায় মনে হয়, কোনও প্ল্যান আছে। সে জন্যই আমাকে ছাড়তে চাননি। গাড়ি নিয়ে আমি যখন বেলভিউর দিকে আসছি, তখন উনি শুধু বললেন— বেলা দুটোর মধ্যে ফিরে এসো, গডব্রাদার। তোমার জন্য আমি একটা আলাদা ঘর বুক করে দিচ্ছি। আজকের দিনটা আমার সঙ্গে থেকে যাও। তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে ইমপর্ট্যান্ট আলোচনা করার আছে।

ভালই হয়েছে। তাজ বেঙ্গলে ঘর বুক করা আছে। না হলে এখন কোথায় যেতাম? মায়ের ওই কথা শোনার পর বাড়ি ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে অপমানজনক হত। ঠিক আছে। যা ঘটে, তা মঙ্গলের জন্যই ঘটে। ঈশ্বরের ইচ্ছা। মেনে নেওয়াই ভাল। কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতর জ্বালাটা একটু কমল। একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে হাত তুলে দাঁড় করালাম। বাড়ির কথা ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এত দিন তো নিজের কথা কখনও ভাবিনি। এখন না হয় একটু নিজের কথা

ভাবি।

মিনিট দশেকের ভেতর তাজ বেঙ্গলের কাচের গেট ঠেলে ঢুকতেই দেখি পটেলভাইয়ের সেক্রেটারি মি. দেশমুখ। আমাকে দেখা মাত্র সোফা থেকে উঠে এসে বললেন— স্যার, মি. পটেল একটু বেরিয়েছেন। আপনি তিনশো ছয় নম্বর রুমে চলে যান। ওই ঘরটা আপনার।

বললাম— মিস পটেল আছেন?

—উনিও এইমাত্র বাইরে গেলেন। একজন ভিজিটর এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে

—মি. পটেল কখন ফিরবেন, জানেন?

—তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে। উনি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে গেছেন। আপনার সঙ্গে ঠিক সাড়ে চারটেয় বসবেন। আপনার কোনও কাজ নেই তো?

—না, না। আমি ঘরেই থাকব। আমাকে মোবাইলে ডেকে নেবেন।

—রাইট স্যার। আপনার লাঞ্চ কি পাঠিয়ে দেব?

—ব্যস্ত হবেন না। আমি রুম সার্ভিসকে নিয়ে আনিয়ে নেব।

রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। বেলা প্রায় একটা বাজে। হাতে তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় আছে। লাঞ্চ করে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। তার পর আমার হাতে অখণ্ড সময়। ভাবতে হবে। অনেক কিছু ভাবতে হবে। জীবনে কিছু একটা করতেই হবে। যা কিছুই করি না কেন, সেটা যেন পাথর সম্পর্কিত হয়। কলকাতায় পাথর সম্পর্কে আমার থেকে বেশি কে আর জানে? সৌরীন্দ্র দত্তকে দেখাতেই হবে, আমাকে তাচ্ছিল্য করার পরিণাম কী হতে পারে।

বাইশ

জামা প্যান্ট বদলে পাজামা পাঞ্জাবি গলানোর ফাঁকে খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলাম। মশলা দেওয়া খাবার আমি খেতে পারি না। কিন্তু তাজ বেঙ্গলের খাবারে বেশ মশলা। এর আগে দীপার সঙ্গে দু'তিন দিন খেতে হয়েছে। আমার মোটেই ভাল লাগেনি। এত দিন মা আর বউদি আমার খাবার যত্ন করে বানিয়ে রাখত। বাবা-দাদার সঙ্গে খেতে বসলেও আমি কিন্তু যথাসম্ভব কম মশলার খাবার পেতাম। এখন আর বাড়ির খাবার কে দেবে? আমাকে এই সব খাবারই খেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াই ভাল।

বউদির মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি যখন বলছি, দত্তবাড়ির কারও মুখ আর কোনও দিন দেখব না, তখন বউদির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। কেন বলতে গেলাম ওই কথাটা? আমি তো স্বচ্ছন্দে বলতে

পারতাম, মায়ের মুখ আর কোনও দিন দেখব না। উঁহু, সেটাও কি বলাটা ঠিক হত? আসলে বাবার ওপর রাগটা ঝাড়তে গিয়ে ফট করে মুখ দিয়ে ওই কথাটা বেরিয়ে গেল। আর কেনই বা বলব না? বাবা দত্ত ফ্যামিলির হেড। বাবার কৃতকর্মের ফল তো পুরো ফ্যামিলকেই বইতে হবে।

হঠাৎই মনে হল, মা আমার সম্পর্কে সত্যিই ওই কথাটা বলেছে তো? কাকে বলল? কখন বলল? কী পরিপ্রেক্ষিতে বলল? মা আমার সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা জানে। আমাকে নিয়ে মা কখনও কোনও কথা আলোচনা করবে না বাবার সঙ্গে। সে আমার ওপর যত রাগই হোক। তাহলে কথাটা বলল কাকে? বউদিকে বলেনি। দাদাকেও না। তা হলে আর রইলটা কে? লালি? হ্যাঁ, ও হতে পারে। কাল রাতে ও মায়ের সঙ্গে ছিল। মা ওর সঙ্গে অনেক কথা আলোচনা করে। মা নিশ্চয়ই কাল ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমার কথাটা ওকে বলে দিতেও পারে। আর তখনই হয়তো রাগের মাথায় বলে ফেলেছে, টুম্পাইয়ের মুখ আর কোনও দিন দেখব না।

হোটেলের কামরায় একা বসে থাকতে থাকতে নানা চিন্তা হচ্ছে। কাল লালি আমাদের বাড়িতে ছিল— এই খবরটাই সব জট পাকিয়ে দিচ্ছে। এর আগে লালি আমাদের বাড়িতে রাত কাটায়নি এমন নয়। প্রত্যেক বছর শিবরাত্তিরের দিনটাই আমাদের বাড়িতে থাকত। মহালয়ার আগের রাত্তিরটাও কোনও কোনও বার থেকেছে। কিন্তু কখনও একা থাকেনি। সঙ্গে টোটাও থাকত। কী মজাই না হত তখন! দাদা বিদেশ থেকে একটা টেপরেকর্ডার কিনে এনেছিল। আর কাউকে ধরতে দিত না। ক্যাসেটে গান বাজাত। আমরা সেই গান শুনতাম। ভোর বেলায় গাড়িতে করে সবাই মিলে জগন্নাথ ঘাটে স্নান করতে যেতাম। তার পর টোটা আর লালি বাড়ি চলে যেত। লালিকে তখন একেবারে পুতুলের মতো মনে হত।

সেই লালির মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। ও কি খুব মনঃকষ্টে ভুগছে? আজ টোটা বলল, ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আর মা না কি উদ্যোগ নিয়ে সেই বিয়ে দেবে। কথাটা মনে হতেই সোফায় সিধে হয়ে বসলাম। হতে দেব না। বাবা আর মা যা চাইবে, আজ থেকে আমি তার উল্টোটা করব। দেখি, কার ক্ষমতা কত বেশি। আমি ঠিক জানি, আমি লালির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, বিয়ের প্রস্তাব দিলে ও না করতে পারবে না। টোটা আর মাসিমাও আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। ছোটবেলা থেকে ওরা আমায় দেখছে। আমি ওদের ঘরের ছেলের মতোই। অন্তত মাসিমার কথা শুনে এত দিন আমার তাই মনে হয়েছে।

দরজায় টকটক শব্দ। সম্ভবত খাবার নিয়ে এসেছে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখি, দীপা। ওর পিছনেই ট্রলি। তাতে খাবার ঢাকা দেওয়া। রুম সার্ভিসের লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল— মে আই কাম ইন স্যার? ঘাড় নেড়ে ওকে

ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিলাম।

দীপার পরনে সালোয়ার কামিজ। বেশ সাজগোজ করেই যে বেরিয়েছিল, ওকে দেখে তা বোঝা যাচ্ছে। এমনিতেই ও যথেষ্ট সুন্দরী। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে ডানাকাটা পরি বলে মনে হচ্ছে। লালির কথা চট করে মাথা থেকে হারিয়ে গেল। এই মেয়েটার কাছাকাছি খুব বেশি ক্ষণ থাকলে যে-কোনও পুরুষের মাথা ঘুরে যেতে বাধ্য।

দীপা ঘরে ঢুকেই বলল— এখনও লাঞ্চ করনি? এই এলে বুঝি? তোমার মা কেমন আছেন কুন্তল?

—মনে হয় ভাল—।

—মনে হয় ভাল মানে? ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞেস করনি?

—করেছিলাম। খারাপ নেই। বলেই কথা ঘোরালাম—তুমি কোথায় গেছিলে?

—কাছেই পার্কস্ট্রিটের একটা দোকানে।

—পটেলভাই কখন ফিরবেন তুমি জান?

হাতঘড়ির দিকে এক বার চোখ বুলিয়ে দীপা বলল— আসার সময় হয়ে এল। তুমি বেলভিউর দিকে রওনা হয়ে যাওয়ার পরই তোমার পটেলভাই এলগিন রোডে একটা বাড়ি দেখতে গেলেন। একজন দালাল নিয়ে গেছে। পছন্দ হলে আজই বাড়িটা কিনে ফেলতে পারেন।

কলকাতায় বাড়ি কেনার কথা দীপা আজ সকালেই আমায় বলেছিল, কিন্তু সে তো বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। এজেন্ট না কি ঠিক করে দিচ্ছে। তখন তো এলগিন রোডের কথা ও বলেনি। তা ছাড়া বাড়িটা এত তাড়াতাড়ি পটেলভাই কিনতে যাবেন, তখন মনে হয়নি। অবশ্য পটেলভাইয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। ওঁর এত টাকা, কোনও সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি সময় লাগে না। ইচ্ছে করলে, পুরো এলগিন রোডটাই উনি কিনে নিতে পারেন। কিন্তু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। ঠিক কী কারণে বাড়িটা উনি কিনছেন, বুঝতে পারলাম না। দীপার গুরুদেব-প্রীতির জন্য, না অন্য কারণে?

রুম সার্ভিসের লোকটা খাবার সাজাচ্ছে। হাত ধোওয়ার জন্য আমি বাথরুমে ঢুকলাম। এটা আমার বহু দিনের অভ্যেস। ভাল করে হাত না ধুয়ে খেতে বসি না। যতটা জীবাণুমুক্ত হওয়া যায় আর কী! মিনিট দু'য়েক পর ফিরে দেখি দীপা টিভি চালিয়ে দিয়েছে। স্টার নিউজে খবর হচ্ছে। পর্দার দিকে চোখ যেতেই দেখলাম, মুম্বই এয়ারপোর্টে বম্ব ব্লাস্টের খবর দেখাচ্ছে। এত ক্ষণ ব্লাস্ট-এর কথা মনেই ছিল না। ঘণ্টা ছয়েক কেটে গেছে। মুম্বইয়ে কী হয়েছে সেটা দেখার জন্য খবরে মন দিতেই

রুম সার্ভিসের লোকটা বলল—স্যার, শ্যাল আই সার্ভ লাঞ্চ ফর বোথ অফ ইউ?

—নো, নো— দীপা বলে উঠল—আই হ্যাভ অলরেডি টেকেন লাঞ্চ আউটসাইড।

বলেই দীপা উঠে পড়ল। ঘরে ঢোকার সময় ওর মুখ যতটা উজ্জ্বল লাগছিল, এখন ততটাই নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। হঠাৎ কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ওর কী হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। দোপাট্টা সামলে নিয়ে ও বলল—কুন্তল, আমি ঘরে আছি। ফের সন্ধেবেলায় দেখা হবে।

রুম সার্ভিসের লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি ফের টিভির দিকে মন দিলাম। এয়ারপোর্ট অথরিটির একজন অফিসার ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। কারা বম্ব ব্লাস্ট করেছে, সে সম্পর্কে বলছেন। হঠাৎ একটা কথা কানে এল— এই ব্লাস্ট-এর সঙ্গে ইল্লিগাল আর্মস ডিলারদের একটা যোগাযোগ থাকতে পারে বলে আমরা মনে করছি। মি. মুথুস্বামী বলে একজন প্যাসেঞ্জার মারা গেছেন। তাঁর সঙ্গে একটা হ্যান্ড ব্যাগেজ ছিল। তাতে কয়েক কোটি টাকার হিরে পাওয়া গেছে। এই মুথুস্বামী লোকটা কে, সেটা আমরা খোঁজ করছি। তার পর মোটামুটি বুঝতে পারা যাবে, কারা এই ব্লাস্ট-এর পিছনে আছে।

রিপোর্টার জানতে চাইলেন, তা হলে এটা উগ্রপন্থীদের কাজ নয়?

—এখনও পর্যন্ত তো মনে হচ্ছে না।

—হিরে উদ্ধারের সঙ্গে ইল্লিগাল আর্মস ডিলারদের সম্পর্কটা কোথায়?

—সেটা এখনই বলতে পারব না। তবে নর্মালি একটা সম্পর্ক থাকে। এ ক্ষেত্রে আছে কি না, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি।

মুথুস্বামী নামটা আজই কোথায় যেন শুনেছি! মুখের খাবার চিবোতেই—। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আজ সকালেই মুথুস্বামীর নামটা পটেলভাই করেছিলেন দীপাকে বম্ব ব্লাস্ট-এর খবরটা দেওয়ার সময়। মারাত্মক উদ্বিগ্ন লাগছিল তখন পটেলভাইকে। মনে হয়, মুথুস্বামী কাজ করেন পটেলভাইয়ের সঙ্গে। হিরে নিয়ে তিনি বাঙ্গালোর থেকে মুম্বই যাচ্ছিলেন। এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। হিরে ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত একজন মানুষ ব্রিফকেসে করে হিরে নিয়ে যেতেই পারেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। তার সঙ্গে বেআইনি অস্ত্র চালানকারীদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেল। টিভি-র দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম। এয়ারপোর্টের যে অংশটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পর্দায় সেটা দেখাচ্ছে। দেখে শিউরে উঠলাম। নিশ্চয়ই অনেক লোক মারা গেছেন। খবরে কিছু বলল না। আগে হয়তো বলেছে। যে বা যারাই এই কাজ করুক, তাকে বা তাদের গুলি করে মারা উচিত। কত নিরীহ লোক ওই সময় এয়ারপোর্টে ছিলেন। ভাগ্যিস ঘটনাটা ঘটেছে খুব সকালের

দিকে! লোক এমনিতেই তখন কম থাকে। ব্লাস্ট পরের দিকে হলে আরও বেশি লোক মারা যেতেন।

নাহ, স্টার নিউজের খবরটা প্রতি মুহূর্তে শুনতে হবে। নিজের ভাগ্যটাকে জড়িয়ে ফেলছি পটেলভাইয়ের সঙ্গে। আমার বুঝেসুঝে পা ফেলা উচিত। যেন কোনও বিপদে না পড়ি। পটেলভাইয়ের মতো মানুষের হাত অনেক লম্বা। নিজের দোষ অন্যের কাঁধে স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে দিতে পারেন। এ সব ব্যাপারে ওঁদের মতো বিজনেসম্যানরা খুব নির্দয় হতে পারেন। আমাকে বাঁচানোর জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উনি খুন করিয়ে ছিলেন ইউসুফকে। অন্য কাউকে বাঁচানোর জন্য আমাকেও উনি এক মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে দিতে পারেন পৃথিবী থেকে।

সময়টা আমার ভাল যাচ্ছে না। বাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আবার সময়টা ভালও বলতে হবে। না হলে বম্ব ব্লাস্ট-এর ঘটনাটা তো পটেলভাইয়ের প্লেন মুম্বই পৌঁছনোর পরও ঘটতে পারত। তখন তো আরও সমস্যায় পড়তে পারতাম। এখন ইচ্ছে করলে পটেলভাইয়ের সংস্পর্শ আমি ত্যাগ করতে পারি। কেননা নিজের শহরে আছি। এক বার মুম্বই চলে গেলে পুরোপুরি পটেলভাইয়ের খপ্পরে চলে যাব। তখন আর নিজের ইচ্ছেয় কিছু করা সম্ভব হবে না। মুম্বই শহরে আর কাউকে যে আমি চিনিও না।

পেটে প্রচণ্ড খিদে। টেবলের ওপর চাইনিজ খাবার পড়ে আছে। অথচ মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। শুধু স্যুপটা খেয়ে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলাম। বেলা প্রায় তিনটে। পটেলভাইয়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর এক ঘণ্টা পর। মনে একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল। পটেলভাইয়ের কী প্ল্যান, সেটা আমি জানি না। উনি কবে মুম্বই যাবেন, সেটা আমায় বলেননি। সকালে এক বার শুধু বলেছিলেন, আমাকে বিজনেস পার্টনার হিসাবে চান। কী বিজনেস, সেটা না বললেও মনে হয় হিরে সম্পর্কিত কিছু হবে। নাহ্, ভাল করে সব না জেনে আমি রাজি হব না। ব্লাস্ট-এর খবরটা শোনার পর থেকে মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

টিভি-র পর্দায় ফের কোনও এক পুলিশ অফিসারের ইন্টারভিউ দেখানো হচ্ছে। মুম্বই পুলিশের কোনও বড় কর্তা হবেন। হঠাৎ উনি বললেন— একটু আগে আমরা বড় ধরনের ব্রেক থ্রু করেছি। ব্লাস্ট কেস-এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে আমরা গ্রেফতার করেছি। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস দুম। তার এক নাটাভিয়ান পার্টনারকে খোঁজা হচ্ছে।

—কোথায় গ্রেফতার হয়েছেন উনি?

—তদন্তের স্বার্থে সেটা বলা সম্ভব নয়। ইন্টারপোল আমাদের আগেই এই মহিলা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল।

পর্দায় মিসেস দুম-এর ছবি দেখার পরই আমার বুকটা ধক করে উঠল। মাই গড। এই ভদ্রমহিলা ইল্লিগাল আর্মস ডিলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত? তবে যে দীপা আমাকে বলেছিল, ইনি পটেলভাইয়ের বান্ধবী? ভাবাই যায় না, এই রকম একজন অভিজাত মহিলা জঘন্য কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারেন! সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পা দু'টো থরথর করে কাঁপছে। এ কাদের সঙ্গে আমি মুম্বই চলে যাচ্ছিলাম? মিসেস দুম গ্রেফতার হয়েছেন। তার মানে পটেলভাইকে ধরে পুলিশ এর পর টানাটানি করবে। ওঁরা এই তো কয়েক দিন আগেই লাটাভিয়ায় ঘুরে এসেছেন একসঙ্গে। তার মানে পটেলভাই হিরের ব্যবসার পাশাপাশি আরও দু'নম্বরি কিছু ব্যবসা করেন।

পুলিশ লাটাভিয়ান যে লোকটার কথা বলল, তিনি কি মিঃ ব্লিচ? হওয়া সম্ভব। ব্যবসায় এঁদের পার্টনার হতে বলেছিলেন পটেলভাই আমাকে। তার মানে এই দু'নম্বরি ব্যবসায় উনি আমাকেও সামিল করে দিতেন। মনের মধ্যে অসম্ভব টেনশন শুরু হয়ে গেল। সব আন্দাজ কবার পর তা হলে আমার কী করা উচিত? কথাটা মনে হওয়া মাত্রই আমার সব গুলিয়ে গেল। এক বার মনে হল, দীপার কাছে গিয়ে এখনই আমার জনতে চাওয়া উচিত, মিসেস দুম-এর অ্যারেস্ট হওয়ার ব্যাপারটা ও জানে কি না? ও নিশ্চয়ই এ সব দু'নম্বরির মধ্যে যুক্ত নয়। হ্যাঁ, ওর মতো সংস্কৃতিমনস্ক মেয়ে কখনওই যুক্ত থাকতে পারে না। পরক্ষণেই মনে হল, বেচারি এই দুপুরে হয়তো ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। এই সময় নক করে ওকে বিরক্ত করা ঠিক সমীচীন হবে কি না সেটা ঠিক করতে পারলাম না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেলা প্রায় তিনটে। আর ঘণ্টাখানেক বাদেই আমার দেখা হওয়ার কথা পটেলভাইয়ের সঙ্গে। নিজেকে সামলে নিলাম। মাত্র একটা ঘণ্টার তো ব্যাপার। কেটে যাবে। একটু অপেক্ষা করা যাক। প্রশ্নটা সরাসরি পটেলভাইকেই আমার করা উচিত।

টিভির দিকে চোখ মেলে বসে রইলাম। মনের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কেন জানি না, আমার মনে হতে লাগল, খুব বড় বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। এমন একটা সময়, যখন বাড়ির কেউ আমার পাশে থাকবে না। কে-ই বা আমার পাশে এসে দাঁড়াবে? কত তুচ্ছ মানুষ আমি। কী দরকার ছিল, বাবার সঙ্গে জেদাজেদি করার? বাবার কথা মনে হতেই ফের মনটা শক্ত করে নিলাম। না, আমার যা-ই হোক না কেন, আমি যে পরিস্থিতিতেই পড়ি না কেন, বাবার কোনও সাহায্য আমি নেব না। সেটা আমার বিরাট পরাজয় হবে।

দুর্ভাবনায় হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত বলে মনে হল। আমার একটা লম্বা ঘুম দরকার। আজ খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়তো ভাল করে চিন্তা করতে পারব। সোফায় বসে পা-টা সামনের

দিকে মেলে দিলাম। আর ঠিক তখনই ডোর বেলটা বেজে উঠল। এই সময় কে আমার খোঁজে এল? নিশ্চয়ই দীপা, অথবা মিঃ দেশমুখ। এই দু'জন ছাড়া আর তো কেউ জানেন না, আমি হোটেলের এই ঘরে আছি।

তেইশ

ঘুমঘুম চোখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই চমকে উঠলাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গঙ্গাসাগর ফেরত সেই সাধু। বারো বছর আগে যাঁকে আমি দেখেছিলাম দত্ত জুয়েলার্সের শো রুমে। প্রায় ছয় ফুটের মতো লম্বা। মাথায় বিরাট জট, খালি গায়ের নানা জায়গায় সাদা ছাইয়ের টানা টানা দাগ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লাল কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরা। হাতে কালো কমণ্ডুলু। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এত বছর পরও চিনতে পারলাম আমি। সাধুর মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি।

কেন জানি না, মনে হল, এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারেন ইনি। যদি পা দুটো আমি জড়িয়ে ধরে বলি— আপনার ব্রত আমি রাখতে পারিনি।

কী রে বেটা, ভিতরে আসতে বলবি না?

কথাটা বলেই সাধুবাবা হাসলেন। চোখের সামনে অত বড় শরীরটাকে দেখছি, তবুও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, ফাইভ স্টার এই হোটেলের তিনতলায় জটাধারী সাধু উঠে এসেছেন! এত সিকিউরিটি গার্ড, এত লোকজন, তার মাঝে সরাসরি উনি এলেন কী ভাবে? আমার রুম নাম্বারই বা জানলেন কী ভাবে? কোনও গেস্ট এলে রিসেপশন থেকে ফোন করাই নিয়ম। আশ্চর্য, কেউ তো আমায় ফোন করেননি! পাছে উনি অন্য কারও চোখে পড়ে যান, সেই আশঙ্কায় দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম।

—আসুন, ভেতরে আসুন।

ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে উনি বললেন— ব্রত ভঙ্গ করে ফেললি রে বেটা? তোরও এই দুর্মতি হল?

কী বলব? চুপ করে রইলাম।

—তোর শক্তি তো নষ্ট হয়ে গেল, বেটা! সব ফিরিয়ে নিলাম। আজ থেকে তুই যা বলবি, আর মিলবে না।

শুনে আমার হাত-পা শক্ত কাঠের মতো হয়ে গেল। আমার প্রেডিকশন আর মিলবে না? তা হলে আমার আর রইল কী? প্রায় বারো বছর ধরে আমার তপস্যা, এক মুহূর্তের একটা ভুলের জন্য সব নষ্ট হয়ে গেল? এক বার মনে হল, সাধুবাবার পা দুটো চেপে ধরি। বলি, আমায় মাফ করে দিন। নিজের ভাল-মন্দের চিন্তায় সামলাতে পারিনি। ক্রমেই একটা বিপদের মধ্যে আমি জড়িয়ে যাচ্ছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। কিন্তু জিভটা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বলার এক বার চেষ্টা করলাম

বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুই বেরোল না।

সকাল থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমার স্নায়ু বোধহয় আর সহ্য করতে পারবে না। অসহায়ভাবে সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি বললেন— লোভ খুব খারাপ জিনিস রে বেটা। তোর মধ্যে তো কাম, ক্রোধ, লোভ — এ সব কিছু ছিল না। কেন সামান্য একটা রত্নের লোভে তুই সব জট পাকিয়ে দিলি?

'রত্নের লোভে' কথাটা খট করে কানে এসে বাজল। সাধুবাবা তা হলে জানেন আমার ব্রত ভঙ্গের কারণটা। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পাওয়া সেই হিরের আংটির বাক্স। প্রশ্নের কী উত্তরই বা দেব? মনে মনে বললাম, জানি না। আসলে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না।

—শোন, সাধুবাবা ফের বললেন— মনটাকে শক্ত করে ফ্যাল। এখান থেকে এখুনি তুই বেরিয়ে যা। না হলে আরও বিপদের মধ্যে পড়বি। আর শোন বেটা, ফের বারো বৎসর তোকে ব্রত পালন করতে হবে। পারবি কি না বল। তা হলে বারো বৎসর পর ফের তোর সঙ্গে দেখা হবে।

হাত-পায়ের সাড় ফিরে এল। হাঁটু গেড়ে বসে সাধুবাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম— পারব, পারব বাবা।

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে সাধুবাবা বললেন— আরে, এ কী করছিস বেটা? আমার পা ছাড়। তোর গর্ভধারিণীর পা দুটো গিয়ে জড়িয়ে ধর। সব জট খুলে যাবে। কথাগুলো শুনে ফের চমকে উঠলাম। সাধুবাবা কি অন্তর্যামী? মায়ের সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কথাও জেনে গেছেন? না হলে মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরার কথা বলবেন কেন? মায়ের পা জড়িয়ে ধরলে সব জট খুলে যাবে? কিন্তু কোন মুখ নিয়ে আমি মায়ের কাছে যাব? বেলভিউতে গেলেই তো বাবার কাছে আমি হেরে যাব। আজই নার্সিং হোমে জাঁক করে অনেক কথা বলে এসেছি। এই অবস্থায় ফের মায়ের কাছে গেলে মা হয়তো খুশি হবে, কিন্তু তা হলে বাবার কাছে সারা জীবন মাথা হেঁট করে থাকতে হবে। কী যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দরজায় নক করার শব্দ। তার পর ডোরবেলটা বেজে উঠল। এক বার নয়, একাধিক বার।

ডোরবেল যে টিপছে, কোনও কারণে সে বোধহয় ধৈর্যহারা। এক বার মনে হল, দীপা। পরক্ষণেই মনে হল, না দীপা হতে পারে না। জরুরি দরকার হলে ওর ঘর থেকেই ও আমাকে ফোন করে নিত। নিশ্চয়ই সিকিউরিটি কেউ। আমার ঘরে সাধুবাবাকে ঢুকতে দেখেছে। সেই কারণেই বোধহয় খোঁজ নিতে এসেছে।

উঠে গিয়ে দরজা অল্প ফাঁক করে দাঁড়ালাম। আমি চাই না, সাধুবাবা কারও চোখে পড়ে যান। করিডোরে সিকিউরিটিরই লোক। বলল— ডিসটার্ব করার জন্য

মাফ করবেন স্যার, আপনার ঘরে কি কেউ ট্রেসপাস করেছে?

বললাম—না।

—আপনি শিওর? দেখুন তো, একজন সাধু টাইপের লোক। ক্লোজড সার্কিট টিভিতে কিন্তু আমি দেখেছি, লোকটা আপনার ঘরেই ঢুকেছে। এত বড় হোটেলে ক্লোজড সার্কিট টিভি থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর সাধুবাবা যে আমার ঘরেই ঢুকেছেন, সেটাও সত্যি। কিন্তু এক বার না বলে ফেলেছি। কথাটা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তাই বেশ জোর দিয়েই বললাম— না, না, কোনও সাধুবাবা আমার ঘরে ঢোকেননি।

—সরি স্যার, তবুও আপনার ঘরটা এক বার চেক করতে চাই। ইট'স আ কোয়েশ্চেন অব সিকিউরিটি। প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড।

অগত্যা সরে দাঁড়ালাম। ছি, ছি। লোকটার কাছে মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হয়ে যাব। এক্ষুনি সাধুবাবা চোখে পড়ে যাবেন। সিকিউরিটির লোকটা হয়তো আমাকেই সন্দেহ করে বসবে। দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘরের ভেতর ঢুঁ মেরে এসে লোকটা বলল—আশ্চর্য! সাধুটাকে নিজের চোখে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছি। অথচ এই ক'মিনিটের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল? স্ট্রেঞ্জ!

লোকটা বলছে কী? সাধুবাবা ঘরের ভেতর নেই? গেলেন কোথায়? এই তো একটু আগে আমি তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিলাম।

ভোজবাজি নাকি? পা চালিয়ে ঘরের মধ্যেখানে এসে দাঁড়ালাম। না, কেউ নেই। বাথরুমের দরজা খুলে দেখি, ফাঁকা। হঠাৎই গায়ে কাঁটা গিয়ে উঠল।

—সরি, স্যার। দরজাটা বন্ধ করে দিন।

আমার দিকে এক বার অবাক চোখে তাকিয়েই সিকিউরিটির লোকটা বাইরে বেরিয়ে গেল। ধপ করে ডিভানের উপর বসে পড়লাম। টোটার মুখে এই সব সাধুর কথা আমি অনেক শুনেছি। এঁরা যখন তখন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করতে পারেন। এ ক্ষমতা, অনেক জন্মের তপস্যার ফল। হয়তো উনি ঘরের ভেতর কোথাও আছেন। আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

সারা ঘরটায় চন্দনের গন্ধ ম ম করছে। মহাযোগীদের শরীর থেকে না কি এই ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। কথায় কথায় টোটা এক বার বলেছিল, মহাযোগীদের বিষ্ঠা থেকেও না কি সুগন্ধ বেরয়। হতে পারে। সাধুবাবার কথা শোনার পর থেকেই মনটা খুব দুর্বল হয়ে গেছে। এখন কোনও কথাই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। ঘর থেকে সাধুবাবার উধাও হয়ে যাওয়ার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

জীবনে এই রকম অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কখনও পড়িনি। মাথাটা কাজ করছে না বলে মনে হল না। হাত ঘড়ির দিকে নজর যেতেই দেখি, প্রায় চারটে বাজে।

পটেলভাইয়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল চারটের সময়। বোধহয় এখনও হোটেলে ফেরেননি। ফিরলে চারটে বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে দেশমুখ আমাকে টেলিফোনে মনে করিয়ে দিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা। বুঝতে পারছি না, পটেলভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করেই আমার চলে যাওয়াটা উচিত হবে কি না। তা ছাড়া হোটেল থেকে বেরিয়ে আমি যাবই বা কোথায়? বাড়ি ফেরা সম্ভব না। কলকাতায় আমার এমন কোনও ঘনিষ্ঠ লোকও নেই, যার বাড়িতে গিয়ে কয়েকটা দিনের জন্য থাকতে পারি। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত, সুটকেসে পাঁচ লাখ টাকার মতো আছে। আমাকে গিয়ে সেই উঠতে হবে অন্য কোনও হোটেলেই।

না, এভাবে বসে থাকলে চলবে না। সাধুবাবা চলে গেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। না হলে আরও বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। কথাটা মনে হতেই, বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখে জল দিয়ে এলাম। পরনের পাঞ্জাবি আর পাজামাটা বদলে নেওয়া দরকার। প্রয়োজনে হুট করে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। তার আগে এক বার খোঁজ নেওয়া দরকার, দীপা ওর ঘরে আছে কি না। ও কি টিভি-র খবরটা শুনেছে? মিসেস দুম-এর গ্রেফতার হওয়ার খবরটা? এই প্রথম আমার মনে হল, দীপা বাইরে যতই রবীন্দ্রপ্রীতি দেখাক, পটেলভাইয়ের দু'নম্বরি ব্যবসা সম্পর্কে খুব ভাল মতো ওয়াকিবহাল।

ডিভানে বসে টেলিফোনের থ্রি জিরো ফাইভ বাটন টিপে রিসিভারটা কানের কাছে ধরে রাখলাম। ও প্রান্তে রিং হয়েই যাচ্ছে। রিং হতে হতে এক বার লাইনটা কেটে গেল। ঘরে কেউ নেই না কি? এমন তো হওয়ার কথা নয়। আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দীপা কিন্তু বলে গেছিল, ঘরে বিশ্রাম নেবে। ফের ডায়াল করলাম। নাহ, এ বারও ও দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। তা হলে কি দীপা হোটেলে নেই? গেল কোথায়? এই অল্প সময়ের মধ্যে?

হঠাৎই পটেলভাইয়ের সেক্রেটারি মি. দেশমুখের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোককে এক বার ফোন করা যেতে পারে। ওঁর কাছে পটেলভাইয়ের খবর পাওয়া যাবে। মি. দেশমুখের মোবাইল নাম্বারটা আমার মোবাইল সেট-এ তোলা আছে। সার্চ করতেই নাম্বারটা স্ক্রিনে ভেসে উঠল। যোগাযোগ করতে যাব, এমন সময় রিং টোন। নাম্বারটা একই। তার মানে মি. দেশমুখই আমাকে ফোন করেছেন।

তাড়াতাড়ি বাটন টিপে বললাম— হ্যালো। ও দিক থেকে মি. দেশমুখ বললেন— মি. কুন্তল, বস আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করেছেন। সেটা আপনাকে জানিয়ে দিতে বললেন।

—উনি এখন কোথায়?

—সেটা বলা যাবে না। উনি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

এটাই আমি আশা করছিলাম। তবুও বললাম—উনি কি হোটেলে ফিরবেন না?

—নো আইডিয়া। আপনি যদি হোটেলে থাকতে চান, থাকতে পারেন। আর যদি থাকতে না চান, তা হলে রিসেপশনে চাবিটা দিয়ে চলে যেতে পারেন। আর হ্যাঁ, রিসেপশনে মিস সুষমা বলে একজনন ডিউটিতে আছেন। ওঁর কাছে একটা জিনিস রাখা আছে। সেটা আপনি কালেক্ট করে নেবেন। ভুলবেন না কিন্তু।

—কী জিনিস মি. দেশমুখ?

—বলতে পারব না। আমি ঠিক জানি না।

—মি. দেশমুখ, মিস পটেল কোথায়, জানেন?

—উনি বস-এর সঙ্গেই আছেন। ওকে, ছাড়ি তা হলে? পরে কথা হবে।

আমি আর কোনও প্রশ্ন করার আগেই ও দিক থেকে মিঃ দেশমুখ লাইনটা কেটে দিলেন। ওঁর ব্যস্ততা দেখে তখনই আমার মনে হল, বিপদ একেবারে ঘাড়ের কাছে। হোটেলে আর এক মিনিট থাকা মানে, গভীর খাদে লাফিয়ে পড়া। ডিভান ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিলাম। ভোরবেলায় যে সুটকেসটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তার থেকে কোনও জিনিসই আমি বের করিনি। সেই বন্ধ অবস্থাতেই পড়ে আছে। চট করে বাথরুমে ঢুকে টুকিটাকি জিনিসগুলো তুলে কিট ব্যাগে ভরে নিলাম। তার পর সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এলাম করিডোরে।

মাথায় কিছু ঢুকছে না। মুম্বইয়ে বোম্ব ব্লাস্ট হয়েছে। পটেলভাইয়ের একজন কর্মী তাতে মারা গেছেন। পটেলভাইয়ের প্রেমিকা মিসেস দুমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এতে পটেলভাইয়ের আত্মগোপন করার কী কারণ থাকতে পারে? লিফটে নামার সময় মনে মনে কারণগুলো খোঁজার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও হদিশ পেলাম না। থাক, পটেলভাইয়ের কথা ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে নিজেকে বাঁচানো দরকার। কে বলতে পারে, পটেলভাইয়ের খোঁজে পুলিশ এই হোটেলে এখন নজরাদারি করছে কি না?

পুলিশ ইচ্ছে করলে জানতেই পারে, পটেলভাইয়ের আতিথ্যে হোটেলে আর কে কে আছে? মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। কম্পিউটার থেকে যে কোনও রিসেপশনিস্ট এই তথ্যটা বের করে দেবে। এমনও হতে পারে রিসেপশনে চাবি ফেরত দেওয়ার সময়ই পুলিশ আমায় বলতে পারে, আপনিই মি. দত্ত? চলুন, আপনাকে এক বার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমাকে ওরা কীভাবে জড়িয়ে দেবে কে জানে?

নিচে নেমে দেখি, লাউঞ্জে বেশ ভিড়। কোনও বিয়ে-টিয়ে আছে বোধহয়,

অবাঙালি কোনও পরিবারের বিয়ে। পশ্চিম দিকে সুইমিং পুলের ধারে গানের আসর বসেছে। হিন্দি গানের সুর ভেসে আসছে। আশপাশে সুবেশা, সুখী কিছু মুখ। এই হোটেলেই এক বার বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলাম। বছর দুয়েক আগে। রত্ন ব্যবসায়ী নেমিচাঁদ সুরজমল-এর মেয়ের বিয়েতে। সে দিন কি জানতাম, ভবিষ্যতে কোনও এক দিন চোরের মতো বেরিয়ে যেতে হবে এই হোটেল থেকে?

ধীর পায়ে রিসেপশনে পৌঁছতেই পিছন থেকে কে যেন ডাকল —আরে কুন্তলবাবু, আপনি এখানে?

চব্বিশ

ডাক শুনেই বুকের রক্ত চলকে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, আই বি-র দিব্যেন্দুবাবু। এই ভদ্রলোকই কয়েক মাস আগে আমাদের বাড়িতে গেছিলেন ইয়াকুবের হুমকির ব্যাপারে তদন্ত করতে। ভদ্রলোককে দেখে উত্তর দেওয়ার বদলে আমার মুখ থেকে পাল্টা প্রশ্ন বেরিয়ে এল— আপনি এখানে?

—আর বলবেন না, মশাই। মুম্বইয়ে একটা ব্লাস্ট হয়েছে। সেই ব্যাপারেই একজনের খোঁজে এখানে এসেছি। আপনি চিনতেও পারেন ভদ্রলোককে। আপনাদের লাইনেরই। একজন নামকরা ডায়মন্ড মার্চেন্ট বিলাসমুখ পটেল। আজ দুপুরেও এই হোটেলে ছিলেন বলে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে। চেনেন না কি?

সত্যি কথাটা বললে অনেক অসুবিধা। তাই একটু চিন্তা করার ভঙ্গিতে কপালে ভাঁজ ফেলে বললাম—বিলাসমুখ পটেল? নামটা খুব শোনা মনে হচ্ছে। আমার বাবা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। ভদ্রলোক কি ব্লাস্টের সঙ্গে জড়িত?

—এক রকম...তা বলতে পারেন। ডায়মন্ডের বিজনেস করার সঙ্গেসঙ্গে ভদ্রলোক ইদানীং ইললিগাল আর্মস বিজনেসে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মুম্বই পুলিশ মনে করছে, এই ব্লাস্টের সঙ্গে ইললিগাল আর্মস ডিলারদের সম্পর্ক আছে।

লিফট দিয়ে নামার সময়ে যে উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, দিব্যেন্দুবাবু সেই উত্তরটা দিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে আরও কিছু জানা যায় কি না, তা বের করার জন্য বললাম— ইললিগাল আর্মস মানে?

—আরে মশাই, পিস্তল থেকে পরমাণু বোমা বানানোর মশলা—সব কিছুই আজকাল কালো বাজারে কেনাবেচা হয়। কাগজে উগ্রপন্থীদের উৎপাতের খবর পড়েন না? এ সব এত বেড়েছে কীসের জন্য? বেআইনি অস্ত্র ওদের হাতে প্রচুর। ওরাই এখন ইললিগাল আর্মসের মেন বায়ার। কিছু হিরের ব্যবসায়ী এই সব ট্রানজাকশনে আছেন।

—কীভাবে?

—সে অনেক লম্বা গল্প। তা, আপনি এখানে কেন সেটা তো বললেন না?

হাতে সুটকেস। অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে পরে প্রবলেমে পড়তে পারি। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' টাইপের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। বললাম— আজ সকালের প্লেনে মুম্বই যাচ্ছিলাম। ফ্লাইট ক্যানসেলড। যারা নিয়ে যাচ্ছিল, তারাই এখানে নিয়ে এল। একটু আগে ওরা বলল, কাল সকালের আগে কোনও ফ্লাইট অপারেট করবে না। তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

দিব্যেন্দুবাবু বললেন— মুম্বই এয়ারপোর্টের যা অবস্থা শুনলাম, তাতে কাল-পরশুও ফ্লাইট অপারেট করবে কি না সন্দেহ। বিজনেসের কাজে যাচ্ছিলেন বোধহয়?

—হ্যাঁ। ডায়মন্ড একজিবিশন।

কথাটা বলেই আমি হাঁটতে শুরু করলাম। যাতে দিব্যেন্দুবাবু আর কথা বাড়ানোর সুযোগ না পান। পুলিশের লোক। জেরা করা ওদের অভ্যেস। ফট করে মুখ দিয়ে কী বেরিয়ে যাবে কে জানে? ইয়াকুবের সেই হুমকির সময় অল্প দু'তিনবার মুখোমুখি হয়ে আমি টের পেয়ে গেছি দিব্যেন্দুবাবু বেশ দুঁদে টাইপের অফিসার। ভদ্রলোককে এড়িয়ে যাওয়া দরকার।

কিন্তু উনি পিছু ছাড়বেন বলে মনে হল না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি তো মশাই শুনেছি ডায়মন্ড এক্সপার্ট। চলুন, আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। আপনি তো নর্থ ক্যালকাটার দিকে যাবেন। আমারও একটা কাজ আছে ও দিকে। আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?

—আমি ট্যাক্সি করে...

—তা হলে আমার সঙ্গে চলুন। আমি একটা অ্যাম্বাসাডার নিয়ে এসেছি।

মনটা খচ করে উঠল। ভদ্রলোক নর্থ ক্যালকাটায় ঠিক কোথায় যাবেন জানি না। যদি আমাকে বাড়ি অবধি লিফট দেন, তা হলে মুশকিলে পড়ে যাব। আমাদের বাড়িটা উনি ভাল মতো চেনেন। বাড়ি অবধি তো যাওয়া যাবে না। কাছাকাছি কোথাও নেমে যেতে হবে। কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওযার আগে রিসেপশনে মিস সুষমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। দেশমুখ ওঁর কাছে কী একটা জিনিস রেখে গেছেন। সেটা চেয়ে নিতে হবে। দিব্যেন্দুবাবুকে তাই বললাম—আপনি একটু দাঁড়ান। আমি রিসেপশনে এক বার কথা বলে আসি।

সুটকেসটা ওঁর জিম্মায় রেখেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রিসেপশনে গেলাম। নীল সিল্কের শাড়ি পরা দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলল— ক্যান আই হেল্প ইউ, স্যার?

বললাম—মিস সুষমাকে একটু দরকার।

সেই মেয়েটাই বলল—আমি মিস সুষমা। আপনি কুন্তল দত্ত?

—হ্যাঁ।

—দাঁড়ান, আপনাকে একটা জিনিস দেওয়ার আছে। আপনার ঘরে ফোন করেছিলাম। অনেক ক্ষণ রিং হয়ে গেল।

কথাগুলো বলেই ডেস্কের ভেতর থেকে মখমলের একটা ছোট্ট থলি বের করে মিস সুষমা আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়েই বুঝতে পারলাম, জিনিসটা কী? আমার সেই হিরের আংটি। পটেলভাইকে যেটা বিক্রির জন্য দিয়েছিলাম। কিন্তু পটেলভাই এটা ফেরত দিলেন কেন বুঝলাম না। আশ্চর্য! উনি আমাকে পাঁচ লাখ টাকা আগাম দিয়েছিলেন। সেই টাকাটা তা হলে ফেরত নিলেন না কেন? প্রশ্নটা মনে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল। এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আগে দিব্যেন্দুবাবুকে এড়ানো দরকার।

থলিটা প্যান্টের পকেটে পুরে দিব্যেন্দুবাবুর কাছে এসে বললাম—চলুন।

...অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা হোটেল থেকে বেরনোর পরই দিব্যেন্দুবাবু বললেন—কুন্তলবাবু, আপনাদের দেখলে খুব সম্ভ্রম জাগে বুঝলেন। কত বড় বংশের ছেলে আপনি। এই সে দিনই আপনাদের কথা হচ্ছিল, মশাই। আপনার বাবার সঙ্গে না কি আমাদের কর্তাদের খুব দহরম মহরম আছে?

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবুও বললাম— হ্যাঁ। ওঁরা প্রায়ই আসেন।

—আমাদের আই বি-র শ্যামলবাবু তো আপনাকেও ভালমতো চেনেন। আপনি না কি খুব ভাল গণৎকার। ওঁর মুখেই সেদিন শুনলাম।

গণৎকার কথাটা শুনে কেমন যেন লাগল। অ্যাস্ট্রোনজার কথাটা শুনে আমি অভ্যস্ত। এই এক সমস্যা। দিব্যেন্দুবাবু না আবার আমাকে জ্যোতিষী করতে বলেন। মাথার ভেতর সব গুলিয়ে গেছে। এখন মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছে। একটু পরে কোথায় যাব, রাত্তিরটা কোথায় কাটাব— যার মাথায় এই চিন্তা কিলবিল করছে, তার পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করতে যাওয়া অসম্ভব। কোনও উত্তর না দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গাড়ি রেস কোর্সের পাশ দিয়ে ছুটছে। আজ বোধহয় বড় কোনও রেস ছিল। রেস কোর্সের লোহার রেলিং ধরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর বেলায় বেলভিউ নার্সিংহোম থেকে যখন হোটেলের দিকে যাচ্ছিলাম, তখনও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। নার্সিংহোমের কথা মনে পড়তেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মা এখন কেমন আছে কে জানে? এখন ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে। তার মানে আমাদের বাড়ির সবাই এখন নার্সিংহোমে। হয়তো টোটা আর লালিও আছে। টোটা যদি কোনও কাজে আটকেও যায়, লালি মায়ের বেডের পাশে থাকবেই। মাকে ও খুব ভালবাসে। আমার তো মনে হয়, দুপুরে ও বাড়ি ফিরেও যায়নি। হয়তো সারা দিনই

নিচে লাউঞ্জে বসে কাটিয়ে দিয়েছে। নার্সিংহোম থেকে চলে আসার সময় লালির করুণ মুখটা হঠাৎই চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর তখনই কেন জানি না, আমার চোখের কোণটা ভিজে গেল।

—কী ভাবছেন, কুন্তলবাবু?

দিব্যেন্দুবাবুর কথায় সম্বিত ফিরে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম— কিছু না। কী বলছিলেন, বলুন।

—আপনার একটু সাহায্য দরকার।

—কী ব্যাপারে?

—মুম্বইয়ের ব্লাস্টের ব্যাপারে। কলকাতায় আজই আমরা এক ফরেনারকে অ্যারেস্ট করেছি। ভদ্রমহিলার কাছে কিছু ডায়মন্ড পাওয়া গেছে। কিছু দিন আগে অ্যান্টোয়ার্পের ডায়মন্ড সেন্টার থেকে প্রচুর ডায়মন্ড ডাকাতি হয়েছিল। আমাদের সন্দেহ, এই ভদ্রমহিলার পজেশনে যে ডায়মন্ডগুলো পাওয়া গেছে, তা অ্যান্টোয়ার্পের খোয়া যাওয়া মাল। ডায়মন্ডগুলো দেখে আপনাকে বলে দিতে হবে, আমাদের সন্দেহটা ঠিক কি না? পুলিশে তো ডায়মন্ড এক্সপার্ট নেই। আপনিই পারবেন বলে দিতে।

অ্যান্টোর্পের হিরে ডাকাতির খবরটা টিভিতে শুনেছি। পুরো ঘটনাটি পরে খবরের কাগজেও পড়েছি। একটি কৌতূহলও আছে ওই হিরেগুলো সম্পর্কে। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু যে ফরেনার সম্পর্কে কথাগুলো বলছেন, তিনি মিসেস দুম না কি? কথাটা মনে হতেই সতর্ক হয়ে গেলাম। মিসেস দুম-এর গ্রেফতার হওয়ার খবরটা টিভিতে নিজের চোখে দেখেছি। গ্রেফতার যে কলকাতায় হয়েছেন, তা কিন্তু টিভিতে বলেনি। দুইয়ে দুইয়ে চার। মিলে যাচ্ছে। যত দূর সম্ভব যে হোটেলটা ছেড়ে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছি, সেখান থেকেই দিব্যেন্দুবাবুরা মিসেস দুমকে তুলে নিয়ে গেছেন। তার মানে দুপুরবেলা থেকেই ওঁরা অপারেশনে নেমেছেন।

দিব্যেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। কিছু একটা বলা দরকার। তাই বললাম— অ্যান্টোয়ার্পের খোয়া যাওয়া হিরে এত তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে আসবে আমার মনে হয় না।

দিব্যেন্দুবাবু বললেন— ইন্টারপোল কিন্তু তাই বলছে। ওদের ধারণা, বেলজিয়াম থেকে দু'একদিনের মধ্যেই হিরেগুলো লাটাভিয়ায় গেছিল। সেখান থেকে কোনও এক ডায়মন্ড ডিলার-এর প্রাইভেট প্লেনে চলে আসে কাঠমান্ডুতে। সেখান থেকে কলকাতায়। ওই হিরেগুলো দিয়েই আর্মস কেনার চক্রান্ত হচ্ছিল। কোনও কারণে হিস্যা নিয়ে গন্ডগোল হওয়ায় মুম্বইয়ে ব্লাস্ট।

কথাগুলো শুনছি, আর বুকের ভেতরটা ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। মিলে

যাচ্ছে। কথাগুলো সব মিলে যাচ্ছে। পটেলভাই লাটাভিয়ায় গেছিলেন। কাঠমাণ্ডুতেও। ওঁর নিজের প্লেন আছে। দিব্যেন্দুবাবুরা সঠিক নিশানাতেই এগোচ্ছেন। পটেলভাইয়ের পক্ষে সম্ভব এই চক্রান্তের মধ্যে থাকা। তবুও মনে একটা খটকা, বেআইনি অস্ত্র কেনাবেচায় হিরে হাত বদল হবে কেন? সে তো ডলার বা পাউন্ডে হওয়া উচিত।

প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দিব্যেন্দুবাবু বললেন— ডিলটা বুঝতে পারছেন না, তাই না? ভেরি সিম্পল। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যারা ইললিগাল আর্মসের ব্যবসা করে, তারা এখন আর ডলার বা পাউন্ড নিতে চায় না। একে তো নোট গচ্ছিত রাখার সমস্যা। তার ওপর ডলার বা পাউন্ডের দাম খুব ওঠানামা করে। তার চেয়ে হিরের বিনিময়ে কেনাবেচা অনেক সহজ। অল্প জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়। যে কোনও দেশে গিয়ে বিক্রি করা যায়। যথেচ্ছ দাম পাওয়া যায়। তাই অস্ত্র চোরাকারবারিদের লোভ হিরের ওপর। বেশিরভাগ হিরের ব্যবসায়ীর সঙ্গেই ওদের যোগাযোগ থাকে।

সকালে প্লেনে পটেলভাইয়ের অত বিচলিত হওয়ার কারণটা এইবার বোঝা যাচ্ছে। উফ্ মারাত্মক বেঁচে গেছি, ওঁর সঙ্গে মুম্বইয়ে না গিয়ে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। একবার পটেলভাইয়ের ব্যবসায় ঢুকে গেলে আমাকে কোথায় ফাঁসিয়ে দিতেন কে জানে? এই যে নতুন একটা ব্যবসায় আমাকে পার্টনার হিসাবে নেবেন বলছিলেন, সেটা এই চোরাকারবারের কিনা কে বলতে পারে?

চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পটেলভাইয়ের পিছনে কলকাতার পুলিশ লেগে গেছে। আমার মনে হয় না, এত ক্ষণ উনি কলকাতায় আছেন। মিসেস দুম-এর গ্রেফতার হওয়ার খবরটা উনি নিশ্চয়ই জানেন। সঙ্গেসঙ্গেই হয়তো সে খবর উনি পেয়ে গেছেন। বেলা তিনটের সময়কার ঘটনা। এখন প্রায় ছ'টা। এই তিন ঘণ্টায় প্লেনে করে অন্য দেশে চলে যাওয়া ওঁর মতো মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। ঢাকায় চলে যেতে পারেন, কাঠমাণ্ডু এমনকী ব্যাংককেও।

পটেলভাইয়ের চিন্তায় মাথা এমন গিজগিজ করছিল, খেয়ালই করিনি গাড়ি লর্ড সিনহা রোড দিয়ে চলছে। বিরাট হলদে রঙের একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। দিব্যেন্দুবাবু তো নর্থ ক্যালকাটায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাকে লিফট দিতে চেয়েছিলেন। তা হলে আমাকে লর্ড সিনহা রোডের এই বাড়িতে নিয়ে এলেন কেন? কম্পাউন্ডে ঢোকার সময় এক ঝলক বাইরে ফলকের লেখাটা চোখে পড়ল। এ তো আই বি-র অফিস!

দরজা খুলে দিব্যেন্দুবাবু বললেন— কুন্তলবাবু, নেমে আসুন। আপনাকে এক বার ওপরে যেতে হবে।

কথা বলার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগল না। বললাম— কেন?

—সেটা ওপরে গেলেই বুঝতে পারবেন।

—কিন্তু আপনি তো আমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তুলেছিলেন।

—বাড়িতে কি আপনি যেতেন মশাই? আজ সকালেই তো আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

চমকে উঠলাম। ওহ, তা হলে দিব্যেন্দুবাবু সব খবর জানেন। নিশ্চয়ই বাবার সঙ্গে এঁরা কেউ কথা বলেছেন। মাই গড। তা হলে পটেলভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও এঁরা জানেন। আর সেই কারণেই হোটেল থেকে আমাকে তুলে এনেছেন। দিব্যেন্দুবাবু কি তা হলে আমাকে অ্যারেস্ট করলেন? কথাটা মনে হতেই সারা শরীর হিম হয়ে গেল।

রাত্তিরটা কোথায় কাটাব, বিকেল বেলা থেকে এই চিন্তাটাই মাথায় ঘুরছিল। সেটা দুর করে দিলেন দিব্যেন্দুবাবু। রাত একটার সময় বললেন— এখানেই আমাদের একটা গেস্ট রুম আছে। সেখানে রেস্ট নিন! পরের কথা কাল সকালে ভাবা যাবে।

শরীর ভীষণ ক্লান্ত। আমি আর বসে থাকতে পারছিলাম না। রাত দশটা থেকে প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আই বি-র দু'তিনজন অফিসার আমার পেট থেকে এত কথা বের করে নিয়েছেন যে, আমার আর কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম। তার আগে দিব্যেন্দুবাবু বিরিয়ানি খাইয়েছিল। বাইরের রেস্তোরাঁর খাবার কখনও খাই না। তবুও না করতে পারিনি। পেট ভরে যাওয়ার পর টের পেলাম, শরীর জুড়ে প্রচণ্ড অবসাদ।

গেস্ট রুমে দুটো সিঙ্গল খাট। জানলার দিককার খাটে নরম বিছানায় শোয়ার পরই প্রথম যে প্রশ্নটা মনে এল, সেটা হল, দিব্যেন্দুবাবুদের হাত থেকে ছাড়া পাব কবে? এঁরা অবশ্য কেউ আমাকে অসম্মান করেননি। একটা কটু কথাও কেউ বলেননি। বরং এমন ভাব দেখালেন, পটেলভাইয়ের দু'নম্বরি ব্যবসার সঙ্গে যে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, সেটা এঁরা ভালমতো জানেন। পটেলভাই কলকাতায় আসার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত কী কবেছেন, এঁরা শুধু সে সব কথাই জানতে চাইলেন।

সন্ধেবেলায় এই অফিসে ঢোকার সময় মিসেস দুম-কে একটা ঘরে একা বসে থাকতে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। উনি আমায় দেখতে পাননি। দু'হাতে মুখ ঢেকে তখন কী যেন ভাবছিলেন। ওঁকে দেখার পরই আমি ঠিক করে নিই, পটেলভাইয়ের সম্পর্কে দিব্যেন্দুবাবুদের কাছে কোনও কিছুই লুকোব না। যা জানতে চাইবেন, আমার জানা থাকলে, উত্তর দেব। পুলিশের কাছে গোপন করব না। শুধু দুটো কথা বলিনি। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে হিরের আংটি পাওয়ার কথা। আর সেটা বিক্রি করার জন্য পটেলভাইয়ের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা বায়না নেওয়ার কথা।

ওঁরা যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন হঠাৎ একটা ফোন এল। দিব্যেন্দুবাবু উঠে গিয়ে সেই ফোনটা ধরেছিলেন। কথাবার্তায় বুঝলাম, পটেলভাইয়ের প্লেনটাকে না কি ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে দেখা গেছে। ইন্টারপোল এই খবরটা পাঠিয়েছে কলকাতার পুলিশের কাছে। পাইলট না কি জ্বালানি ভরতে চেয়েছিল। থাই এয়ারপোর্ট জ্বালানি দেয়নি। তার পরই প্লেনটা আকাশে উড়ে যায়। কোন দিকে গেছে, তা জানা যায়নি। ওই সব কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, পটেলভাই খুব বেশি দিন আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন না। খুব শিগগিরই ধরা পড়ে যাবেন।

পঁচিশ

দিব্যেন্দুবাবু আমাকে কিন্তু ধোঁকা দেননি। যে কথা বলে আমাকে আই বি অফিসে নিয়ে এসেছেন, সেটা রেখেছেন। জেরা করার সময় উনি একটা চামড়ার বাক্স নিয়ে এলেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে মেয়েদের মেক-আপ বক্স। ওটা খুলতেই চারদিক ঝলমল করে উঠেছিল। কয়েক কোটি টাকার হিরে। দেখেই বুঝলাম, দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও খনি থেকে সদ্য তুলে আনা। আনকাট।

তার মানে ডি'বিয়ার্স কোম্পানি অ্যান্টোয়ার্পের ডায়মন্ড সেন্টারে হিরের খণ্ডগুলো পাঠিয়েছিল সাইজ মতো কাটা আর পালিশের জন্য। তার আগেই দুষ্কৃতীরা ভল্ট ভেঙ্গে হাতিয়ে নিয়েছে। আর হাত ঘুরে সেটা এসেছে মিসেস দুম-এর জিম্মায়।

হিরেগুলো সম্পর্কে আমার মতামত জানাতেই পুলিশ অফিসারদের মুখে চওড়া হাসি লক্ষ করেছিলাম। পুলিশ সম্পর্কে আমার যা ধারণা, তা পোস্তা থানার পুলিশ দেখে। যারা মানুষের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। কথায় কথায় পয়সা চায়। সাধারণ লোককেও ক্রিমিনাল ভাবে। কিন্তু এই অফিসে এসে পুরো ধারণাটাই বদলে গেল। এঁরা সবাই খুব ভদ্র। সম্মান দিয়ে কথা বলতে জানেন। অন্তত আমার সঙ্গে কেউ একটা কড়া কথাও বলেননি। দিব্যেন্দুবাবু আমার পূর্ব পরিচিত বলেও সেটা হতে পারে। অথবা এঁরা নিশ্চিত, আমি কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত নেই।

—কী মশাই, ঘুমোননি?

চোখটা বুজে আসছিল। দিব্যেন্দুবাবুর গলা শুনে উঠে বসলাম। গেস্ট রুমের অন্য খাটে বসে জুতোর ফিতে খুলছেন। বোধহয় বাকি রাতটা এখানেই গড়িয়ে নেবেন। জুতো দুটো এক পাশে সরিয়ে রেখে উনি ফের বললেন— সেই সক্কাল থেকে একটু বসার সময় পর্যন্ত পাইনি। ভাবলাম, একটু রেস্ট নেওয়া যাক।

বললাম—প্রায়ই এ রকম হয় বুঝি?

—আর বলবেন না। প্রায়ই রাতে বাড়িতে ফেরা হয় না। পুলিশের চাকরিতে

খুব প্রবলেম। বড় ছেলেটার পরীক্ষা শুরু কাল থেকে। এক বার বাড়িতে গেলে ভাল হত। দেখি কাল সকালে এক বার যেতে পারি কি না। জাল প্রায় গুটিয়ে আনা গেছে।

—পটেলভাই কি ধরা পড়েছেন?

—ঘোড়েল লোক। ধরা কি অত সহজ? তবে ওর এক সঙ্গিনীকে আজ একটু আগেই আমরা তুলে এনেছি। পিঙ্কি চ্যাটার্জি। যাকে আপনি দীপা পটেল বলে চিনতেন। হা হা হা, চমকে উঠবেন না মশাই। কে কী, আপনি তা জানবেন কী করে?

কী বলছেন দিব্যেন্দুবাবু! চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। দীপা তা হলে পটেলভাইয়ের মেয়ে নয়? ও বাঙালি। এটা কী করে সম্ভব? মেয়েটার সঙ্গে এত দিন মিশলাম, অথচ আমি টেরই পেলাম না। তা হলে ও এত সুন্দর মরাঠি জানল কী করে? দীপা কলকাতায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এক নিমেষে মাথার মধ্যে পাক খেয়ে গেল। নাহ, কোনও দিনই ও এমন কিছু করেনি, যাতে ওকে আমার বাঙালি বলে সন্দেহ হতে পারে। শুধু মাঝেমাঝে কিছু ক্ষণের জন্য উধাও হয়ে যাওয়া ছাড়া। হ্যাঁ, এটা ছাড়া আর কিছু আমার মনে পড়ল না।

আমাকে হতভম্ব হতে দেখে দিব্যেন্দুবাবু বললেন— ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। বুঝলেন মশাই। ক্রিমিনালদের জগৎটা এখন একেবারে বদলে গেছে। এক ধরনের কর্পোরেট চেহারা নিয়েছে। আপনি বুঝতেই পারবেন না, এমন সফিস্টিকেশন এসে গেছে। এই মেয়েটাকে আমরা দীর্ঘ দিন ধরে খুঁজছিলাম। ওর কপাল খারাপ, আজ ধরা পড়ে গেল।

বললাম— আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।

—টিপস-টা দিয়েছিলেন মিসেস দুম। তখনই ওর গড়িয়াহাটের বাড়িতে দু'জন অফিসারকে পাঠিয়ে ছিলাম। সেখানে অবশ্য ওকে পাওয়া যায়নি। তার পর ওর বাড়ির ফোন ট্যাপ করে আমরা জানতে পারি, পিঙ্কি বেলভিউ নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে। লুকনোর পক্ষে সব থেকে ভাল জায়গা। তবে আমাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সহজ? একটু আগেই ওকে তুলে আনলাম।

—দীপা কি এই বাড়িতেই আছে?

—হ্যাঁ, মিসেস দুম-এর সঙ্গেই ওকে রাখা হয়েছে। পারপাসফুলি।

—তার মানে?

—ওই ঘরে একটা মাইক্রোফোন ফিট করা আছে। ওরা দু'জন নিজেদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা বলবে, তা পাশের ঘরে বসে শোনা যাবে। মিঃ পটেল সম্পর্কে নিশ্চয়ই ওরা আলোচনা করবে। সঙ্গেসঙ্গে তা আমরা জেনে যেতে পারব। তাই ইচ্ছে করেই আমরা ওদের আলাদা ঘরে রাখিনি। মনে হচ্ছে, আমাদের কাজটা ওরাই অনেক হালকা করে দেবে। কেন না, একমাত্র পিঙ্কিই জানে, মি. পটেল এখন

কোথায়?

—দীপা তা হলে কলকাতার মেয়ে?

—আপনি দীপা দীপা করছেন কেন? বলুন পিঙ্কি। হ্যাঁ, ও এই শহরেরই মেয়ে। থাকে মেঘমল্লার বলে অ্যাপার্টমেন্টে। ওর বাবা একজন রিটায়ার্ড জর্জ। নামটা আপনাকে আর বলছি না। শুনলেই চিনতে পারবেন। পিঙ্কির আপব্রিঙ্গিংটা, বুঝতেই পারছেন।

—পটেলভাইয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হল কীভাবে?

—কয়েক বছর আগে পিঙ্কি মুম্বই গিয়েছিল সিনেমায় নামবে বলে। দু'চারটে থার্ড গ্রেডেড সিনেমায় চান্সও পায়। তার মধ্যে একটা সিনেমার ফাইনান্সার ছিলেন মি. পটেল। সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আলাপ মি. পটেলের। মেয়েটা যে ভাল অভিনয় করতে পারে, তা তো আপনিও টের পেয়েছেন। হা হা হা। কিন্তু আসল জায়গায় ওর প্রতিভার স্ফূরণ হল না। ও নিজের দোষেই আন্ডারওয়ার্ল্ডে ঢুকে গেল।

—কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, দীপা অথবা পিঙ্কি, ও যেই-ই হোক, পটেলভাইয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কী?

—কিছুই না। মেয়েটা পটেলভাইয়ের নেটওয়ার্কে মাইনে করা কর্মী।

—আসল দীপা বলে কেউ আছে, না কি তাও নেই?

—আছে। সে থাকে আমেরিকায়। সে অবশ্য মিঃ. পটেলের নিজের মেয়ে। বাবার ওপর রাগ করে সেই মেয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরতেই চাইছে না। শুনেছি, সে না কি খুব গুণী। সাহিত্য অনুরাগিণী এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত।

—বাবার ওপর তার এত রাগ কেন?

—সেটা আমার পক্ষে সঠিক বলা মুশকিল। তবে আন্দাজ করতে পারি। মায়ের ওপর বাবার ইনহিউম্যান টর্চার। যাক গে যাক। আমরা আদা-র কারবারি, জাহাজের খোঁজ করার কী দরকার? মাঝখান থেকে আপনি একটু বোকা বনে গেলেন।

—সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছি। পটেলভাই কেন এই মেয়েটাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন আমার কাছে?

—বুঝতে পারেননি, তাই না? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মি. পটেল পিঙ্কিকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন, ওঁর নেটওয়ার্কে আপনাকে তোলার জন্য। সেটা আপনি ওঁর সঙ্গে মুম্বই গেলেই বুঝে যেতেন। আপনাকে ওঁর দরকার ছিল। আপনি ডায়মন্ড এক্সপার্ট প্লাস একজন খুব ভাল অ্যাস্ট্রোলজার। প্লাস বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছেন। ঝাড়া হাত-পা। আপনাদের মতো ইয়ংম্যানই তো...

কথাটা শেষ করার আগেই দিব্যেন্দুবাবু টান টান হলেন বিছানায়। একটা লম্বা

হাই তুলে বললেন— কাল সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া যাবে। আমি তো বাড়ি যাব, আপনি যাবেন কোথায়? না, না, এখনই বলার দরকার নেই। ভেবেচিন্তে কাল সকালে বললেই হবে। আর হ্যাঁ, কাইন্ডলি শোওয়ার আগে আলোটা নিভিয়ে দেবেন।

সঙ্গেসঙ্গে আলোর সুইচটা অফ করে দিলাম। জানলায় ভারী পরদা। বাইরে থেকে আলো ঢোকার কোনও উপায় নেই। ঘরের ভেতর ঘন অন্ধকার নেমে এল। বাড়িতে এ রকম অন্ধকারের মধ্যে ঘুমোনোর অভ্যাস নেই। তিনতলায় আমার ঘরে আলো নেভালেও ট্রাম রাস্তার হ্যালোজেন আলোর ছটায় ঘরের ভেতর আবছা সব কিছু দেখা যায়। কিছু ক্ষণ বিছানায় চুপ করে বসে থেকে শুয়ে পড়লাম। কাল রাতেও বাড়িতে শুয়েছি। আচমকা সব গরমিল হয়ে গেল। আগামী কাল কোথায় থাকব, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অন্ধকারে চোখ খুলে সে কথাই ভাবতে লাগলাম।

আর কেউ নয়, আমিই দায়ী। এই অবস্থার জন্য। মাকে অস্বীকার করার ফল আমাকে আজ ভুগতে হচ্ছে। মা এখন নার্সিংহোমে কেমন আছে, কে জানে? গত আট দশ ঘণ্টা এত দ্রুত কেটে গেল, মায়ের কথা মনেই পড়েনি। দিব্যেন্দুবাবু এখানে না নিয়ে এলে হয়তো সন্ধেবেলায় টোটাকে ফোন করে জেনে নিতে পারতাম। এত রাতে ওকে আর ফোন করা সম্ভব না। এক বার নার্সিং হোমে ফোন করা যায়। কিন্তু বেলভিউর ফোন নাম্বার আমার জানা নেই। ডা. পটনায়েক অবশ্য আমাকে ওঁর একটা নেমকার্ড দিয়ে ছিলেন। সেই কার্ড আমার জামার পকেটে আছেও। কিন্তু এখন রাত দেড়টা বাজে। ফোন করে ওঁর ঘুম ভাঙালে অসন্তুষ্ট হতে পারেন। মনে মনে ঠিক করলাম, সকাল হলেই ডাঃ পটনায়েককে একটা ফোন করতে হবে।

দু'চোখ বন্ধ করা সত্ত্বেও ঘুম এল না। দিব্যেন্দুবাবু নাক ডাকতে শুরু করেছেন। গভীর ঘুমে ডুবে গেছেন। এই যে সারাদিনের টেনশন, অপরাধীদের পিছন ছোটা, জীবনের ঝুঁকি নেওয়া, কোনও কিছুই ব্যাঘাত ঘটায়নি। অথচ আমার চোখে ঘুম নেই। মায়ের আহত মুখটা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই মুখ ক্রমেই বদলে যাচ্ছে প্রবল ক্রোধে। যেন বলছে— তুই, তুইও আমার অবাধ্য হলি! মা তো আমাকে খুব সামান্যই একটা অনুরোধ করেছিল— আমার খুব ইচ্ছে লালিকে বউ করে আনি। কায়দা করে আমি অন্য কিছু বলে এড়িয়ে যেতে পারতাম। তা হলে কেন, বোকার মতো বিচ্ছিরি ভাবে না করে দিলাম। অবচেতন মনে কি আমি তখন দীপাকেই চাইছিলাম? না, দীপাকে জীবনসঙ্গিনী করার কথা তো কখনও আমি ভাবিনি? মায়ের জন্য বুকটা আমার হঠাৎই হু হু করে উঠল। টোটা তখন ঠিকই বলেছিল। মা তো মা-ই। কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হতে পারে। আমারই উচিত ছিল, রাতে বাড়ি ফেরার পর মায়ের ঘরে গিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরা। তা না করে আমি ফালতু জেদ দেখাতে গেলাম। আমার ছোটবেলায় কম কষ্ট করেছে মা? পিসিমা এক

বার বলেছিল, ছোটবেলায় দোতলায় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আমার মাথায় মারাত্মক চোট লেগেছিল। আমার না কি বাঁচার আশাই ছিল না। নৃপেন ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছিল। না কি বলেছিল, ছেলে যদি বাঁচেও, সারা জীবন আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছেলের মতো বাঁচবে কি না সন্দেহ।

সেটা শুনে মা দুটো দিন হত্যে দিয়ে পড়েছিল আমাদের রাধাকৃষ্ণ জিউর মন্দিরে। শেষে মা-ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পাঁচ দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর আমি ভাল হয়ে উঠি। আমি চোখ খোলায় মা উঠে বসে। ভাল না বাসলে কেউ কি এমনি করে নিজেকে কষ্ট দিতে পারে? আর সেই মাকে প্রতিদান আমি কী দিলাম? ছিঃ, নিজের ওপরই ঘেন্না হতে লাগল।

দরজায় খুট করে একটা শব্দ হল। সঙ্গেসঙ্গে ও দিকে আমার চোখ চলে গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কান খাড়া করে রাখলাম। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাছে বলে মনে হল। বুকটা ধড়াস করে উঠল। এত রাতে যে-ই ঘরে ঢুকুক, তার উদ্দেশ্য ভালো নয়। করিডরের আবছা আলোয় দরজার গোড়ায় একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলাম। তার পরই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভেতর ফের ঘন অন্ধকার। এই সব পরিস্থিতিতে আমার সিক্সথ সেন্স ভাল কাজ করে। হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা অন করতেই চমকে উঠলাম। দীপা! ও এখানে কী করে? আশ্চর্য! এই বিরাট বাড়িতে প্রচুর ঘর। ওকে যে এখানে ধরে আনা হয়েছে, সেটা একটু আগে দিব্যেন্দুবাবুর মুখে শুনেছি। কিন্তু আমি যে এই ঘরেই আছি, তা দীপা জানল কী ভাবে? ওর পরনে জিনসের প্যান্ট, আর টি শার্ট। মুখে উদ্বেগের কোনও চিহ্নই নেই। ওকে ঠিক সে দিনের মতো দেখাচ্ছে, যেদিন ও আমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় গেছিল। ওকে দেখে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— তুমি এখানে? মুখে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে বলল দীপা। তার পর প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে বলল— চলো, আমার সঙ্গে।

ওর হাতে মারণাস্ত্র দেখে বললাম— কোথায়?

—অত উত্তর দেওয়ার সময় নেই। চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি। তোমার পটেলভাই নিচে গাড়ি নিয়ে ওয়েট করছেন। আমাদের উনি নিয়ে যেতে এসেছেন।

বিস্ময়ের ঘোর আমার কাটছে না। বললাম— পটেলভাই নিচে? কী বলছ তুমি? ওঁকে যে পুলিশ দেখলেই ধরবে।

—কেউ ধরবে না। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তিন কোটি টাকার ডিল। এখানকার পুলিশই আমাদের এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেবে। রাত শেষ হওয়ার আগে। শুধু এই লোকটাকেই বাগ মানানো যায়নি। তোমার পটেলভাই বলেছেন, তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এই লোকটাকে শেষ করে দিতে। কথাগুলো বলে

দিব্যেন্দুবাবুর দিকে ইঙ্গিত করল দীপা।

—কিন্তু... আমি তো তোমাদের সঙ্গে যাব না দীপা।

কথাটা পাত্তাই দিল না ও। বলল— যেতে তোমাকে হবেই। আমার হাত ধরে টেনে, আমাকে ওঠাল দীপা। তার পর ফের বলল— এক বার বার্নিং ঘাট যেতে হবে তোমাকে, তার পর এয়ারপোর্ট। তোমার বাড়িরে লোকেরা তোমার জন্য বার্নিং ঘাটে ওয়েট করছেন।

—বার্নিং ঘাটে? কেন?

—তুমি জান না? তোমার মা তো আজ সন্ধেবেলাতেই এক্সপায়ার করে গেছেন। মারা যাওয়ার সময় বার বার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। তোমার বাড়ির লোকেরা ফোনে তোমাকে ধরার অনেক চেষ্টা করেছে। তোমাকে পায়নি।

মা নেই? বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়লাম। মা নেই, ভাবতেই পারছি না। মাথার ভেতরে এক বার চক্কর দিয়ে উঠল। তবে যে দুপুর বেলায় ডা. পটনায়েক বললেন, মায়ের কিছু হয়নি। দীপা সত্যি কথা বলছে তো?

দিব্যেন্দুবাবুর মুখে যে ওর আসল পরিচয় পেয়ে গেছি, সেটা অবশ্য ও জানে না। ও সামান্য একজন থার্ডগ্রেডেড অভিনেত্রী এটা জানার পর থেকে ওর সর্ম্পকে নিশ্চয়ই আমার আর সম্ভ্রম থাকতে পারে না। দীপা টর্চটা নিভিয়ে দিয়েছে। ওর মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তাই আন্দাজ করতে পারলাম না, মায়ের মৃত্যু সংবাদটা সত্যি, না মিথ্যে? আমাকে বসে থাকতে দেখে দীপা তাড়া দিল— কী হল কুন্তল, ওঠো। আমাদের হাতে কিন্তু খুব বেশি সময় নেই।

ওর ফিসফিসানি আমার মাথায় হঠাৎই আগুন জ্বালিয়ে দিল। কেন জানি না, হঠাৎই মনে হল, আমার জীবনে সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাওয়ার জন্য এই... এই মেয়েটাই দায়ী। ও কলকাতায় আসার পর থেকেই লালির ওপর আমার টান একটু একটু করে কমে যাচ্ছিল। লালিকে আমি উপেক্ষাই করতে শুরু করেছিলাম। নাহ, মেয়েটার আসল পরিচয় জেনে গেছি। এখন ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করার কোনও মানেই হয় না। তাই বললাম— পটেলভাইকে জানিয়ে দি ৩, ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব না।

—কেন? হঠাৎ তোমার মত বদলের কারণটা জানতে পারি?

—দেখো পিঙ্কি, তোমাদের দু'নম্বরি কারবার সম্পর্কে আমি সব জেনে গেছি। সব জানার পরও আমি তোমাদের সঙ্গে যাব, এটা ভাবলেই বা কী করে?

শুনে দীপা ওরফে পিঙ্কি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তার পর বলল— মি. পটেলকে তুমি কতটুকু চেনো, কুন্তল? ওঁর খারাপ দিকটা এখনও তুমি দেখোনি।

না, দেখোনি বললে ভুল বলা হবে। এক বার নিশ্চয় টের পেয়েছ, মুম্বইয়ের আর এক ডন ইয়াকুব যখন তোমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল। ইয়াকুবের সঙ্গীসাথিরা কিন্তু এখনও তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মি. পটেল এক বার একটা ফোন করে দিলেই ওরা এসে তোমাকে চোখ বুজে খুন করে যাবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

—তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ পিঙ্কি? ভয় কিন্তু আমি পাই না

—কুন্তল, প্লিজ মাথা গরম কোরো না। চলো, আমার সঙ্গে চলো। আমরা সবাই লাটাভিয়ায় চলে যাচ্ছি। ওখানে কিছু দিন থেকে তার পর পর্তুগাল চলে যাব। মি. পটেল বলেছেন, ওখানেই আমাদের সেটল করে দেবেন। আমাকে লেট ডাউন কোরো না।

পিঙ্কি কী বলছে, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। আমরা বলতে কী বোঝাচ্ছে ও? এই সময় হঠাৎ দিব্যেন্দুবাবুর দিকে চোখ গেল।

ভদ্রলোকের নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেছে। উনি কি জেগে গেছেন? চোখ বন্ধ করে আমাদের কথা শুনছেন? পিঙ্কির কথাগুলো যদি উনি শুনে থাকেন, তা হলে আমার সম্পর্কে অন্য রকম ধারণা করে বসতে পারেন। মনে করতে পারেন, পিঙ্কি সম্পর্কে আমি ওঁকে যা বলেছি, তা মিথ্যে। পিঙ্কির সঙ্গে কথা বাড়ানো আর উচিত নয়। একটু কড়া গলাতেই বললাম— আমাদের সেটল করে দেবেন মানে? কাদের?

—কেন, তোমাকে আর আমাকে। সেই রকম প্ল্যানই তো এয়ার পোর্ট থেকে ফিরে আসার পর আজ উনি করে রেখেছেন। তোমাকে বলার সুযোগই পাননি। আজ কোর্স অব দ্য ইভেন্ট এত কুইক বদলেছে, এখন ওঁর এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভাবার সময়ই নেই। যাক গে সে সব কথা। তুমি চলো। ভোর হওয়ার আগেই এ দেশ ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। সে রকম কথাবার্তা হয়ে আছে এখানকার পুলিশের সঙ্গে। চলো, আমরা নতুনভাবে জীবন শুরু করি।

—ইমপসিবল পিঙ্কি। তোমার একটা কথাও আমার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তোমরা কোরো না। পটেলভাইয়ের হরোস্কোপেই আছে, খুব বেশিদিন উনি পালিয়ে থাকতে পারবেন না। রাজরোষে পড়েছেন। আজ থেকে আট মাস পর ওকে জেলে পচতেই হবে। ওঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। তুমি যদি বুদ্ধিমতী হও, ওঁর সংস্পর্শে আর থেকো না।

—সেটা আমার পক্ষে সম্ভব না। ঠিক আছে, আমার কথা যদি না শোনো, তা হলে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তোমার একগুঁয়েমির প্রাইস তোমাকেই দিতে হবে।

কথাগুলো বলেই পিঙ্কি এ বার আমার দিকে পিস্তল তাক করে ফের বলল— আমি তিন গোনার মধ্যে যদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না যাও, তা হলে এই বিচ্ছিরি কাজটা

আমাকে করতেই হবে। নাউ ওয়ান...টু...দেরি না করে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েদের গায়ে কোনও দিন হাত তুলতে হবে, তা কখনও ভাবতেও পারিনি। তবুও সেই অপ্রিয় কাজটাই আমাকে করতে হল। দাঁড়িয়ে ওঠার পরই ক্যারাটে স্টাইলে বাঁ পায়ে ভর দিয়ে এক পাক শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়েই পিঙ্কির হাত লক্ষ করে একটা লাথি মারলাম। পিস্তলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দিব্যেন্দুবাবুর গায়ে। আর তখনই ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

একলাফে আমার বিছানার কাছে এসে বললেন— কী হল মশাই, বিড়বিড় করে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?

চোখ খুলে দেখি, জানলা দিয়ে পরিষ্কার আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। কে যেন ঘরের ভারী পরদাগুলো সরিয়ে দিয়েছে। বাইরে পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। দরজার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। একটু আগেই পিঙ্কি ওরফে দীপাকে আমি লাথি মেরেছিলাম। পিঙ্কির কোনও চিহ্নই নেই সেখানে। দিব্যেন্দুবাবু একটা লম্বা হাই তুলে বললেন— আপনারা মশাই সুখী মানুষ। স্বপ্ন দেখার ফাঁকেও লোকের সঙ্গে কথা বলেন। আমরা স্বপ্ন দেখার সুযোগও পাই না। কী লাইফ, বুঝতেই পারছেন।

তা হলে এত ক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম! কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, উফ! মা মারা গেছে। মাকে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ভাবনাটা মনে আসতেই চোখের কোণ ভিজে উঠল। না, মনে আর কোনও দ্বিধাই রাখব না। এই বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমি বেলভিউ নার্সিংহোমে যাব। গিয়ে সাধুবাবার পরামর্শমতো মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ক্ষমা চাইব। বিছানায় উঠে বসে আমি বললাম ক'টা বাজে হলতে পারেন, দিব্যেন্দুবাবু?

সাড়ে ছ'টা সাতটা হবে। যাই, মুখ-চোখ ধুয়ে আসি। আপনিও রেডি হয়ে নিন, যদি আমার সঙ্গে বেরতে চান। দিব্যেন্দুবাবু অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে যেতেই আমি মোবাইল সেটটা বের করে সুইচ টিপতে লাগলাম। টোটাদের বাড়িতে রিং হয়েই যাচ্ছে। এত সকালে কোনও দিন ওদের বাড়িতে ফোন করিনি। করাটা উচিত হল কি না, জানি না। কিন্তু মায়ের খবরটা আগে নেওয়া দরকার। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। মা কেমন আছে, সেটা টোটাই বলে দিতে পারবে। আমি জানি, ও সকাল ছ'টায় উঠে পড়ে। এই সময়টায় প্রাণায়াম সেরে নেয়। উঠে এসে ফোন ধরতে টোটা নিশ্চয়ই বিরক্ত বোধ করবে। তবুও আমার উপায় নেই। তাই রি ডায়াল করতেই থাকলাম।

তিন বার রি ডায়াল করার পর ও প্রান্তে লালির গলা— কাকে চান?

ওর গলাটা শুনেই বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল। নিজেকে সামলে কোনও রকমে বললাম— টুম্পাইদা বলছি। মা কেমন আছে লালি?

বুকটা ধড়াস ধড়াস করচে। কী শুনব কে জানে! কিন্তু মায়ের কথা না তুলে লালি খুব উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল— তুমি? তুমি কোথায় টুম্পাইদা? পুলিশ কি তোমায় ছেড়ে দিয়েছে?

লালির প্রশ্নটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। পুলিশ যে আমাকে জিজ্ঞাসাসাবাদ করার জন্য নিয়ে এসেছে, সেটা লালি জানল কী করে? লালি জানা মানে টোটাও জানে। তার মানে আমাদের বাড়ির সবাইয়ের কানে খবরটা গেছে। সঙ্গেসঙ্গে বাবার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাবা নিশ্চয়ই এখন মনে মনে হাসছে। হয়তো ভাবছে, খুব যে ডাঁট মেরে বলে গেল, দত্ত ফ্যামিলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না, এখন কী করবে? সেই তো আমার হেল্পই নিতে হবে।

চট করে যে কথাটা মনে এল, বলে ফেললাম— তুমি কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে তো পুলিশ ধরেনি।

—সে কী! তা হলে দিব্যেন্দুবাবু বলে একজন পুলিশ অফিসার তোমার বাবাকে কাল ফোন করে জানালেন, তোমাকে ওদের কাস্টডিতে রাখা হয়েছে?

—সে কয়েকটা কথা জানার জন্য। অ্যান্টোয়ার্পে কিছু হিরে চুরি হয়েছিল। হাত ঘুরে সেগুলো কলকাতায় এসেছে। দিব্যেন্দুবাবু সেই হিরেগুলো দেখানোর জন্য আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। কাল রাতে ওদের এখানেই ছিলাম। এই এখন বেরিয়ে যাচ্ছি।

—টুম্পাইদা, তুমি ঠিক বলছ তো? তোমার জন্য আমি কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। কেন তুমি এত মাথা গরম করলে কাল নার্সিংহোমে?

—টোটা কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে। তুমি এখন কোথায় বলো তো?

—লর্ড সিনহা রোডে। একটা গেস্ট হাউসে। এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব, জানি না।

—তার মানে? তুমি বাড়ি ফিরবে না?

—না লালি। ও বাড়ির সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে। মায়ের সামনে আমি আর কোনও দিন মুখ দেখাব না।

—তুমি কী গো, টুম্পাইদা? রাগের মাথায় মা একটা কথা বলেছে, আর সেটাই তুমি ধরে রেখেছ? তোমাকে মা কত ভালেবাসে তুমি জান? কাল সন্ধেবেলায় আমাকে কী বলেছে শুনবে? আমার মন ভেজানোর জন্য লালি একটা মিথ্যা কথা বলবে। আমি জানি। ওর কোনও কথা সত্যি বলে ধরার কোনও দরকার নেই। তাই বললাম— থাক লালি। মা কী বলেছে তা আমার জানার দরকার নেই। শুধু বলো, মা কেমন অছে?

—মাকে আজই ছেড়ে দেবে। ডাক্তাররা ছাড়তে চাইছিল না। কিন্তু মায়ের ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক তো তুমি জান। কিছুই মুখে তুলছে না। সব কিছুতেই ঘেন্না। বাধ্য হয়ে ডাক্তাররা তাই বলেছে, বাড়ি নিয়ে যান। তবে সাবধানে রাখবেন।

—মাকে ঠিক কখন ছাড়বে তুমি জান?

—বলেছে তো বেলা বারোটার আগে নিয়ে আসতে। কেন, তুমি যাবে?

—না। এমনিই জানতে চাইলাম। টোটাকে বোলো, আমি ফোন করেছিলাম। ঠিক আছে, আমি ছাড়ছি তা হলে। ভাল থেকো।

—ছাড়ছি মানে? তুমি জানো, নার্সিংহোমে গেলে মা কার কথা প্রথমেই জানতে চাইবে? তোমার কথা। কী বলব আমি?

—কেন মা তো বলেইছে, কোনও দিন আমার মুখদর্শন করবে না।

—ছিঃ টুম্পাইদা। তোমার মুখে অন্তত এ কথা মানায় না। আমি জানি, কেন মা তোমার ওপর রাগ করেছে। মা আমায় সব বলেছে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যা চাও না, তা কোনও দিন হবে না। আমার জন্য তোমাদের মধ্যে মন কষাকষির কথা শোনার পর থেকে খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমি তো খুব তুচ্ছ একটা মেয়ে, টুম্পাইদা। আমি জানি, আমি তোমার যোগ্য না। আমার জন্য তুমি মাকে ছেড়ে যাবে কেন? প্লিজ, তুমি বাড়ি ফিরে এসো।

লালি কথাগুলো বলছে আর আমার বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল করছে। লালি তো জানে না, কাল যা ঘটেছে, তার পর থেকে আমি একেবারে বদলে গেছি। লালি যদি তুচ্ছ মেয়ে হয়, তা হলে পৃথিবীর কোনও মেয়েই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। কিন্তু কথাটা এখন ওকে বোঝাই কী করে? ইচ্ছে তো করছে, এখান থেকে বেরিয়েই আমি নার্সিংহোমে চলে যাই। বাড়ির অন্য কেউ নার্সিংহোমে পৌঁছবার আগে মায়ের কাছে গিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরি। মা কি তখন পা দুটো সরিয়ে নেবে? কে জানে? নিতেও পারে। মা প্রচণ্ড জেদি। বাবার মতো বাজে লোককেও এক আধটা সময় সেই জেদের কাছে মাথা নিচু করতে দেখেছি।

—কী হল... কোনও কথা বলছ না কেন টুম্পাইদা?

—টোটাকে বোলো ঘুম থেকে উঠে যেন আমাকে এক বার ফোন করে।

—বলব। কিন্তু তুমি আমার কথার জবাব দিলে না যে?

—তোমার কী কথার?

—বাড়ি ফিরছ কি না?

—সেটা সম্ভব না। হ্যাঁ, একটা কথা মাকে তুমি বলতে পারবে?

—কী... বলো।

—মাকে বোলো, পারলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। কথাটা বলেই আমি

লাইন কেটে দিলাম। সেই সঙ্গে মোবাইলের সুইচও অফ করে রাখলাম। যাতে লালি ফোন করে আর আমাকে ধরতে না পারে।

মোবাইল সেট পকেটে চালান করতে না করতেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দিব্যেন্দুবাবু বললেন— সাতসকালে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, কুন্তলবাবু?

ভদ্রলোক তা হলে বাথরুম থেকে আমার গলা পেয়েছেন। বললাম— আমার এক বন্ধুর সঙ্গে।

—বন্ধু, না বান্ধবী? বলে হা হা করে হেসে উঠে দিব্যেন্দুবাবু বললেন—না না মশাই, চমকে ওঠার কোনও প্রয়োজন নেই। বাথরুমে কোনও মাইক্রোফোন রাখা নেই। স্রেফ আন্দাজ। পুলিশে চাকরি করি তো। মুখ দেখে আমরা অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারি। আপনার মতো বয়সে আমারও এক আধজন বান্ধবী ছিল মশাই।

বললাম— তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার বিয়ে হয়নি।

—কারেক্ট! কী করে বুঝলেন আপনি?

—আন্দাজ। স্রেফ আন্দাজ। দীর্ঘ দিন ধরে তো জ্যোতিষচর্চা করছি। তাই আপনাকে দেখে আন্দাজ করতে পারছি। আপনি মকর রাশির লোক। আপনি প্রেম করে বিয়ে করতেই পারেন না।

—বাঃ এক্সেলেন্ট। আমাকে দেখে আর কী আন্দাজ করেছেন, বলবেন?

—আপনি খুব সৎ। সেই জন্যই আপনাকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো না। এখন উনি খুবই অসুস্থ। ওঁর চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। আরও বলব?

—মাই গড। দিব্যেন্দুবাবু ডিভানে বসে পড়লেন। আমার কথাগুলো শুনে উনি এত অবাক হয়েছেন যে, চোয়াল ঝুলে গেছে। হাতে ধরা তোয়ালে দিয়ে এক বার মুখ মুছে উনি বললেন— আপনার তো দেখছি, অনেক দিকে প্রতিভা। আমাকে দেখে আপনি বুঝে গেলেন, আমার স্ত্রী অসুস্থ? কী করে বুঝলেন?

রসিকতা করে বললাম— কপাল দেখে। সব কিছু ওখানে লেখা থাকে। যারা পড়তে পারে, তারা জেনে যায়। ঘাবড়াবেন না। টাকার জোগাড় হয়ে যাবে। আপনার স্ত্রীও সুস্থ হয়ে যাবেন।

—অসম্ভব। কী করে জোগাড় হবে মশাই? জানেন, কত টাকা দরকার আমার? এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা।

—বললাম তো। টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। ভূতে জোগাবে। আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না জানি না। টাকা পেয়ে গেলে আমার কথা মনে রাখবেন।

—মনে রাখব মানে? আপনাকে আমি ছাড়ছি না মশাই। হাত-টাত দেখায়

আমি বিশ্বাস করি না। তবুও সত্যি বলছি, আপনি আমাকে আজ বিরাট বাঁচা বাঁচিয়ে দিলেন। দাঁড়ান ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা লিখে রাখি। মনে হয়, আপনাকে আমার ফের দরকার হবে।

...মিনিট পনেরো পর দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে নিচে নামতেই দেখি, মিসেস দুম আর দীপাকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে। দীপা আমার দিকে এক বার তাকিয়েই মুখ নিচু করে ফেলল। গত কালও তাজ হোটেলে ওকে দেখেছি। একটা রাত্তিরের মধ্যে মেয়েটা কী অদ্ভুত বদলে গেছে। পরনে অতি সাধারণ সালোয়ার কামিজ। যে অবস্থায় ছিল, পুলিশ সেই অবস্থায় ওকে তুলে এনেছে। মুখটা কালো হয়ে গেছে। চুল উসকো-খুসকো। ওকে চেনাই যাচ্ছে না। পুলিশ ওর বিরুদ্ধে কী চার্জ দেবে, সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে ও যে সহজে নিষ্কৃতি পাবে না, সেটা কাল দিব্যেন্দুবাবুর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি। হঠাৎই একটা কথা মনে হল, এই দীপা যখন আমাকে ওর হরোস্কোপ দেখিয়েছিল, তখন কেন বুঝতে পারিনি, পটেলভাইয়ের মতো ওকেও রাজরোষে পড়তে হবে। নাহ্, এর প্ল্যানেটারি পজিশনে এমন কোনও ইঙ্গিতই ছিল না। থাকলে আমার চোখে পড়তই। একটা জিনিস অবশ্য তখন দেখেছিলাম, নিকট ভবিষ্যতে ওকে প্রচণ্ড হ্যাপার মধ্যে পড়তে হবে। ওই সময়টায় ওর জীবনে বড় ধরনের একটা দুর্যোগ নেমে আসবে। ওটা অবশ্য আমি বিচার করেছিলাম, ওকে পটেলভাইয়ের মেয়ে হিসাবে ভেবে নিয়ে। পটেলভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা না জেনে যদি আমি দীপার হরোস্কোপটা দেখতাম, তা হলে হয়তো বিচারটা অন্য ভাবে করতাম।

নিচে নেমে দিব্যেন্দুবাবু কোনও একটা ঘরে ঢুকেছিলেন। যখন বেরিয়ে এলেন, দেখি ডান হাতে আমার সুটকেস। বাঁ হাতে মোবাইল। কানে ধরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। দীপাদের নিয়ে পুলিশের গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর সুইচ অফ করে উনি বললেন— এই নিন ভাই, আপনার সুটকেশ। চলুন, সাদা অ্যাম্বাসাডারটায় ওঠা যাক। উফ, একটা টেনশন কাটল।

দুজনে গাড়িতে ওঠার পর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে দিব্যেন্দুবাবু বললেন— নিন ভাই, একটা রেখে দিন। আপনার কাজে লাগবে। আমার খুব একটা অভ্যাস নেই। বেশি টেনশন হলে কখনও সখনও দু'একটা খাই। এই প্যাকেটটা আর আমার কাজে লাগবে না বলে মনে হচ্ছে।

সিগারেটের প্যাকেটটা নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ফিরিয়ে দিলে ভদ্রলোক কিছু মনে করতে পারেন বলে রেখে দিলাম। কাল সন্ধেবেলায় ওই বাড়িতে ঢোকার পর থেকে আমি নিজেও সিগারেট খাইনি। একটা ধরালে মন্দ হত না। কিন্তু খালি পেটে সিগারেট খেতে নেই। কথাটা মনে হতেই ইচ্ছেটা চাপা দিলাম। লর্ড সিনহা রোড

থেকে গাড়িটা বেরিয়ে থিয়েটার রোড ধরতেই দিব্যেন্দুবাবু এক বার হাতঘড়ির দিকে নজর বুলিয়ে বললেন— আপনি কোথায় নামবেন বলুন। আগে আপনাকে নামিয়ে আমি এক বার ভবানী ভবনে যাব।

কাল রাতে ছেলের পরীক্ষার কথা বলেছিলেন দিব্যেন্দুবাবু। কথাটা মনে পড়তেই বললাম— সে কী, আপনি বাড়ি যাবেন না?

—যাওয়ার তো খুব ইচ্ছে ছিল ভাই। কিন্তু এই মাত্র ডিজি আমাকে ডেকে পাঠালেন। একটা সুখবর আছে। মি. পটেল ধরা পড়েছেন। আপনাকে বলেছিলাম, খুব শিগগির ধরা পড়ে যাবেন। আজ বিকেলের মধ্যেই ওঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্বটা পুরো আমার ওপরই পড়ল। এই কেসটাকে ওমনভাবে আমায় সাজাতে হবে, যাতে আপনার পটেলভাই পালিয়ে যাওয়ার ফাঁক না পায়।

ওঁকে থামিয়ে বললাম—একটা কথা বলব দিব্যেন্দুবাবু?

— বলুন।

—কেসটা খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করবেন কিন্তু। পটেলভাইয়ের হাত অনেক লম্বা। আমি জানি, দিল্লির অনেক মিনিস্টার ওঁর হাতে আছেন। সরকারি বড় বড় আমলারাও। তার পর আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজন তো আছেই। লোকটা হাজার মাইল দূরে বসেও আপনার ক্ষতি করে দিতে পারে।

—আমার কপাল কী বলছে, বলুন তো। লুকোবেন না। মার্ডার-টার্ডার হওয়ার সম্ভাবনা আছে না কি? থাকলে আগে থেকে বলে দিন। অ্যালার্ট হয়ে যাই,

কথাগুলো দিব্যেন্দুবাবু এমন ভাবে বললেন, আমি হেসে বললাম— না, আপাতত সে চান্স নেই। বরং উল্টোটাই আমার মনে হচ্ছে। আর অল্প কিছু দিনের মধ্যে আপনার পদোন্নতি হবে।

—এ বার আমি আপনাকে একটা কথা বলি।

দিব্যেন্দুবাবু হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠতে দেখে বললাম— বলুন।

—পারলে কয়েক দিনের জন্য আপনি অন্য কোথাও চলে যান। মানে... কলকাতায় যদি না থাকেন, তা হলে ভাল।

হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

—রোজ ক্রিমিনালদের ঘাঁটছি। ওদের সাইকোলজি জানি। এই একটু আগে পিঙ্কি বলে মেয়েটা এখানে আপনাকে দেখে ফেলল। আমারই ভুল... এই সময়টায় আপনাকে নিয়ে নিচে নামাটা আমার উচিত হয়নি। ডেফিনিটলি এই খবর ওই মেয়েটা আপনার পটেলভাইয়ের কানে তুলে দেবে। তখন মি. পটেলের ধারণা হবে, আপনি আমাদের নানা ইনফর্মেশন দিয়েছেন। আপনি আমাকে যে ভয়টা দেখালেন,

সেই বিপদে কিন্তু আপনিও পড়তে পারেন। না না, আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না। তবুও সাবধান থাকতে তো কোনও ক্ষতি নেই। পারলে আজই কোথাও চলে যান। কলকাতার বাইরে আপনার কোনও রিলেটিভ টিলেটিভ নেই?

—সে রকম কেউ নেই।

—তা হলে মুশকিল হল। অবশ্য খুব বেশি দিন আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হবে না। মি. পটেলকে আমার কলকাতায় দু'এক দিনের বেশি রাখবও না। ওকে হয়তো ইন্টারপোল কর্তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ওঁরা কাল-পরশুর মধ্যেই চলে আসবেন। তাই বলছিলাম, মি. পটেল যত দিন কলকাতায় থাকবেন, তত দিন আপনি একটু বাইরে চলে গেলে ভাল হয়।

—ভেবে দেখি তা হলে। আপনি কি আমাকে এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিতে পারবেন?

—স্বচ্ছন্দে। চলুন তা হলে। আর একটা কথা, যেখানেই থাকুন, কোনও রকম প্রবলেম দেখলে সঙ্গেসঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই কেসটা নিয়ে মিডিয়ার লোকজন এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, টিভিতে একটু নজর রাখলেই খুঁটিনাটি সব খবর পেয়ে যাবেন। ফলে কী হচ্ছে না হচ্ছে, জানার কোনও অসুবিধে নেই। এই যে বলতে বলতেই রিপোর্টারের ফোন এসে গেছে। দাঁড়ান ভাই, আগে কথা সেরে নিই।

বুক পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে দিব্যেন্দুবাবু কথা বলতে লাগলেন। বোধহয় ও প্রান্ত থেকে রিপোর্টার জানতে চাইছেন, মি. পটেল ধরা পড়েছেন কি না। দিব্যেন্দুবাবু তাঁকে বার বার একই কথা বলতে লাগলেন, বিকেলে ডি জির ওখানে আসুন। ভাল খবর পেয়ে যাবেন। উনি ছাড়া এই কেসটা নিয়ে আর কেউ কিছু বলতে পারবেন না। মোবাইলের সুইচ অফ করা মাত্রই আবার ফোন। আবার দিব্যেন্দুবাবু একই কথা বলতে লাগলেন। সকাল আটটা-সওয়া আটটা বাজে। এত সকালে কি রিপোর্টাররা অফিসে চলে আসেন? তা হলের কাগজের অফিস বন্ধ হয় কখন?

মোবাইলের সুইচ অফ করে বাকি রাস্তাটায় আর একটা কথাও বললেন না দিব্যেন্দুবাবু। একটু অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আমাকে নামিয়ে দেওয়ার সময় শুধু বললেন— সাবধানে থাকবেন। চলি।

সাদা অ্যাম্বাসাডারটা ফের দক্ষিণমুখী হওয়ার পর হঠাৎই নিজেকে খুব একা মনে হল। পর ক্ষণেই যে প্রশ্নটা চেপে ধরল, যাব কোথায়? সুটকেসের ভেতর লাখ পাঁচেক টাকা আছে। যে কোনও হোটেলে গিয়ে আপাতত ওঠা যায়। কিন্তু গ্রান্ড, তাজ

আর গ্রেট ইস্টার্ন ছাড়া আমি যে আর কোনও হোটেলের নামও জানি না। ও সব জায়গায় দিনে পাঁচ সাত হাজার টাকা আমাকে গচ্চা দিতে হবে। আমার যা আছে, তাতে এই সব হোটেলে থাকতে গেলে টেনে টুনে মাস তিনেকের মতো চালানো যাবে। না না, এই ভাবে টাকাটা উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

ওই টাকাটা খুব ভাইটাল আমার কাছে। কোনও কারণে যদি সুটকেস খুলে দেখি, টাকাটা নেই, তা হলে সব শেষ। টাকাটা সুটকেসে রাখার পর থেকে খুলে আমি আর দেখিনি। কাল রাতে সুটকেস আমার সঙ্গে ছিল না। লর্ড সিনহা রোডের অফিসে আবার কেউ হাপিস করে দেয়নি তো? কথাটা মনে হতেই টেনশন শুরু হয়ে গেল। নাহ, এখুনি এক বার চেক করা দরকার। তা হলে সুটকেসটা খুলতে হবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খোলা যায় না। একটা জায়গা অবশ্য আছে। জোড়াবাগান পার্কে আমার ক্লাব। হ্যাঁ, ক্লাবে আমার নিজের একটা আলাদা রুমও আছে। সেই চাবি সব সময় আমার সঙ্গে থাকে। একটা ট্যাক্সি করে জোড়াবাগান পার্কে মিনিট কুড়ির মধ্যেই চলে যাওয়া যায়। তার পর কোথায় যাব, সেটা না হয় পরে ভাবা যাবে। একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। হাত দেখিয়ে থামিয়ে উঠে পড়লাম। ক্লাবে ছেলেরা এখন প্র্যাকটিস করছে। সমীর বড়ালও থাকবে। বহু দিন ক্লাবমুখো হইনি। এই ক'দিনে ক্লাবের অন্য ছেলেদের সমীর কতটা পটিয়ে ফেলেছে কে জানে? কাজ কম্ম কিছু করে না। বাপের পয়সায় বসে বসে খায়। ইদানীং ক্লাবের দিকে নজর পড়েছে। আমাকে হটিয়ে ও সেক্রেটারি হতে চায়। আমার ওপর ওর আসল রাগ অবশ্য অন্য কারণে। ক্যারাটে শিখতে এসেছিল সাত-আট বছর আগে। কিচ্ছু শেখেনি। ওই দুধ-ঘি খাওয়া শরীর নিয়ে কি ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়? আমি মেডেল পেতাম আর সমীর হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরত।

বাচ্চা শুয়োরটা আবার বিয়ে করতে চাইছে লালিকে। কী স্পর্ধা! কথাটা মনে হতেই রাগে আমার গা রি রি করে উঠল। বিয়ে করাচ্ছি। এমন শিক্ষা দেব, জীবনেও আর লালির ধারে-কাছে ভিড়বে না। কিন্তু লালি যদি ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়, তা হলে? মেয়েদের মন। লালি রাজি হয়েও যেতে পারে। মা কেন ওকে বলতে গেল, ওকে বিয়ে করার ব্যাপারটা নিয়েই মায়ের সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়েছিল। কোনও মেয়ে কি এই প্রত্যাখ্যান সহজভাবে মেনে নিতে পারে? বিশেষ করে যে মেয়ের আত্মসম্মান বোধ আছে? লালি তো আজ বলেই দিল, তুমি যা চাও না, তা কোনও দিন হবে না। তার মানে তুমি আমাকে যদি বিয়ে করতে না চাও, তা হলে আমিও সেই বিয়েতে রাজি হব না। ইস, মায়ের মুখে কথাটা শোনার পর লালির মনের অবস্থাটা কী হয়েছিল, ভাবতেই আমার কষ্ট হতে লাগল।

আমারই দোষ। ছিঃ, লালিকে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হয়নি। এই বার

মাথায় ঢুকল, কাল নার্সিংহোমে কেন লালি আমার সঙ্গে আগ বাড়িয়ে এসে কথা বলেনি। মুখ নিচু করে ও দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক বউদির পাশে। আমি তো ওকে ভাল মতো জানি। ও মচকাবে, তবু ভাঙবে না। ঠিক আমার মায়ের মতো। বেনে বাড়ির মেয়ে। এক ধাতুতে গড়া। আমার মাকে দেখে ও বড় হয়েছে। ওর সব কিছু মায়ের মতো। একটা জিনিস ছাড়া। একটা বদ অভ্যাস। মিথ্যে কথা বলা। তিলকে তাল করে দেওয়া। কম ভুগেছি আমি ওর কথা বিশ্বাস করে?

জোড়াবাগান ক্লাবে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত লালিই আমার মনটা জুড়ে রইল। ওর হয়ে মনে মনে যুক্তি আর পাল্টা যুক্তি সাজাতে থাকলাম। লালি কি সত্যিই মিথ্যে কথা বলে? না কি ওটাকে একটু রং চড়ানো কথা বলা যায়? এই যে কিছু দিন আগে বুলবুলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, তখন ও আমাকে বলেছিল, বুলবুল না কি আমাকে পাওয়ার জন্যই সন্তোষী মায়ের পুজো করে। শুনে তখন আমার খারাপ লাগেনি। তবে পরে তো বোঝাই গেল, কথাটা সত্যি নয়। বুলবুল সন্তোষী মায়ের পুজো করে ঠিকই। কিন্তু সেটাকেই রং চড়িয়ে লালি আমার কাছে পেশ করেছিল, স্রেফ বুলবুলের ওপর আমার টান বাড়ানোর জন্য। এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

তারও পরে বউদির কাছে লালি এক বার বলল, বুলবুল না কি কোন এক মারোয়াড়ি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। সেই ছেলেটা না কি প্রায় কলেজের গেটের সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে অবশ্য ভালই করেছিল। ওই খবরটা লালি একটু বাড়িয়ে বলেছিল। এ কথা সত্যি, ছেলেটার নজর পড়েছিল বুলবুলের ওপর। তার নামও জানি— সূরজ আগরওয়াল। সমীর বড়ালদের বন্ধু। বড়লোক বাপের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে। ছেলেটা বুলবুলকে প্রায়ই ফলো করত বটে, তবে তার গাড়িতে কখনও বুলবুল ওঠেনি। ওই গাড়ি চড়ে বেড়াতে যাওয়াটার অংশটা লালির সংযোজন।

এটা তো পরিষ্কার মিথ্যে কথা। লালি বলতে গেল কেন? প্রশ্নটা মনে আসতেই ট্যাক্সিতে সিধে হয়ে বসলাম। তার মানে, লালি ভাঙচিটা দিয়েছিল ইচ্ছে করেই। যাতে বুলবুলের সঙ্গে আমার বিয়েটা ভেঙে যায়। ও চায়নি, আমার গলায় অন্য কেউ ঝুলে পড়ুক। হ্যাঁ, এটাই কারণ। কথাটা কি লালি বলেছিল, নিজের স্বার্থের কথা ভেবে? হতে পারে। তা হলে তো ধরে নিতে হয়, দত্ত বাড়িতে ছোট বউ হয়ে ঢোকার স্বপ্ন ও মনে মনে দেখছে। দেখবেই বা না কেন? স্বপ্নটা হয়তো ওকে মা-ই দেখিয়েছে।

এত দিন এ সব তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মাথাই ঘামাইনি। আজ হঠাৎ জলের মতো সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বউদির পিসতুতো ভাইয়ের বিয়ের সময়কার একটা কথা

[illegible] এই তো গত বছরের কথা। দর্জিপাড়ার শীলবাড়ি। আমদের আত্মীয় স্বজনদের সবার নেমন্তন্ন সেখানে। বউভাতের দিন সকালে মা আমার হাতে একটা ছোট্ট বাক্স দিয়ে বলল, এটা লালিকে দিয়ে আয় তো বাবা। আমি বললাম, এতে কী আছে মা? মা বলল, গয়না। বিকেলে মেয়েটা বিয়ে বাড়িতে যাবে। খালি হাতে গেলে ভাল দেখাবে না। আমি ফোন করে ওকে বলে দিচ্ছি, এই গয়নাগুলো যেন পরে শীলবাড়িতে যায়। সাবধানে নিয়ে যাস।

মায়ের পিছনে লাগার জন্য আমি তখন বলেছিলাম, তোমার গয়না ওকে পরতে দেবে কেন মা? মা চটে গিয়ে বলেছিল, এত কোশ্চেন করার দরকার কী রে তোর হতভাগা? গয়নাগুলো ওকে দিয়ে আসতে বলছি, তুই দিয়ে আসবি। এই গয়নাগুলো আমি ওর জন্য রেখে দিয়েছি। ...মনে পড়ছে। এখন সব মনে পড়ছে। সে দিন সন্ধেবেলায় শীলবাড়িতে গিয়ে লালিকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। বেনে বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে মেয়েরা সারা শরীর গয়নায় মুড়িয়ে যায়। এটাই দস্তুর। কিন্তু অত মেয়ের মধ্যে লালিকে দেখে রাজ রাজেশ্বরীর মতো মনে হয়েছিল। সারাক্ষণ ও মায়ের পিছন ঘুরঘুর করছিল। আর মা ডেকে ডেকে সবাইকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। তখন বুঝতে পারিনি। আজ মনে হচ্ছে, মা বোধহয় সে দিন সবাইকে দেখাতে চেয়েছিল, এই দেখো এ আমার ছোট বউ। কেমন মেয়েকে আমি দত্ত বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে। আর তখনই ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল জোড়াবাগান পার্কের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে ক্লাবে ঢুকতেই হইহই করে দু'তিন জন ছেলে বেরিয়ে এসে বলল— কুন্তলদা তুমি? এত দিন কোথায় ছিলে?

বললাম— খুব ব্যস্ত ছিলাম রে। চল ঘরে গিয়ে বসি। ছেলেগুলো মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। একজন বলল— তোমার ঘর তো বন্ধ, টুম্পাইদা। ঘরের চাবি এখন সমীরদার কাছে।

শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বললাম— তার মানে?

—তুমি কিচ্ছু জানো না? সমীরদা তো ক্লাবের সেক্রেটারি হয়ে গেছে।

—সে কী? কীভাবে হল?

—কালই তো ক্লাবের ইলেকশন ছিল। তোমাকে আমরা এত খুঁজলাম। তোমার বাড়ির লোকও কিছু বলতে পারল না। সমীরদা আনকনটেস্টেড ইলেক্টেড হয়ে গেল। কত দিন ক্লাবে আসোনি তুমি বল তো?

PATHAGAR

ধপ করে একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়লাম। ক্লাবটাও আমার হাতছাড়া হয়ে গেল! আমার পয়সায় গড়ে তোলা এই ক্লাবে এখন আমার কোনও অধিকার নেই?

আশ্চর্য! বললাম— ক্লাবে ইলেকশন, খবরটা মোবাইলে কেউ আমায় দিলি না? আমার নাম্বারটা তো খাতায় লেখা আছে।

—আমি বার কয়েক চেষ্টা করেছিলাম, টুম্পাইদা। কাল সমীরদা এসে বলল, তোমার বাবা না কি তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তুমি না কি বোম্বাই চলে গেছ। তাই আমরা আর তোমার খোঁজ করিনি।

কথাগুলো শুনে চুপ করে গেলাম। কোনও কথা চাপা থাকে না। আমার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা সমীর নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির কারও মুখে শুনেছে। কোনও চাকর-বাকরের মুখে বোধহয়। সেই কথাটাই একটু প্যাঁচ মেরে এখানে বলে বাচ্চা শুয়োরটা নিজের ফায়দা তুলেছে। এক বার ইচ্ছে হল, দৌড়ে ওর বাড়িতে চলে যাই। টেনে বের করে আচ্ছা মতো পেটাই। পরক্ষণেই ইচ্ছেটা চাপা দিলাম। নাহ, সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ফের কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব কে জানে?

এ রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কখনও পড়িনি। কী করব, বুঝতে পারছি না। মাল্টিজিমে আরও দু'তিনটে ছেলে ব্যায়াম করছে। আমার দিকে তাকিয়ে একটা ছেলে কী যেন বলল। সঙ্গেসঙ্গে অন্য দুটো ছেলে হেসে উঠল। সমীরের দলের ছেলে মনে হয়। ক্রমে ক্রমে এদের সংখ্যাই ক্লাবে ভারী হয়ে যাবে। নাহ, আর এখানে বসে থাকার মানে হয় না। বেঞ্চ থেকে ওঠার সময় হঠাৎই মনে হল, কী যেন সঙ্গে নেই। সুটকেস! ট্যাক্সি থেকে নামার সময় আমি সুটকেসটাই নামাতে ভুলে গেছি!

শরীরের ওপর থেকে একটা বরফের স্রোত নীচের দিকে নামতে থাকল। মাই গড! কেন এই ভুলটা করলাম। আমি? সুটকেসে পাঁচ লাখ টাকা ছিল। ওই টাকা আর ফেরত পাওয়া যাবে? ইস। ওই টাকাটাই তো এত ক্ষণ আমার মনে শক্তি জোগাচ্ছিল। এখন কী হবে? ট্যাক্সি থেকে নামার সময় নাম্বারটা দেখিওনি। পুলিশের কাছে গেলেও কোনও লাভ হবে না। এই শহরে কয়েক হাজার ট্যাক্সি। কোন ট্যাক্সিতে আমার সুটকেস ফেলে এসেছি, তা খুঁজে বের করা কি চাট্টিখানি কথা?

টোটা বলত, জীবনের চরম বিপদের দিনেও কখনও বুদ্ধিভ্রষ্ট হবি না। মাথাটাকে খুব ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করবি। সেই বিপদ থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারিস, তার রাস্তা খোঁজার কথা ভাববি। দেখবি, ভগবান একটা না একটা রাস্তা ঠিক দেখিয়ে দেবেন। বিপদের সময় প্যানিক মাথায় চাপতে দিলে, তুই মারাত্মক ভুল করবি। হঠাৎ টোটার ওই কথাগুলো কেন মনে পড়ল, বুঝতে পারলাম না।

ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছ থেকে যখন ট্যাক্সিতে উঠেছিলাম, তখন ড্রাইভারের সামনের দিকে জয় রাম বলে একটা স্টিকার মারা ছিল। সেটা অবশ্য বড় কোনও সূত্র হতে পারে না। এ রকম কয়েক শো ট্যাক্সিতে জয় রাম স্টিকার পাওয়া যাবে। ড্রাইভারের মুখটাও আমি ভাল করে দেখিনি। তখন শুধু লালির কথাই ভাবছিলাম।

মনে পড়ল, ড্রাইবার মিটার ডাউন করার সময় হিন্দিতে এক বার জিজ্ঞেস করেছিল, কাঁহা যাইয়েগা সাব। তার মানে লোকটা বাঙালি নয়।

—কী হল কুন্তলদা, আপনার শরীর খারাপ লাগছে না কি?

প্রশ্নটা শুনেই মুখ ফেরালাম। ক্ষেমঙ্কর। আমার প্রিয় ছেলে। বউদির কী রকম যেন আত্মীয় হয়। লেখাপড়ায় খুব ভাল। খেলাধুলোয়ও। লক্ষই করিনি, ক্লাবে ও প্রাকটিস করছে। এই ক্লাবে আমার ছেলেদের মধ্যে একমাত্র ক্ষেমঙ্করই আমাকে কুন্তলদা বলে ডাকে। বাকিরা সবাই টুম্পাইদা বলে। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার মুখ দেখে বোধহয় কিছু বুঝতে পেরেছে। আমার যা-ই হোক, ক্ষেমঙ্করের সামনে তা প্রকাশ করা উচিত হবে না। তাই জোর করে মুখে হাসি এনে বললাম— না রে , কিচ্ছু হয়নি। শরীর ঠিক আছে। তুই কেমন আছিস?

—ভাল। মাঝে এক দিন তোমার খুব খোঁজ করছিলাম। একটা ব্যাপারে বাবা তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছিল।

—কী ব্যাপারে, এখন বলা যাবে?

—না, এখন আর দরকার নেই। ব্যাঙ্গালোরে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। ওখানে যাব কি না ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত গেলাম না। বাবার ততটা আপত্তি ছিল না। কিন্তু মা বারণ করল। তখনই বাবা বলেছিল, কুন্তলের সঙ্গে আলোচনা করে দ্যাখ। ও কী বলে।

—তোর মা বারণ করল কেন?

—মা-বাবার একটাই ছেলে আমি। বুঝতেই তো পারছ।

—মাকে তুই খুব ভালবাসিস বুঝি?

—খুউব। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া জীবনে বড় হওয়া যায় না কি? ব্যাঙ্গালোরে না গিয়ে আমি ঠিক করি নি বলো? ক্ষেমঙ্কর খুব সরলভাবে বলল বটে কথাটা কিন্তু যেন বুকে এসে ধাক্কা মারল। এই কথাটা তো একটা সময় আমি আর টোটা প্রায়ই আলোচনা করতাম। চোখের কোণে হঠাৎ জল এসে গেল। ক্ষেমঙ্কর আমার উত্তরটা শোনার জন্য খুব উৎসাহভরে তাকিয়ে আছে। পাছে ওর চোখে ধরা পড়ে যাই, তাই অন্য দিকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে বললাম— তুই ঠিক করেছিস রে।

—দিদা কেমন আছে গো, কুন্তলদা? মা বলছিল, এখন না কি নার্সিংহোমে?

—ভাল আছে। আজই বাড়ি চলে আসবে।

—মা এক বার তোমাদের বাড়ি গিয়ে দিদার খোঁজ নিয়ে আসতে বলেছিল। কিন্তু সময়ই পেলাম না। ফোন করেছিলাম। বার বার রিং হয়ে গেল, কেউ ধরলই না। তখন বুঝলাম, বাড়িতে কেউ নেই। সবাই দিদাকে নিয়ে ব্যস্ত। কথাটা বলতে

বলতে ক্ষেমঙ্কর পার্কের গেটের দিকে তাকিয়ে বলল— কুন্তলদা ওই দেখো, তোমাকে বোধহয় ডাকতে আসছে। এই ভদ্রলোক তোমাদের দোকানের এমপ্লয়ি না? ওর কথা শুনে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি, বিষ্ণুকাকা। ট্যাক্সি থেকে নামছে। কিন্তু বিষ্ণুকাকা এখানে এল কী করে? জানলই বা কীভাবে আমি ক্লাবে এসেছি? আমাকে কি বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে? অসম্ভব। পকেটে মাত্র দু'তিনশো টাকা পড়ে আছে, আমি খুব বিপদের মধ্যে। ক্লাব থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব জানি না। তবুও বাড়ি ফিরছি না। বিষ্ণুকাকা আমাকে যত রিকোয়েস্টই করুক।

ক্লাবঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে বললাম— কী ব্যাপার বিষ্ণুকাকা?

—ট্যাক্সিতে সুটকেস ফেলে রেখেছিলে?

—হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?

—আরে, কী অদ্ভুত কাণ্ড দ্যাখো। দেশের বাড়িতে যাব বলে, গনেশ টকি-র মোড় থেকে এই ট্যাক্সিটা ধরেছিলাম। পিছনের ডিকি-তে আমার সুটকেসটা রাখব বলে তুলতেই দেখি কার এটা সুটকেস যেন পড়ে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখি, সাদা কাগজে তোমার নাম আর ঠিকানা লেখা। সঙ্গেসঙ্গে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, আগের প্যাসেঞ্জারকে কোথায় নামিয়েছ? ও জোড়াবাগান পার্কের কথা বলল। তখনই বুঝলাম, এ সুটকেস তোমার না হয়ে যায় না। নাও চলো, তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিই। কী হত বলো তো, যদি আমি না হয়ে অন্য কোনও প্যাসেঞ্জার ট্যাক্সিটা ধরত?

এমনও ঘটনাও ঘটে তা হলে? বললে কেউই বিশ্বাসই করতে চাইবে না। নাহ, সময়টা যত খারাপ যাচ্ছে ভেবেছিলাম, ততটা যাচ্ছে না বোধহয়। এক লাফে বিষ্ণুকাকার সামনে গিয়ে বললাম— কই, সুটকেসটা, কই?

—ট্যাক্সিতে। চলো, আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিই।

—বাড়িতে আমি যাব না বিষ্ণুকাকা।

—এ বোকামি কোরোও না টুম্পাই। আমি জানি, কী কারণে তুমি বাড়ি ছেড়ে গেছ। তোমার বাবা কালই আমার কাছে খুব দুঃখ করছিলেন। আরে ভাই, রক্তের সম্পর্ক কি অত সহজে ত্যাগ করা যায়? বাবা-মায়ের ওপর রাগ করে তুমি ক'দিন থাকতে পারবে? একটা পরিবারের মধ্যে থাকতে গেলে ও রকম অনেক মনোমালিন্য হয়ই। বাড়ি না গেলে তুমি থাকবেটা কোথায় শুনি?

—জানি না। এখনও ঠিক করিনি।

—এটা কোনও কাজের কথা হল টুম্পাই? তুমি এত বিচক্ষণ ছেলে, তোমার মুখে এ সব ছেলেমানুষি কথা মানায়? ঠিক আছে, বাড়ি ফিরে যেতে যদি তোমার এতই অনিচ্ছে, তা হলে আমার সঙ্গে চলো। সারা জীবন তোমাদের বাড়ির নুন

খেয়েছি আমি। তোমাকে এ ভাবে ছেড়ে দিতে আমি পারব না ভাই।

—তোমার সঙ্গে যাব? কোথায়?

—কেন, আমার বাড়িতে? চলো না, দিন কয়েক ওখানে কাটিয়ে আসবে। মন-টন ভাল হয়ে গেলে, তার পর না হয় একটা কিছু ডিসিশন নিও।

বিষ্ণুকাকা মন্দ বলছে না। সুটকেস ফিরে পাওয়া, বিষ্ণুকাকার সঙ্গে এ ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কোনও ইঙ্গিত আছে। যা ঘটছে, ঘটতে দেওয়া যাক। বিষ্ণুকাকার দেশের বাড়িটা ঠিক কোথায় আমি জানি না। হয়তো বলেছিল, আমার মনে নেই। ছোটবেলা থেকে বিষ্ণুকাকাকে দেখছি। কোনও দিন মানুষটাকে জিজ্ঞেসও করিনি, শনিবার দুপুরে দোকান থেকে বেরিয়ে কোথায় যায়? আবার সোমবার দুপুরে কোথা ফিরে আসে? বিষ্ণুকাকার স্ত্রী আর ছেলেকে অবশ্য দেখেছি। দাদার বিয়ের সময় এসে আমাদের বাড়িতেই দিন কয়েক ছিল। আমি গেলে বিষ্ণুকাকার স্ত্রী যে খুশি হবে, তা জানি। দু'বছর আগে বিষ্ণুকাকার বাবার শ্রাদ্ধে আমাদের সবার নেমন্তন্ন ছিল। কিন্তু বাবা আমাকে তখন যেতে দেয়নি। গাড়িতে করে দাদা গিয়েছিল বউদিকে নিয়ে। মনে আছে সকালে বেরিয়ে দাদা রাত্তিরের মধ্যেই ফিরে এসেছিল। বিষ্ণুকাকা পরে খুব আপসোস করেছিল, আমি না যাওয়ায়। বাবার বয়সি এই মানুষটা যে আমায় খুব ভালবাসে, তা সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম। বিষ্ণুকাকার সঙ্গে গেলে আপাতত দুর্ভাবনাটা আমায় করতে হবে না। গত দু'দিনে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো মনের ওপর দিয়ে এমন ঝড় বইয়ে দিয়েছে যে, এখন কোথাও গিয়ে দু'চার দিন একেবারে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তা হলে অন্তত সুস্থভাবে চিন্তা-ভাবনাটা করা যাবে। ক্ষেমঙ্কর একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি চাই না, ওর কানে কিছু যাক। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করলাম—আমরা যাচ্ছিটা কোথায়, বিষ্ণুকাকা?

—নবদ্বীপে। গেছ কখনও ওখানে? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জায়গা। গেলে তোমার খুব ভাল লাগবে।

—কদ্দিনের জন্য যাচ্ছি?

—হপ্তাখানেকের জন্য। পুজো এসে গেলে তো সেই ডিসেম্বর পর্যন্ত আর বাড়ি যেতে পারব না। তাই এই সময়টায় প্রতি বছরই কয়েকটা দিন মায়ের কাছে কাটিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হল, বুঝলে? তোমাকে আমি এমন একজনের কাছে নিয়ে যাব, যাকে দেখলে তুমি খুব অবাকই হবে।

—কে সে বিষ্টুকাকা?

—উহুঁ, এখন বলছি না। তোমার লাইনেরই লোক। নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যরও গুরু। বয়স এখন বিরানব্বই। কিন্তু এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। রোজ গঙ্গাস্নান

করেন। তাঁর কাছে গেলে তোমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

—অ্যাস্ট্রলজার?

—শুধু অ্যাস্ট্রলজার বলাটা ভুল হবে। উনি অনেক উঁচুমার্গের মানুষ। না, আর কিছু বলব না। আগে তুমি তাঁকে দেখো, তার পর ওঁর সম্পর্কে যা বলার বলব।

... বেলা দু'টো নাগাদ নবদ্বীপ ধামে পৌঁছাতেই দেখি, বিষ্টুকাকার ছেলে অর্ক স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় আগেই জানত, আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আসবেন শুনে বাড়িতে আর বসে থাকতে পারলাম না। কেমন আছেন কুন্তলদা?'

প্রায় আমার মাথায় মাথায়। কত বয়স হবে— ষোলো সতেরো? দাদার বিয়েতে যখন গেছিল, তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ছেলেটাকে দেখেই আমার ভাল লেগে গেল। নবদ্বীপে অন্তত কয়েকটা দিন কথাবলার লোক পাওয়া যাবে। হেসে বললাম— ভাল, তুমি এখন কী পড়ছ অর্ক?

—কলেজে। ফার্স্ট ইয়ার। উত্তরটা দেওয়ার সময় আমার হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিল অর্ক। তার পর বলল— বাবা যখন হাওড়া স্টেশন থেকে ফোনটা করল, তখন তো বিশ্বাসই করতে পারিনি আপনি আসছেন। চলুন, রিকশা ঠিক করে এসেছি। আপনি আর আমি গল্প করতে করতে যাই। বাবা অন্য রিকশা নিয়ে নেবে।

—তোমাদের বাড়িটা কত দূরে?

—পোড়া মা তলা বলে একটা জায়গায়। এখান থেকে মিনিট পনেরো লাগবে।

—খুব অদ্ভুত নাম তো জায়গাটার?

—ওখানে একটা মন্দির আছে। খুব জাগ্রত ঠাকুর। আজ সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব। কুন্তলদা, এই ওভারব্রিজটা পেরোতে হবে। আপনার অসুবিধা হবে না তো? আমরা অবশ্য লাইন পেরিয়েই ওপারে চলে যাই।

—না না। আমার কোনও অসুবিধা নেই।

ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে আসতেই দেখি বিষ্ণুকাকা পিছনে নেই। জিজ্ঞেস করতেই অর্ক বলল— বাবা সুশান্তকাকার ওখানে গেলেন বোধহয়। আমার খুড়তুতো ভাইয়ের পৈতে আজ। বাড়ির সবাই ওখানে গেছে।

—ইস, আমি এসে তোমাদের খুব অসুবিধেয় ফেলে দিলাম, তাই না?

—কী যে বলেন! আপনি এসেছেন, আমাদের সৌভাগ্য। চলুন, আর কথা বাড়াবেন না। বাড়িতে গিয়ে চান-টান করে নিন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব টায়ার্ড।

রিকশা করে যাওয়ার সময়ই নবদ্বীপ শহরটাকে আমার ভাল লেগে গেল। কলকাতার মতো বড় বড় বিল্ডিং নেই। বা চওড়া রাস্তা। দুপুর বেলায় সব শুনশান। আঁকা বাঁকা গলি দিয়ে রিকশা যাচ্ছে। অর্ক এক বার বলল— এখানে অনেক কিছু দেখার আছে কুন্তলদা। এক একটা বাড়ির পিছনে এক একটা ইতিহাস। যদি আপনার ইন্টারেস্ট থাকে তা হলে আপনাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাতে পারি।

আমাদের গণেশ টকির পাশ থেকে ইসকনের রথ বেরয়। হঠাৎই মায়াপুরের কথা মনে হল। বললাম— মায়াপুর কত দূর গো?

—যাবেন? গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হয়। ওখানে সাহেবদের মন্দির আছে। দাঁড়ান, আজই বাবার পারমিশন নিয়ে রাখব। যাতে কাল সকালে মায়াপুরে যাওয়া যায়।

আমার কোনও তাড়া নেই। কাল গেলেও হয়, বা দু'দিন পরে। সে কথা তো আর অর্ককে বলা যায় না। তাই চুপ করে রইলাম। হঠাৎই পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গেল। দাদার বিয়ের সময় অর্করা যখন আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তখন এক দিন ওকে তিন তলায় আমার ঘরে নিয়ে গেছিলাম। বাবা সেই সময় ওকে আমার ঘরে দেখে ফেলে। বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছিল। পরে মায়ের মুখে শুনেছিলাম, বাবা না কি বলেছে, ছেলেটা যেন আর ওপরের তলায় না ওঠে। শুনে সে দিন বাবার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল।

দোকানের কর্মচারীর ছেলে। তার মানে সে কখনও আমাদের সমগোত্রীয় হতে পারে না। বরাবর দেখেছি, বাবার ধারণা, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে, শুধু আমাদের স্টেটাসের লোকদেরই। বিষ্ণুকাকা নিজেকে যতই আমাদের পরিবারের একজন বলে মনে করুক না কেন, বাবার চোখে নিছক এক কর্মচারীই। আমার ধারণা, বিষ্ণুকাকাও সেটা ভাল মতো জানে। এই যে বিষ্ণুকাকার বাড়িতে এসে কয়েক দিন থাকব, এই কথাটা বাবার কানে গেলে, বাবা মোটেও তা পছন্দ করবে না। বিষ্ণুকাকা তাই ফিরে গিয়ে কখনও বলবে না, টুম্পাই নবদ্বীপে গিয়ে কয়েকটা দিন ছিল। কথাটা বাবার কানে গেলেও আমার কিছু আসে যায় না। দত্তবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো ত্যাগ করেই ফেলেছি। সম্পর্কটা তো শুরু মায়ের থেকে। সেই মা-ই যখন আমাকে আর চায় না, তখন সম্পর্ক রেখে লাভ কী?

—ডান দিকে দেখুন কুন্তলদা। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অর্কর কথা শুনে ডান দিকে তাকালাম। অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি। ভালো করে দেখতে না দেখতেই রিকশাটা এগিয়ে গেল। অর্ক খুব উৎসাহ নিয়ে নবদ্বীপ সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তাতে জল ঢেলে দিতে ইচ্ছে করল না। বললাম— চৈতন্যদেবের বাড়িটা কোথায়?

—সে নিয়ে অনেক বির্তক আছে। ইসকনের সাহেবরা দাবি করে বটে মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান। কিন্তু এখানকার পণ্ডিতরা তা মানে না। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কুন্তলদা। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব সম্মিলনী বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে। ওরা বলে, শ্রী চৈতন্যের জন্মস্থান না কি গঙ্গাগর্ভে মিলিয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে যদি কথা বলতে চান, তা হলে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের স্কুলে এক মাস্টারমশাই আছেন, যিনি খুব চর্চা করেন এ সব নিয়ে।

— তোমাদের এখানে রাসমেলার সময় খুব হইচই হয়, তাই না?

—খুউব। এখানে আসার বেস্ট টাইম হচ্ছে রাসমেলার সময়। এ সব রাস্তা দিয়ে তখন হাঁটতে পারবেন না। এত ভিড়। বিরাট বিরাট সব ঠাকুর। ভাসানের দিনটা দারুণ লাগে। আমাদের যত আত্মীয়স্বজন আছেন, সবাই তখন চলে আসেন। আমাদের বাড়িটা এমন জায়গায়, ভাসানের সব ঠাকুর ওই রাস্তা দিয়ে যায়। আমাদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালে গোটা নবদ্বীপের ঠাকুর দেখা যায়।

—কী পুজো হয় হয় রাসমেলায়? রাধা-কৃষ্ণের?

—না, না, সব রকম ঠাকুর। কালী, দুর্গা, শিব, চণ্ডী মানে যত রকম দেবদেবী আছে আর কী। এক একটা ঠাকুর পঁচিশ-তিরিশ হাত উচু। কলকাতাতেও অত বড় ঠাকুর হয় কি না সন্দেহ।

—ঠাকুর ভাসানটা কি গঙ্গায় হয়?

—না। অত বড় ঠাকুর গঙ্গায় নামাবে কী করে? পুকুরে হয়। এ বার আসুন না। নভেম্বর মাসে। দেখবেন আপনার ভাল লাগবে।

অর্কর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রিকশা এসে দাঁড়াল দোতলা এক বাড়ির সামনে। আশপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় এ বাড়িকে নতুন বলা যায়। একেবারে রাস্তার ওপরই সদর দরজা। তালা লাগানো। তালা খুলে কাচের দরজা ঠেলে অর্ক বলল— ভেতরে আসুন, কুন্তলদা। ছোট বাড়ি। আপনার খুব অসুবিধে হবে থাকতে। বাড়ির ভেতর বিরাট উঠোন। তাতে টবে প্রচুর বাহারি গাছ দেখে খুব ভাল লাগল। বিষ্ণুকাকার যে গাছের শখ আছে, তা আগে জানতাম না। আমাকে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অর্ক্ বলল— সব আমার গাছ। কৃষ্ণনগরে একটা নার্সারি আছে, প্রায়ই সেখান থেকে গাছ নিয়ে আসি, পরে আপনাকে গাছগুলো চিনিয়ে দেবো। অনেক ধরনের বনসাই আছে।

কথাগুলো বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল অর্ক। ওর পিছনে পিছনে সিঁড়িতে পা দেওয়ার পরই পকেটে মোবাইলটা বেজে উঠল। কানে দিতেই ও প্রান্তে টোটার গলা— তুই কোথায় টুম্পাই? অনেক ক্ষণ তোকে ট্রাই করছি। লাইনই পাচ্ছি না। লালি বলছিল, সকালে তুই ফোন করেছিলি।

টোটার গলা শুনেই আমি কয়েক পা পিছিয়ে এলাম। আমাদের কথাগুলো অর্কর কানে যাতে না যায়। কে জানে, টোটা কী কারণে ফোনটা করেছে? জিজ্ঞেস করলাম— মা কেমন আছে রে?

ভাল। এই তো আমরা বাড়ি নিয়ে এলাম। মাসিমার সঙ্গে কথা বলবি?

তাড়াতাড়ি বললাম—না, থাক।

—তুই কোথায়, তা তো বললি না।

—কলকাতার বাইরে। একটা কারণে তোকে ফোন করেছিলাম।

বাধা দিয়ে টোটা বলল— সত্যি, তোর কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি টুম্পাই। মাসিমার এই অবস্থা, আর তুই কলকাতার বাইরে গিয়ে বসে আছিস? জানিস, সবাই তোর ওপর বিরক্ত হয়ে গেছে। এমনকী তোর বউদিও। তুই ভেবেছিস কী বল তো? বাড়ির সবাইকে চিন্তায় ফেলে তুই কী বোঝাতে চাইছিস?

টোটার গলায় খানিকটা ধমকের সুর। কোনও দিন ও এই ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে না। ওকে আপারহ্যান্ড নিতে দেওয়া যায় না। তাই বললাম— তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার জন্য বাড়ির লোকের ঘুম হচ্ছে না। ছাড় তো। আমার সব জানা হয়ে গেছে। যাক গে, যে কারণে তোকে ফোনটা করলাম, সেটা বলি।

—শোন টুম্পাই, তোর কোনও কথা শোনার ইচ্ছে আমার নেই। তুই একটা স্বার্থপর ছেলে। নিজের সুখের জন্য সব কিছু তুই ভাবতে পারিস। আমার তো লজ্জাই হচ্ছে, তোকে বন্ধু ভাবতাম বলে। তোকে পুলিশ ইন্টারোগেশনের জন্য নিয়ে গেছিল কেন রে? একা একা বড়লোক হওয়ার কথা ভাবছিলি, তাই না? দিব্যেন্দুবাবু এই মাত্র সব রিপোর্ট দিয়ে গেছে মেসোমশাইকে। তোর ভাগ্য ভাল, তুই দত্ত ফ্যামিলির ছেলে। না হলে যে চক্করে তুই ফেঁসেছিলি, তোর নামটা খবরের কাগজে লিক হয়ে যেত। ভেবে দ্যাখ, বাকি জীবনটা তোকে কীভাবে বাঁচতে হত! তুই তো বটেই, তোর জন্য লজ্জায় তোদের ফ্যামিলিরও কেউ মুখ দেখাতে পারত না।

—তুই কী বলছিস টোটা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কী এমন করেছি যে, আমার জন্য বাড়ির লোকেরা মুখ দেখাতে পারত না?

—ভেবে দ্যাখ সেটা। তোর এত দম্ভ, সুস্থভাবে ভাবার শক্তিও এখন হারিয়ে ফেলেছিস। কোনও ভাল কথা তোর কানে ঢুকবে না। আরে... মায়ের মনে দুঃখ দিলে কারও ভাল হতে পারে? দ্যাখ ভাই, আমি দত্ত ফ্যামিলির কেউ না। আমার সঙ্গে রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই। তবুও বলছি, মাসিমার যদি খারাপ কিছু হত, তা হলে তোকে আমি কোনও দিন ক্ষমা করতাম না।

টোটার কথা শুনতে শুনতে আমার রাগই বাড়ছে। অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম— কিন্তু আমার অপরাধটা কী? সেটা তো আগে শুনি? আমার ব্যক্তিগত

পছন্দ-অপছন্দ বলে কিছু থাকতে পারে না?

—রাখ তোর পছন্দ-অপছন্দ। হু কেয়ারস? বাড়িতে তুই মিথ্যে কথাটা বললি কেন, টুম্পাই? তোর তো এই বদ অভ্যাসটা ছিল না?

—মিথ্যে কথা তুই কী বলছিস আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ঠিকই বুঝতে পারছিস। বুঝেও না বোঝার ভান করছিস। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তুই যে একটা দামি হিরে পেয়েছিস, সেই কথাটা বাড়ির লোকেদের কাছে চেপে গেছিস কেন? কেনই বা সেটা পটেলভাইয়ের কাছে বিক্রি করতে গেছিলি? মেসোমশাই তো শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। তুই গোপন করতে চাইলে কী হবে, তোর পটেলভাই কিন্তু হিরের কথাটা মেসোমশাইকে জানিয়ে দিয়েছে। ছিঃ টুম্পাই, তোর এত অধঃপতন হবে, কোনও দিন ভাবতেও পারিনি। তোর এই মিথ্যে কথাটা নিয়েই মাসিমার সঙ্গে সে দিন রাতে মেসোমশাইয়ের খুব অশান্তি হয়েছিল। আর তোর হয়ে কথা বলতে গিয়ে তার পরই মাসিমা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

টোটা আরও কী সব বলে যাচ্ছে। আমার কানে ঢুকছে না। তা হলে মা আর আমার মনোমালিন্যের মাঝে লালির কোনও ভূমিকা নেই? লালিকে আমি বিয়ে করতে চাই না, বলার জন্য মা আমার ওপর রাগ করেনি? তার পরও আমার জন্য বাবার সঙ্গে লড়ে গেছে? গুড্, ভেরি গুড। মনটা হঠাৎই হালকা হয়ে গেল। তার মানে, গত দু'দিন যে কথাগুলো ভেবে আমি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলাম, তার কোনও ভিত্তি নেই। অশান্তির মূলে তা হলে বাবা? আমাকে কোনও কথা বলতে না দেখে টোটা ও প্রান্ত থেকে বলল— কী রে, চুপ করে আছিস কেন? উত্তর দে। হিরেটা তুই পাসনি? হামিদই তো বাক্সটা তোর হাতে তুলে দিয়েছিল।

বললাম— হিরের কথা কেন বাড়িতে বলিনি, শুনতে চাস?

—তার মানে?

—ওটা একটা বিষ পাথর। যে বাক্সটা হামিদ আমার হাতে তুলে দিয়েছিল, তাতে হিরের নিচে একটা চিঠিও ছিল। তাতে লেখা ছিল, হিরেটা অভিশপ্ত। যার কাছে হিরেটা থাকবে, তার পুরো পরিবার অপঘাতে মারা যাবে। এই কারণেই হিরেসহ ওই বাক্সটা দেওয়ালের ভেতর পুঁতে রাখা ছিল। ওই চিঠিটা এখনও আমার দেরাজে রয়েছে। বাড়ি গিয়ে এখুনি দেখে আসতে পারিস।

ও প্রান্তে টোটা কয়েক সেকেন্ড চুপ। এ প্রান্তে আমি মনে মনে হাসছি। সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে এমন একটা গল্প বানিয়েছি, টোটা গিলতে বাধ্য। এ বার আমি আপারহ্যান্ড নিতে পারি। তাই ফের বললাম— একটা কথা অন্তত বউদির কাছে গিয়ে বলিস। হিরের কথা বাড়িতে গিয়ে যদি সে দিন বলতাম, তা হলে বাবা কিছুতেই সেটা হাতছাড়া করত না। এমন লোভী মানুষ তো পৃথিবীতে আর দুটো নেই। তখন

অভিশাপ কুড়োতে হত ফ্যামিলির বাকি সব মেম্বারকে। সেটা আমি চাইনি রে। তাই চুপি চুপি সেটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম পটেলভাইয়ের কাছে। কিন্তু হিরেটা নিজের কাছে মাত্র এক দিন রেখে পটেলভাই মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়ে গেছেন। পুলিশের হাত থেকে এখন বাঁচবেন কি না সন্দেহ। তাই উনিও আমার জন্য হিরেটা হোটেলে রেখে উধাও হয়ে গেছেন। ওই বিষপাথরের জন্য এত অশান্তি আমাকে নিয়ে। ঠিক আছে, ওটা পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবার কাছে। শুধু বউদিকে একটু বলিস, আমাকে যেন ভুল না বোঝে।

—এ সব কথা তুই বউদিকে সে দিন বললি না কেন?

—বলব কখন? বলার পরিস্থিতিই ছিল না। সে দিন রাতে বউদি যখন হিরেটার কথা আমার কাছে জানতে চায়, তার আগেই ওটা আমি পটেলভাইয়ের কাছে দিয়ে এসেছি। তাই অস্বীকার করেছিলাম। যাক গে কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। ছাড়ছি রে। তোরা আমার সঙ্গে আর যোগাযোগের চেষ্টা করিস না। মাকে বলিস কোনও দিন আর মুখ দেখাব না। বলেই লাইনটা আমি কেটে দিলাম। টোটাকে আর কথা বলার সুযোগই দিলাম না।

অর্ক ছেলেটাকে যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এখনও বেশ সহজ সরল। এই বয়সে কলকাতার ছেলেরা অনেক পাকা হয়ে যায়। সিগারেট খেতে শেখে। সিনেমার পোকা হয়ে যায়। কথায় কথায় চালিয়াতি মারে। দিন দুয়েক নবদ্বীপে আছি। এর মধ্যে অর্কর মধ্যে এ সব বদগুণ লক্ষ করিনি। এখনও ডিসকভারি আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ছাড়া টিভিতে ও আর কিছু দেখে না। ওর জগৎটা বাড়ি আর কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সব থেকে যেটা ভাল লাগছে, সেটা হল মা আর বাবার প্রতি টান। ওর এই বয়সটায় আমিও ওর মতো ছিলাম। এখন কত বদলে গেছি।

কাল রাতে বিষ্ণুকাকা খাওয়া দাওয়ার পর বলেছিল, অর্ককে খুব বেশি দূর পড়াবে না। বি. এ. পাশ করার পরই কোনও ব্যবসায় লাগিয়ে দেবে। নিজেও বেশি দিন কলকাতায় থাকবে না। বছর খানেকের মধ্যেই নবদ্বীপে চলে আসবে। আমাকে এক বার বললও— বুঝলে টুম্পাই, প্রায় সারাটা বছর আমি কলকাতায় থাকি। আমার ফ্যামিলি খুবই সাফার করেছে। আর না, এ বার তোমার বাবাকে বলব, রেহাই দিন। বছর দুয়েক আগে থেকেই কথাটা ভাবছিলাম। ঠিক ডিসিশনটা নিতে পারছিলাম না। এ বার মনস্থির করে ফেলেছি।

বারান্দায় বসে আমরা গল্প করছি। নীচের রাস্তায় সারাদিন হাজার লোকের আনাগোনা। কিন্তু সন্ধে সাতটার পর থেকে একেবারে নিঝুম। কমজোরি হলদে বাল্‌বের আলোয় রাস্তাটাকে পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছিল। এখানে পলিউশন কম।

আকাশের তারাগুলো তাই বেশ ঝকমকে। দু'দিনেই টের পেয়ে গেছি, কী নিস্তরঙ্গ জীবন এখানকার লোকেদের! ভালই লাগছিল বসে বসে বিষ্ণুকাকার সঙ্গে গল্প করতে। কথায় কথায় বললাম— অনেক দিন হয়ে গেল দত্ত জুয়েলার্সে, তাই না?

—অনেক দিন। চল্লিশ বছর তো হবেই। তখন তোমার জন্মও হয়নি। ইনফ্যাক্ট, তোমার দাদু যে বছর আমায় চাকরিতে বহাল করলেন, সে বছরই তোমার বাবার বিয়ে হল। আমি বরযাত্রী হিসাবেও গেছি। সে এক বিয়ে হয়েছিল বটে! কত্তা মায়ের বাবা সে সময় তোমার ঠাকুর্দার থেকেও চারগুণ ধনী। কলকাতার বেনে সমাজের মাথা। একমাত্র মেয়ে তোমার মা। খরচও করেছিল, বাপ রে। আসলে উনি তোমার বাবাকে দেখে বিয়েটা দেননি। বিয়েটা দিয়েছিলেন তোমার ঠাকুর্দাকে দেখে।

—ঠাকুর্দাকে দেখে? কেন?

— সে এক আশ্চর্য ঘটনা। তোমার দাদু আর তোমার ঠাকুর্দা রোজ জগন্নাথ ঘাটে চান করতে যেতেন। দুজনের মধ্যে পরিচয় ছিল না। কিন্তু তবুও তোমার ঠাকুর্দা চিনতেন তোমার দাদুকে। তাঁর ঠাটবাটই ছিল আলাদা। মোটরে চেপে গঙ্গাস্নান করতে যাওয়ার মতো লোক তখনকার দিনে ক'জনই বা ছিলেন?

—ঠাকুর্দার সঙ্গে দাদুর আলাপ হল কী করে?

—একটা দুর্ঘটনার পর। সে দিন গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ির বান ছিল। সে ভীষণ একটা ব্যাপার। দু'জনে চান করার সময় হঠাৎ জলের তোড়ে তোমার দাদু ভেসে যান। প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলেন। তোমার ঠাকুর্দা লাইফ রিস্ক নিয়ে তোমার দাদুকে পারে টেনে তোলেন। সেই থেকে দু'জনের বন্ধুত্ব। সমবয়সি, সমগোত্রের। পার্থক্য ছিল আর্থিক অবস্থার। তোমার ঠাকুর্দাকে ব্যবসায় হেল্প করতে চেয়েছিলেন তোমার দাদু। কিন্তু তোমার ঠাকুর্দা নেওয়ার লোক নন। তখনই চালাকি করে, তোমার দাদু ওই বিয়ের কথা তোলেন। আশ্চর্যের কথা হল, তোমার মা দত্ত বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই তোমাদের জুয়েলারি ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত।

—তার মানে... মা খুব পয়মন্ত।

—এক দিক থেকে তা বলতেই পারো।

বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে গল্প করতে বসলে পুরনো অনেক কথা জানা যায়। মায়ের মুখে এক বার শুনেছিলাম, বাবার সঙ্গে গিরিজাকাকার পুরনো শত্রুতা। কী কারণে সেটা বিষ্ণুকাকা জানতেও পারে। সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম— গিরিজাকাকার সঙ্গে বাবার কী হয়েছিল? বাবা কেন ওই ভদ্রলোককে সহ্য করতে পারে না?

—সে কথা জানতে চেও না। তোমার ঠাকুর্দার সঙ্গে গিরিজাবাবুর বাবার কিন্তু খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। তোমার বাবার মেজাজ তো জানো। লোকের সঙ্গে কখন

কী ব্যবহার করবেন, কেউ জানে না। গিরিজাবাবু খুব শিক্ষিত মানুষ। বিলেতেও ছিলেন না কি এক সময়। তিনি তোমার বাবাকে অত মানবেন কেন? ইগো প্রবলেম আর কী! এই করেই তো বেনেরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

—গিরিজাকাকা তা হলে লোক খারাপ নন?

—জগতে কোনও লোকই খারাপ নয়। খারাপ হয়ে যায় পরিস্থিতির চাপে, বুঝলে? একজনের কাছে যে লোক খুব খারাপ, দেখবে অন্যজনের কাছে হয়তো সেই ভগবানের মতো। তোমার বাবাকে বাইরে থেকে দেখলে যত রুক্ষ লোক বলে মনে হোক না কেন, ওঁর ভেতরটা কিন্তু খুব নরম। তুমি জানো না, কত লোককে উনি কত রকমভাবে হেল্প করেন। শুনতে শুনতে চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। বাবা সম্পর্কে এ রকম সার্টিফিকেট আমাকে আগে কেউ দেয়নি। বাবা যদি কারও উপকার করে থাকে, তা হলে তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। বাবা আর যেই হোক মতিলাল শীল নয়। লোকে এখনও যাকে দানবীর বলে জানে। বলেছিলাম—তাই না কি? কাকে কাকে হেল্প করেছে শুনি। আমার চেনাশুনার মধ্যে কেউ আছে না কি?

প্রশ্নটার মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল। সেটা লক্ষ করেও বিষ্ণুকাকা পাত্তা দিল না। বলল— আমাদের কামাখ্যাবাবুকে তুমি দেখেছ। সেই যে স্বর্ণকার, আমাদের দোকানে গয়নার ডিজাইন বানাতেন। মারা গেলেন ট্রাম চাপা পড়ে। তার সংসার কিন্তু এখনও তোমার বাবা টেনে যাচ্ছেন। ছেলে-মেয়ের পড়াশুনোর খরচ পর্যন্ত। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। হ্যাঁ কত্তা মায়েরও প্রশংসা করতে হবে। উনিই কিন্তু তোমার বাবাকে এই দায়িত্বটা নিতে বলেছিলেন। এই আমাকেই দেখো না। আমি জানি, আমার যদি আজ খারাপ কিছু হয়ে যায়, তা হলে আমার ফ্যামিলিটা জলে ভেসে যাবে না। মাথার ওপর একজন অন্তত আছেন, যিনি অর্ক আর ওর মাকে দেখবেন।

বিষ্ণুকাকার সঙ্গে গল্প করতে বসেছি। বাবাকে নিয়ে তর্ক করতে নয়। কামাখ্যাবাবুকে আমি দেখেছি। অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ঠাকুর্দা ওই ভদ্রলোককে খুব পছন্দ করতেন। উনি থাকতেন শোভাবাজারের দিকে কোথাও। আমাদের দোকান থেকে অর্ডারের জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে বসেই উনি গয়না তৈরি করতেন। এক দিন ট্রাম থেকে নামার সময় কামাখ্যাবাবুর পা চাকার তলায় চলে যায়। ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ায় গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছিল। চার পাঁচমাস পর উনি মারা যান। তখন আমি স্কুলে পড়ি। মনে আছে, মৃত্যুর খবর পেয়ে দাদু খুব মুষড়ে পড়েছিল। কামাখ্যাবাবুর ছোট ছোট দুটো ছেলে-মেয়েও ছিল।

কামাখ্যাবাবুর পরিবারকে বাবা না কি সাহায্য করে। হতে পারে। বিষ্ণুকাকা যখন বলছে, তখন বাবার মধ্যে হয়তো কিছু ভাল গুণও আছে। বাবাকে আমি পছন্দ

করি না বলে, বাবার ভাল দিকগুলো নিয়ে ভাবার চেষ্টাও করিনি। একটা সময় বাবা আমাদের সুবর্ণ বণিক সমাজের বড় কর্তা ছিল। তখন নানা সমাজসেবামূলক কাজে বাবাকে মাথা ঘামাতে দেখতাম। পরে অন্য কর্তাদের সঙ্গে কী যে রাগারাগি হল, বাবা গণেশ অ্যাভেনিউতে বণিক সমাজের অফিসে যাওয়াই ছেড়ে দিল।

বাবার জায়গাটা এখন নিয়েছে দাদা। বাবা তাতে আপত্তি করেনি। বণিক সমাজের কোনও অনুষ্ঠান থাকলে মাঝেমধ্যে দাদাকে এখন গিলেকরা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরে সেখানে যেতে দেখি। আমাকেও বেশ কয়েকবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখেছি, আমার বয়সি বেশির ভাগ ছেলেই আমার ক্লাবের সমীরের মতো। লেখাপড়ায় বেশি এগোয়নি। বাপের টাকায় নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করার মানসিকতা নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। দোষ অবশ্য ওদের দিই না। দোষ ওদের বাপ-ঠাকুর্দাদের। কারণ তাঁরাও ওই ভাবে দিন কাটিয়েছেন। গল্প করার সময় বিষ্ণুকাকা হয়তো আরও অনেক কিছু বলত। কিন্তু তখনই অর্ক এসে বলল— দিদু তোমায় ডাকছে। এক বার নিচের ঘরে চলো। শুনেই বিষ্ণুকাকা তাড়াহুড়ো করে নিচে নেমে গেল। দোকানে এত দিন বিষ্ণুকাকাকে দেখেছি এক রকমভাবে। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী কর্মচারী হিসাবে। কিন্তু বাড়িতে অন্য এক বিষ্ণুকাকাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। এখানে বিষ্ণুকাকা মাতৃভক্ত ছেলে, আদর্শ স্বামী আর স্নেহপ্রবণ বাবা। বিষ্ণুকাকার মায়ের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। মাঝেমাঝেই না কি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বার্ধক্যজনিত সব রোগ। আমি যেদিন নবদ্বীপে এলাম, সে দিন উনি নাতির পৈতের অনুষ্ঠানের জন্য ছোট ছেলের বাড়িতে গেছিলেন। সেখানে একটু অনিয়ম হয়েছিল বোধহয়। কাল থেকে বিছানায় একেবারে শয্যাশায়ী।

যমুনা বলে একটা মেয়েকে বিষ্ণুকাকা চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে রেখে দিয়েছে। শুধু মায়ের সেবাযত্ন করার জন্য। সেই মেয়েটা বসিরহাটে দেশের বাড়িতে গেছে। মায়ের শুশ্রূষা আর সংসার টানার ধকল যাতে কাকিমাকে একা নিতে না হয়, সে জন্য বিষ্ণুকাকা প্রায় সারাক্ষণই মায়ের বিছানার পাশে বসে আছে। ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছে, মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে। নিজের হাতে পায়খানা-প্রস্রাব বাইরে ফেলে আসছে। কোলে করে তুলে এনে বাইরের বারান্দায় এনে বসাচ্ছে। কাকিমা কথায় কথায় এক বার বললও— তোমার কাকা মা বলতে একেবারে অজ্ঞান। কলকাতায় থাকলে রোজ এক বার করে ফোন করবেই। মায়ের সঙ্গে কথা না বললে তোমার কাকা খুব অস্থির হয়ে যায়।

এই দু'দিনের মধ্যেই বুঝে গেছি, অর্কও সে রকম। কাকিমার দিকে ওর খুব নজর। এই টিউবওয়েল থেকে জল তুলে দিচ্ছে। ছাদ থেকে শুকনো জামা কাপড় তুলে এনে আলনায় গোছাচ্ছে। নিজের জামা কাপড় নিজেই কেচে নিচ্ছে। আজ

সকালে দেখি ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। আমি দেখে ফেলায় লজ্জা পেয়ে বলল— যমুনাদিটা দিন কয়েক আসবেন না। তাই মায়ের কাজটা আমি সেরে রাখছি।

বললাম— তুমি এতে লজ্জা পাচ্ছ কেন? নিজেদের কাজ নিজেরা করে নেওয়াই তো ভাল। বলেই ছাদে উঠে গেছিলাম। নিজের লজ্জা ঢাকতে। আমাদের বাড়িতে কাজের লোকই পাঁচ ছ'টা। আমাদের কোনও কাজ কোনও দিন নিজের হাতে করতে হয়নি। সব কিছু টাইম মতো পেয়ে গেছি। সকালে ব্যায়াম শেষ করে বাদামের শরবত থেকে শুরু করে, রাতে শুতে যাওয়ার আগে বিছানায় মশারি টাঙানো ইস্তক। অবশ্য নিজের কাজ নিজে করতে চাইলেও, করতে পারতাম কি না সন্দেহ। মা করতেই দিত না। হাঁ হাঁ করে উঠত। মা আর বউদিরাই তো আমাদের পরনির্ভর করে দিয়েছে। এই যে মা অসুস্থ, মায়ের শুশ্রূষার কাজ কি আমাকে কেউ করতে দিত? করতে গেলে মা-ই হয়তো বলে উঠত—তুই এ সব করতে লেগেছিস কেন হতভাগা? দুটো নার্স আছে কী করতে? যা বাবা, রোগীর ঘরে বেশি থাকতে নেই। বউদিও হয়তো একই কথা বলত—ভাই, থাক। আমরা তো আছি। লালি দেখলে হয়তো হি হি করে হাসতেই শুরু করত—টুম্পাইদা তুমি? এ কী! সুয্যি কি আজ পশ্চিম দিকে উঠেছে? যাও বাবা নিজের ঘরে যাও। তুমি থাকলে মায়ের আরও ইরিটেশন হবে।

লালির কথা মনে পড়লেই মনটা খুব নরম হয়ে যাচ্ছে। শুধু লালির কথা কেন? মা দাদা, বউদি— সবার কথা। কাছে থাকলে অনেক আপন লোকও বোধহয় কাছে থাকে না। দূরে গেলে সেই লোকগুলোই খুব কাছে চলে আসে। একটু আগে ছাদে সিগারেট ধরিয়ে ভাবছিলাম, যদি মুম্বইয়ে চলে যেতাম, তা হলে কী হত? এই কষ্টের পরিমাণটা তো শত গুণ হয়ে মনের ভেতর চেপে থাকত। রক্তের সম্পর্ক কি অত সহজে টান মেরে উপড়ে ফেলা যায়? কথাগুলো আরও বেশি করে মনে হচ্ছে বিষ্ণুকাকার পরিবারের সবার সম্পর্কগুলো দেখে।

কাল রাতে বিষ্ণুকাকা বলেছিল, আজ ব্রেকফাস্টের পর আমাকে নিয়ে বেরবে। ঠিক ক'টার সময় তা বলেনি। কোথায় যাবে তাও জানায়নি। আমি ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, বাজারে গেছে। এখনও ফেরেনি বোধহয়। ফিরলে এক বার ওপরে আমার কাছে আসত। সময় কাটানোর জন্য খবরের কাগজটা টেনে নিলাম। প্রথম পাতায় দীপা ওরফে পিঙ্কির ছবি। পুলিশ ভ্যান থেকে নামানো হচ্ছে। ওর দু'পাশে মহিলা পুলিশ। সে দিন লর্ড সিনহা রোডে পুলিশের দফতরে ওকে যে সালোয়ার কামিজ পরা অবস্থায় দেখেছিলাম, ছবিতে সেই পোশাকেই। ছবির তলায় ক্যাপশন : ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হচ্ছে মুম্বইয়ে বোমা বিস্ফোরণের চক্রে জড়িত থাকা প্রাক্তন অভিনেত্রী পিঙ্কিকে। গতকাল খবরের কাগজ ওলটানোর সময় পাইনি।

তাই জানিও না, পটেলভাইয়ের কী হয়েছে। দিব্যেন্দুবাবু আমাকে খবরের কাগজ পড়তে বলেছিলেন। টিভির খবরের দিকে নজর রাখতে বলেছিলেন। এ বাড়িতে টিভি আছে ডাইনিং হলে। টিভি দেখার চল নেই বললেই চলে। এক বার ভেবেছিলেন, অর্ককে বলব, আমি যে ঘরে আছি, টিভি-টা সেখানে লাগিয়ে দিতে। কিন্তু ওকে বলতে পারিনি। অর্ক ডিনারের পর ডিসকভারি চ্যানেল দেখছিল। আমার ঘরে লাগিয়ে দিতে বললে হয়তো উৎসাহ নিয়েই লাগিয়ে দেবে, কিন্তু বেচারির টিভি দেখাটা বন্ধ হয়ে যাবে। কাগজে তিন তিনটে বড় খবর পটেলভাইদের নিয়ে। পটেলভাইকে পুলিশ দিল্লি এয়ার পোর্টে ধরার পর কলকাতায় নিয়ে এসে দফায় দফায় জেরা করেছে। উনি না কি বারবারই বলেছেন, মুম্বইয়ে বোমা বিস্ফোরণে ওঁর কোনও হাত নেই। তবে কারা এই কাজটা করেছে, তা উনি জানেন। দুবাইয়ের একটা গ্রুপ। যারা উগ্রপন্থীদের জন্য বেআইনি অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে বিক্রি করে। পুরো রিপোর্টটা পড়ে মাথা গুলিয়ে গেল। বিস্ফোরণে যদি পটেলভাইয়ের হাত না থাকে, তা হলে ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?

পরের রিপোর্ট পড়ে খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম, পুলিশ কেন পটেলভাইকে ধরার জন্য এত উদগ্রীব ছিল। এই খবরটা দিয়েছে ইন্টারপোল-এর অফিসাররা লন্ডন থেকে। লাটাভিয়ায় না কি দুবাইয়ের এই গ্রুপটারই সঙ্গে পটেলভাইয়েরা কথা বলেছিলেন। কথা হয়েছিল, অস্ত্র ভারতের বেশ কয়েকটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়া অবধি দায়িত্ব এই গ্রুপের। তার মধ্যে কলকাতা শিলিগুড়ির নাম ছিল। অস্ত্রের দাম দেওয়ার কথা ছিল হিরের বিনিময়ে। সেই ডিলটা হয়েছিল বাঙ্গালোরে বসে। পটেলভাইয়ের লোক মুথুস্বামী মুম্বই থেকে হিরে নিয়ে বাঙ্গালোরেও যান। সেখানে বোধহয় হিরের দাম ঠিক করা নিয়ে ওই গ্রুপের লোকেদের সঙ্গে মুথুস্বামীর প্রচণ্ড ঝামেলা হয়। ওরা আরও বেশি কিছু আশা করেছিল। মুথুস্বামী মুম্বইয়ে ফিরে আসার সময় ওই গ্রুপের লোকরা ইচ্ছে করেই বিস্ফোরণটা ঘটায়, যাতে এ নিয়ে হই চই হয়। আর পটেলভাইয়ের কুকীর্তি সবাই জানতে পারে।

দ্বিতীয় রিপোর্টটা পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। হিরের ব্যবসা করে তো পটেলভাই প্রচুর রোজগার করেছেন। এত আয় করেছেন, যা ওঁর সাত প্রজন্মও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা হলে কেন এই সব দেশদ্রোহিতার কাজে নামতে গেলেন? লোভ, লোভই মানুষের সর্বনাশ করে দেয়। ভগবান যাকে যা দেবেন বলে নির্দিষ্ট করে পাঠিয়েছেন, তার বেশি চাইতে গেলেই সর্বনাশ। পটেলভাইয়ের ছকেই সেটা লেখা আছে। আমি তো আগেই জানতাম। ইস, ওঁকে সাবধান করে দিলে ভাল হত। কিন্তু উনি কি সাবধান হতেন? মনে হয় না। এটাই যে ওঁর নিয়তি। কাগজে তৃতীয় রিপোর্টটা পড়ে এর পর চমকে উঠলাম। পিঙ্কি না কি রাজসাক্ষী হতে রাজি

হয়ে গিয়েছে। এই কথাটা সাংবাদিকদের বলেছেন দিব্যেন্দুবাবু। পিঙ্কি না কি এমন সব খবর পুলিশকে দিয়েছে, যা খুব সহজ করে দেবে তদন্তের কাজ। ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুম্বই পুলিশের একটা দল কলকাতায় আসছে। খবর এটুকুই, বাকিটা পিঙ্কিকে নিয়ে রসালো সব গল্প। একজন থার্ড গ্রেডেড অভিনেত্রী কী করে পটেলভাইয়ের মতো হিরে ব্যবসায়ীর কাছাকাছি এল, দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা কত গভীর ছিল, কী বিলাসিতার মধ্যে পিঙ্কি দিন কাটাত— এই সব। পড়তে পড়তে অবাকই হয়ে যাচ্ছিলাম, পিঙ্কি আসলে পটেলভাইয়ের রক্ষিতাই ছিল। তাকে পটেলভাই কী করে মেয়ে বলে পরিচয় দিতেন?

নাও বাবা, ব্রেক ফাস্ট করে নাও।

কাকিমার গলা শুনে মুখ তুলে তাকালাম। হাতে রুপোর থালা। লুচি, তরকারি আর মিষ্টি। একটা জিনিস লক্ষ করছি, রোজ আমাকে যখন ওঁরা কিছু খেতে দিচ্ছেন, তখন দিচ্ছেন রুপোর থালায়। বিষ্ণুকাকা বা অর্ককে কাঁসার থালায়। এই বাড়তি খাতিরটা দেখে আমার একটু অস্বস্তিই হচ্ছে। থালাটা হাতে নিয়ে বললাম— বিষ্ণুকাকা ফেরেনি?

—ফিরেছেন। উনি ওপরে, আসছেন। ওঁর খাবারটাও নিয়ে আসছি।

—একসঙ্গে বসলেই তো ভাল হত।

—এখুনিই আসছেন তুমি শুরু করে দাও। বেলা প্রায় দশটা। উনি ফিরেই আমাকে বকাবকি করছেন। তোমার না কি ন'টার মধ্যেই ব্রেক ফাস্ট করার অভ্যেস?

— না, না। তেমন কিছু না।

—জানতাম না বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে প্রথম দিনই জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল। কাল থেকে ন'টার মধ্যেই ব্রেকফাস্ট রেডি করে দেব তা হলে তোমাকে।

কাকিমা কথা শেষ করতে না করতেই বিষ্ণুকাকা ওপরে উঠে এলেন। পরনে জিনসের প্যান্ট আর সাদা টি শার্ট। এই পোশাকে বিষ্ণুকাকাকে কখনও দেখিনি। বরাবর ধুতি-পাঞ্জাবিতেই দেখে অভ্যস্ত। একেবারে ধোপদুরস্ত বাঙালি। দত্ত জুয়েলার্সের ঘরানাটাই অবশ্য এ রকম। আমার বাবার পরনেও সব সময় ধুতি পাঞ্জাবি। বাবা চায়ও, দোকানের কর্মীরা সবাই আগমার্কা বাঙালি সেজে থাকুক। বাবা যদি এই পোশাকে বিষ্ণুকাকাকে দেখত, নির্ঘাত ভ্রূ কোঁচকাত। সে কথা মনে হতেই বোধহয় আমার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করে বিষ্ণুকাকা বললেন—হাসছ যে?

বিষ্ণুকাকা বুঝতে পেরে বললেন—জিনসের প্যান্ট আর টি শার্ট কিন্তু আমার নয়। অর্কর। বাজার যাওয়ার সময় দেখলাম, হাতের কাছে কিছু নেই। অর্কর প্যান্টটাই

গলিয়ে নিলাম। বুঝলে টুম্পাই, একটা বয়সের পর ছেলেরা বাবার বন্ধুর মতন হয়ে যায়। আমি এখন সেই বয়সে পৌঁছেছি।

বলেই বিষ্ণুকাকা খাওয়ায় মন দিলেন। কথাটা এসে ধাক্কা মারল। সব ছেলেই কি একটা বয়সের পর বাবার বন্ধুর মতো হতে পারে? পারবে আমার বাবা আমার জিনস গলিয়ে এইভাবে রাস্তায় বেরতে? একটা সময় পর্যন্ত তো বাবা জিনস পরতেই দেয়নি দাদাকে। বিদেশে পড়তে গিয়ে দাদা যে সব পোশাক কিনেছিল, বউদি আসার আগে পর্যন্ত সেগুলো সুটকেস ভর্তি হয়েই পড়েছিল। বউদি সেই পোশাক বের করে দাদাকে পরতে দেওয়ার পর বাবা আর না করেনি। আমার কথা অবশ্য আলাদা। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পরই, বাবাকে তোয়াক্কা না করে, কলেজে গেছি জিনস পরে। কম কারণে আমার ওপর রাগ বাবার?

খেতে খেতে বিষ্ণুকাকা হঠাৎ বলল— তোমার বউদিমণি আজ সকালে ফোন করেছিল। কাকিমা কি কিছু বলেছে তোমাকে?

খাওয়া থামিয়ে বললাম— না।

—তোমার বউদিমণি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।

—আমি যে এখানে আছি, জানল কী করে?

—প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম। পরে উনিই বললেন, তোমার ক্লাবের ক্ষেমঙ্কর না কে, তার কাছ থেকে শুনেছেন। ওই ছেলেটা বোধ হয় সে দিন ট্যাক্সিতে ওঠার সময় তোমাকে আমার সঙ্গে দেখেছিল।

—কী বলল বউদি?

—কত্তা মা ভাল আছেন। এটাই ভাল খবর। ডাক্তার ওপরে ওঠার পার্মিশন দিয়েছে। তবে খুব সাবধানে থাকতে বলেছে। আর না কি বলেছে কোনও রকম এক্সাইটমেন্ট-এর ধারে-কাছে যেন না থাকে।

—আর কী বলল বউদি?

—তোমাকে চাইছিল। কিন্তু তখন তুমি ছিলে না। গঙ্গার ধারে হাঁটতে গেছিলে। পরে ফোন করবে বলেছে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। ভালই হয়েছে, সেই সময়টায় আমি এ বাড়িতে ছিলাম না। বউদি কথা বলতে চাইলে আমি না করতে পারতাম না। আর কী-ই বা বলত বউদি? 'বাড়ি ফিরে এসো' ছাড়া? জীবনে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হই না কেন, দত্ত বাড়ির চৌকাঠে পা দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। মায়ের মরা মুখ দেখতে আমি চাই না। ওই দিব্যিটা মা আদৌ দিয়েছে কি না, আমার জানা নেই। কিন্তু বাবা সবার সামনে সেটা বলেছে। আসলে বাবাই আমাকে চায় না। বাবার আর একটা ছেলে আছে। আমি না থাকলে বাবার কিছু আসে-যায় না।

চুপচাপ খাওয়া সেরে নিলাম। নাহ, এ বাড়িতেও বোধহয় দু'একদিনের বেশি থাকা সম্ভব হবে না। আমি যে এখানে আছি, সেটা দত্ত ফ্যামিলির কাউকে জানাতে চাইনি। এক বার যখন ওরা জেনে গেছে, তখন ফোনের পর ফোন আসতে থাকবে। আমি জানি, এর পর যে ফোন করবে, সে দাদা। নানা কথা বলে আমার মন ভেজাতে চাইবে। তার পর লালি তো আছেই। ফোন করে করে আমার মাথা খারাপ করে দেবে। মিথ্যে কথা বলা ওর স্বভাব। ফোনে সত্যি-মিথ্যে বানিয়ে আমার কাছে অনেক কিছু বলবে। এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করবে, দত্ত ফ্যামিলির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আরও খারাপ হয়ে যাবে। এ সব নিয়ে একটু ভাবা দরকার।

ডাইনিং টেবল ছেড়ে উঠছি, এমন সময় বিষ্ণুকাকা বললেন—মায়ের শরীরটা হঠাৎ ফের খারাপ হয়েছে, বুঝলে টুম্পাই। কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ডাক্তারবাবুকে এক বার এনে দেখান না।

—ডাকতে গেছিলাম। চেম্বারে ভিড়। সামলে এখুনি আসবেন বললেন। মা কাল রাত থেকেই কথা বন্ধ করে দিয়েছে। এটাই আমার ভাল লাগছে না। শরীরে বোধহয় কোনও অস্বস্তি হচ্ছে।

—কলকাতায় নিয়ে গেলে হয় না?

—ডাক্তারবাবু সে কথা কাল এক বার বলেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে তিন, সাড়ে তিন ঘন্টার জার্নি...জানি না, মা সেই ধকল সামলাতে পারবে কি না! আর একটা কথা কী জানো, এই ভিটে ছেড়ে মা কোত্থাও যাবেই না। মায়ের ওই এক কথা, মরার সময় আমায় যেন টানাহ্যাঁচড়া করিস না। স্বামীর ভিটেয় নিশ্চিন্তে মরতে দিস। শুনে বললাম— আপনার মায়ের কোনও ছক-টক আছে? দিন তো, দেখি সময়টা এখন কেমন যাচ্ছে।

বিষণ্ণ গলায় বিষ্ণুকাকা বললেন—হাতের কাছেই আছে। পণ্ডিত দিগম্বর শাস্ত্রীর করে দেওয়া ছক। দাঁড়াও, দিচ্ছি।

— কে এই দিগম্বর শাস্ত্রী?

—নবদ্বীপের সেরা জ্যোতিষী। এঁর কাছেই তোমাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। নব্বই-একানব্বই বছর বয়স। এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। দেখলে তুমি বুঝতে পারবে। জ্ঞানের সাগর বলা যায়।

কথা বলতে বলতেই দেওয়ালের খাঁজে আলমারির পাল্লা খুলে মায়ের হরোস্কোপটা বের করে আমার হাতে দিলেন বিষ্ণুকাকা। তার পর বললেন— আমি বরং নিচে যাই। তুমি ভাল করে হরোস্কোপটা দেখে বলো তো ভাই, এখনই মাতৃদায় আছে কি না। মা ছাড়া আমি বাঁচব কী করে, ভাবতেই পারি না।

কথাটা শেষ করার সময় বিষ্ণুকাকার গলা ভারী হয়ে এল। নিজেকে

সামলানোর জন্য তাড়াতাড়ি উনি নিচে নেমে গেলেন।

ঘরে ঢুকে ছকটা নিয়ে বসলাম। এখানে আসার পর বিষ্ণুকাকার মাকে মাত্র এক দিনই আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি। ওপরের বারান্দায় তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাকার বাড়ি থেকে ঠাম্মাকে নিয়ে এল অর্ক। রিকশা থেকে প্রায় কোলে করে তখন নামিয়েছিল। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তবুও গায়ের রং দুধেআলতা। ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা। এক ঝলকেই ভীষণ অভিজাত বলে মনে হয়েছিল। ওঁর ঘর নিচের তলায়। অর্ক নিচে নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে ওর ঠাম্মার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার পর থেকে আর ওই ঘরে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি।

বহু দিন পর কোনও ছক আমার সামনে। মিথুন রাশি। ঘরগুলোতে চোখ বোলাতেই দেখতে পেলাম, লগ্নে বৃহস্পতি। পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় মৃত্যু অসম্ভব। না, এই যাত্রায় বিষ্ণুকাকার মাতৃবিয়োগ নেই। নিজের ওপর এমন বিশ্বাস ভাল করে ছকটা দেখারও দরকার বলে মনে করলাম না। গুটিয়ে ফের রেখে দিলাম। বিষ্ণুকাকা উঠে এলে কথাটা বলে দেব।

হাতে কোনও কাজ না থাকলে টিভি-র কথা মনে পড়ে। নিজের স্বার্থেই এখন খবরগুলো দেখি। সারা দিনে সারা দেশে কত খবর! সত্যি এক এক সময় মনে হয়, পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে। আমেরিকায় বন্যা হচ্ছে, সেই খবর ঘরে বসে চ্যানেল ঘোরালেই দেখতে পাচ্ছি। অথবা জাপানে ভূমিকম্প। ইথিওপিয়ায় খরা। অস্ট্রেলিয়ায় দাবানল। টিভি কেন আকর্ষণ করবে না? এই যে পটেলভাইয়ের গতিবিধি সম্পর্কে নবদ্বীপে বসেই জানতে পারছি, সে তো এই টিভি-র দৌলতেই।

বিবিসি-তে সাদ্দাম হোসেন সংক্রান্ত একটা খবর দেখাচ্ছিল। মন দিয়ে সে খবরটা দেখছি। হঠাৎ নিচে কান্নার আওয়াজ। কান খাড়া করতেই বুঝতে পারলাম, কাকিমার গলা। মনের ভেতর কুডাক দিল। এক লাফে ঘরের বাইরে বেরতেই বিষ্ণুকাকার গলাও শুনতে পেলাম। মা মা বলে ডাকছেন। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নেমে আসতেই দেখি, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে অর্ক বাইরে বেরিয়ে আসছে। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওর মুখটাই বলে দিল, কী অঘটন ঘটেছে!

নিচের সিঁড়িটায় পা আটকে গেল। ভাগ্যিস, বিষ্ণুকাকাকে বলিনি, মায়ের মৃত্যুযোগ নেই। আমার হলটা কী? গণনায় এত বড় ভুল হয়ে গেল? তখনই সাধুবাবার সেই কথাটা মনে পড়ল। ব্রত ভঙ্গ করার জন্যই কি শেষে আমার এই পরিণতি হল? নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাটা চলে গেল?

শ্মশান ঘাট থেকে ফিরে বিষ্ণুকাকা যে সেই উপুড় হয়ে শুয়েছেন, ওঠার আর

কোনও লক্ষণ নেই। এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেননি। একেবারে গুম হয়ে গেছেন। ডেড বডি নিয়ে বেরোনোর সময় মায়ের পা-দু'টো বিষ্ণুকাকা সজোরে আঁকড়ে ধরেছিলেন। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর দিকে এমন কড়া চোখে তাকিয়েছিলেন, যেন ভস্ম করে ফেলবেন। একটু পরে স্পষ্ট দেখলাম, বিষ্ণুকাকা বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। কী বলতে পারেন বিষ্ণুকাকা? 'যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, মা মাফ করে দাও।' না কি 'পরের জন্মেও যেন তোমাকে মা হিসেবে পাই।' না কি 'ছেলে হিসেবে কর্তব্যের তো কোনও ত্রুটি করিনি, তবুও কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে মা?'

রাস্তার দিকের বারান্দায় বসে আছি। মনটা ভীষণ খারাপ। না, বিষ্ণুকাকার মায়ের মৃত্যুর জন্য নয়। মনটা ভার এই কারণে যে, ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আর আজ সকালেই সেটা বুঝতে পারলাম। সেই সাধুবাবার কথাই ফলে গেল। জ্যোতিষী হিসাবে আমার অত দম্ভ ছিল। আমার মুখ দিয়ে যা বেরবে, তা মিলে যাবে। এখন থেকে আর মিলবে না। হিরের আংটি নিয়ে কেন যে মিথ্যে কথাটা বলতে গেলাম? না বললে তো আমার এই দশা হত না। এখন কী করব আমি? আমার যে আর কোনও গুণই নেই।

নিচে আরও এক বার কান্নার রোল উঠল। বাড়িভর্তি লোকজন। অনবরত লোক আসা-যাওয়া করছে। বিষ্ণুকাকা যে এত জনপ্রিয় ভাবতেই পারিনি। কাকিমা খুব কান্নাকাটি করে এখন নিজেকে সামলে নিয়েছেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে অর্ক। আমাদের বাড়িতে কারও মৃত্যু দেখিনি। ফলে এই ধরনের শোকের পরিবেশ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। খবর পেয়ে দূর থেকে বিষ্টুকাকার এক একজন আত্মীয় আসছেন, আর নীচ থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক ক্ষণ পর তা থেমেও যাচ্ছে। কান্নাকাটি শুনে হঠাৎই মায়ের জন্য মনটা কেমন করে উঠল। আরে, বিষ্ণুকাকা তো ওর মাকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। মায়ের বয়স হয়েছিল, রোগে ভুগছিলেন, তিনি মারা গেছেন— কারও কোনও আক্ষেপ করার কিছু নেই। আমার মায়ের যদি এমন কিছু হয়? মায়ের কীই বা এমন বয়স? পঞ্চাশও হয়নি। আমি ভালমত জানি। কেন না মায়ের হরোস্কোপ আমি অনেকবার বিচার করেছি। এই বয়সটা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বয়স নয়। মায়ের খুব ইচ্ছে, দুই ছেলে আর তাদের বউদের নিয়ে ঘর করার। নাতি-পুতির মুখ দেখার। আমি জানি। আত্মীয়স্বজনদের কাছে অনেক বারই মাকে বলতে শুনেছি এ সব কথা। দুটো ইচ্ছের কোনওটাই পূরণ হয়নি। আমি গাড়লের মতো লালিকে বিয়ে করতে চাইলাম না। বউদি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মা হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলল। মায়ের যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে স্বর্গে গিয়েও যে শান্তি পাব না। মনের ভেতরটা হায় হায়

করে উঠল। আমিই দায়ী। কথাটা মনে হতেই নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। মা বলত, টুম্পাই তোর জন্য মরেও আমি শান্তি পাব না। তখন মায়ের মৃত্যুর কথা কখনও মনেই আসেনি। এমনকী, কাল পর্যন্তও ভাবিনি। আশ্চর্য, মাকে মুখ ফুটে কখনও বলিওনি, মরার কথা তুমি বলবে না। আমার কষ্ট হচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে, মাকে আমি মায়ের মতো দেখিইনি। মা যে কী, এত বই পড়েও সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। বিষ্ণুকাকার বাড়িতে এসে মর্মে মর্মে টের পেলাম। মা হচ্ছে, আসল শক্তি। টোটা ঠিকই বলত, মাকে অশ্রদ্ধা করে জীবনে কিছু পাওয়া যায় না। এখন মনে হচ্ছে, মাকে আমি সারা জীবন অশ্রদ্ধাই করেছি। মায়ের কাছে শুধু চেয়ে গেছি। প্রত্যুত্তরে মাকে আমি কিছুই দিইনি। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। ক'টা বাজে কে জানে? সারাটা দিন কী দ্রুত কেটে গেল! শ্মশানঘাট থেকে ফিরে আসার পর সেই যে ওপরে উঠে এসেছি, আর নিচে নামিনি। আমার কী করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বিষ্ণুকাকার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যত দিনের, কাকিমা বা অর্কর সঙ্গে তত দিনের নয়। এ বাড়িতে আমি আসার পরও সম্পর্কটা সহজ হয়নি। আমাকে নিয়ে সব সময়ই কাকিমা অস্বস্তিতে। কীভাবে তোয়াজ করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। এই সময়টা অবশ্য এ সব ভাবার সময় নয়। তবুও আমি নিজে সহজ হয়ে উঠতে পারছি না। মাঝে এক বার মনে হল, নিচে নেমে বিষ্ণুকাকার ঘরে যাওয়া দরকার। খানিকটা কথাবার্তা বললে উনি মায়ের কথা ভুলে থাকলেও থাকতে পারেন। পরক্ষণেই মনে হল, ঘরভর্তি লোকজন। তাদের কাউকেই আমি চিনি না। মাঝখান থেকে ওঁরা অস্বস্তিতে পড়বেন। বারান্দায় বসে থাকতে ভাল লাগছে না। চেয়ার ছেড়ে উঠতেই সিগারেট খেতে ইচ্ছে হল। শ্মশানঘাটে প্রায় এক প্যাকেট শেষ করে দিয়েছি। এত টেনশনে ছিলাম। জীবনেও এক বেলার মধ্যে এত সিগারেট খাইনি। ফেরার পথে আর এক প্যাকেট কিনে এনেছিলাম। সেটা পাঞ্জাবির পকেটে। ঘরে ঢুকে প্যাকেটটা নিয়ে বেরনোর সময় হঠাৎই হিরের আংটিটার কথা মনে হল। কাল রাতে সুটকেস থেকে বের করে আমি ড্রয়ারের ভেতর রেখেছিলাম। তার পর আর আংটির কথা আমার মনেই ছিল না। এই ঘরে অবশ্য কারও ঢোকার সম্ভাবনা নেই। আমি নিশ্চিত, ওটা ড্রয়ারের ভেতরই আছে। কিন্তু কাল রাতে আংটিটা আমি বেরই বা করলাম কেন? ওটা যে বিষপাথর!

বিষপাথর! কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতরটায় ধড়াস করে উঠল। তা হলে? বিষ্ণুকাকার মা কি চলে গেলেন এই বিষপাথরেরই কুপ্রভাবে? হাতের সিগারেট হাতেই ধরা রইল। হতে পারে, একেবারে অসম্ভব নয়। এই বিষপাথর যে বাড়িতে যাবে, সেই বাড়ির সর্বনাশ হয়ে যাবে। সাহেবের চিঠিতে তো সেই কথাই লেখা ছিল। হিরের এই আংটি হাতে পাওয়ার পর থেকেই যত অশান্তি। মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ,

মায়ের অসুস্থতা, পটেলভাইয়ের হাজতবাস, বিষ্ণুকাকার মায়ের মৃত্যু। পর পর এই কয়েকটি ঘটনা ঠিক ঠিক মেলানো যাচ্ছে। উফ, কী কুক্ষণেই না হামিদ এসে বিষপাথর আমার হাতে দিয়েছিল! নাহ, এখনই এটাকে বিদায় করা দরকার।

ড্রয়ার খুলে আংটিটাকে বের করে আনলাম। অভিশপ্ত হিরে। প্রায় অন্ধকার ঘরে জ্বলজ্বল করছে। আংটিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাগে সারা শরীর জ্বলতে লাগল। সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি আংটিটা পকেটে চালান করে দিলাম। এখুনি একটা গতি করা দরকার। বারান্দা থেকে দূরে ছুড়ে ফেলা যায়। তাতে কোনও লাভ হবে না। রাস্তা থেকে কেউ না কেউ কুড়িয়ে পাবে। লোভ সামলাতে না পেরে ঘরে নিয়ে যাবে। তার পর ফের কিছু লোকের অপমৃত্যু হবে। না, আর ক্ষতি হতে দেওয়া যায় না। সিঁড়ির দিকে এগোতেই গঙ্গার কথা মনে হল। একটা রিকশা ধরে গঙ্গার ধারে চলে যেতে মিনিট পাঁচেক লাগবে।

কে যেন বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে দিল। দেখি, লালির বয়সি একটা মেয়ে। অর্কদের কোনও আত্মীয়-টাত্মীয় হবে। এত হাতে প্লেট, তাতে কাটা ফল। অন্য হাতে একটা গ্লাস। চোখাচেখি হতে বলল— টুম্পাইদা, আমি দেবলীনা। অর্কর পিসতুতো দিদি। মামিমা আপনার জন্য এ সব পাঠিয়ে দিলেন। খেয়ে নিন।

খেতে ইচ্ছে করছে না। তাই বললাম— থাক না।

—সে কী, সারা দিন তো আপনাদের পেটে কিছু পড়েনি। আপনার তো অশৌচ নয়। আপনি কিছু মুখে দেবেন না কেন? ইচ্ছে করছে না, তবুও হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিয়ে বললাম— বিষ্ণুকাকা কোথায়?

—এতক্ষণে উঠে বসেছেন। দিগম্বর শাস্ত্রী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই মাত্তর কেঁদে ফেললেন।

—সারা দিন কিন্তু শক্ত ছিলেন।

—হ্যাঁ, আমরা তো ভয়ই পাচ্ছিলাম। কান্নাকাটি না-করাটা খারাপ লক্ষণ। দিদাকে তো মামা এক রকম পুজোই করতেন। সেই মানুষটির হঠাৎ চলে যাওয়া, সহ্য করা কঠিন। সামলাতে মামার অনেক দিন লাগবে।

এতক্ষণে কথা বলার একটা লোক পাওয়া গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে খাওয়া যায় না। প্লেট হাতে ঘরের ভেতর ঢুকে এলাম। আমার পিছন পিছন এল দেবলীনাও। ঘরের আলো জ্বালিয়ে, টেবলের ওপর গ্লাস রেখে বলল— আমার মাও দিদা অন্তপ্রাণ। দিদার শরীর খারাপ হওয়ার কথা শুনে আজই আমরা নবদ্বীপে আসব ঠিক করেছিলাম। হঠাৎ অর্ক ফোন করে বলল, দিদা নেই। আমাদের এমন কপাল দেখুন, এ বাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখনই আপনারা দাহ করে ফিরলেন।

—আপনারা থাকেন কোথায়?

—কলকাতায়। আপনার বাড়ির খুব কাছে। সিকদার পাড়ায়। বেলা সাড়ে দশটায় খবরটা পেলাম। এগারোটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখানে পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটায়।

বিষ্ণুকাকার এক বোন সিকদার পাড়ায় থাকে, শুনেছি। তা হলে এই সেই বোনের মেয়ে। বললাম— এত সময় তো লাগার কথা নয়।

—রানাঘাটে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গাড়ি আটকে দিল। ঘণ্টা দুয়েক ওখানেই নষ্ট হয়ে গেল। আমাকে আপনি আপনি করবেন না টুম্পাইদা। আমি লালির বন্ধু। আপনার কথা ওর মুখে অনেক শুনেছি।

লালির নামটা টুং করে এসে বাজল আমার বুকে। একটা মিষ্টি রেশ ছড়িয়ে গেল যেন। জিজ্ঞেস করলাম— লালি তোমার বন্ধু হল কী করে?

—আমরা যে একই কলেজে পড়ি। আমাকে ওদের বাড়িতে দু'একবার দেখেওছেন।

—তুমি প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাও না কি?

—আগে খুব যেতাম। ইদানীং যাই না। লালি এমন একটা ছেলেমানুষি করল, তার পর থেকে যেতে খুব অস্বস্তিবোধ করি।

—ছেলেমানুষি মানে?

—থাক গে। ও সব শুনে আপনার কাজ নেই। ব্যাপারটায় আপনিও ইনভলভড।

—আমি ইনভলভড! আশ্চর্য! শুনি কীভাবে?

—প্রমিস করুন, লালিকে কিছু বলবেন না, তা হলে বলতে পারি।

—প্রমিস।

—একটা সময় লালি প্রায়ই আমাকে বলত, আমার দাদা তোকে খুব পছন্দ করে। মাকে বলেছে, বিয়ে করলে তোকেই করবে। আর কোনও মেয়েকে নয়! রোজ এ সব কথা শুনে আমারও বিশ্বাস হয়ে গেছিল। এক দিন কথায় কথায় আমার মাকেও ও এ কথাটা বলল। শুনে মা বাবাকে বলেছিল, ছেলেটার সম্পর্কে একটু খোঁজ নাও তো। কয়েক দিন পর বাবা এসে বলল, ছেলেটা খুব ভাল। জামাই হিসাবে পাওয়া ভাগ্যির। কিন্তু তার তো বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। পোস্তার গিরিজাবাবুর মেয়ের সঙ্গে। দু'জনে এ দিক সে দিক মেলামেশাও করে।

—এর পর লালিকে তুমি কিছু জিজ্ঞেস করোনি?

—করেছিলাম। ও আপনার ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল।

—কী বলেছিল?

—বুলবুলি নামের সেই মেয়েটার সঙ্গে না কি আপনারই বিয়ের সম্বন্ধ

হয়েছিল। আপনি না কি তাকে বিয়ে করতে চাননি। মেয়েটাকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্য আপনি টোটাদাকে ও দিকে ভিড়িয়েছেন। টোটাদা তো আপনার কথা ছাড়া আর কারও কথা শোনে না। আপনার কথায় বুলবুলিকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেছে।

দেবলীনার মুখে এ সব কথা শুনে হাসব, না রাগব—বুঝে উঠতে পারলাম না। আদি ও অকৃত্রিম লালি, যে সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে একটা জিনিস খাড়া করতে পারে। উফ্, পারে বটে! দেবলীনা আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। লালির কথাটা সত্যি, না মিথ্যে— তা বোঝার চেষ্টা করছে। সেটা লক্ষ করে বললাম— টোটাকে তোমার কেমন লাগে, তা তো বললে না।

— এ কথা কেন জানতে চাইছেন টুম্পাইদা?

—তার কারণ, বেশ কিছু দিন আগে বুলবুলির সঙ্গে টোটার বিয়ের কথাটা ভেস্তে গেছে। লালি কি সে কথাটা তোমাকে বলেছে?

—কই, না। উল্টে, অনেক দিন পর আমাদের বাড়িতে এসে কাল বলল...না থাক, সে সব কথা আপনাকে বলে লাভ নেই। ওর পার্সোনাল ব্যাপার।

—আরে বলোই না। এত কথা তো বললে, বাকিটা চেপে লাভ কী?

—প্লিজ টুম্পাইদা, এখন যেটা বলছি, সেটা যেন ওর কানে না যায়। তা হলে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। লালি খুব ভাল মেয়ে। আমি চাই না, কোনও কারণে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খারাপ হোক।

—ঠিক আছে। তা হলে বোলো না।

—না, না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি সেন্সিবল লোক। আপনাকে বলা যায়। কাল আমাদের বাড়িতে এসে লালি বলল, তেইশ তারিখে ওর বিয়ে। ঘটকালি করে হচ্ছে। সোনা দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাচ্ছে ওর শ্বশুড়বাড়ির লোকজন। নেমন্তন্ন করতে এসে খুব কান্নাকাটি করল ও। ছেলে না কি ওর পছন্দ হয়নি।

তেইশ তারিখে লালির বিয়ে! তার মানে? আজ কত তারিখ? বাইশ। হ্যাঁ, কালই তো তেইশ তারিখ। ওই ছেলেটা নিশ্চয়ই সমীর। না হলে লালি কান্নাকাটি করবে কেন? ওই বাঁদরটার সঙ্গে লালির বিয়ে—অসম্ভব। না, এ হতে দেওয়া যায় না। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কই, কাল যখন টোটা ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলল, তখন তো লালির বিয়ে সম্পর্কে কিছুই বলল না। টোটা অন্তত আমার কাছে লুকোবে না। তাই কী? হয়তো লুকোতেও পারে। লালির বিয়ে, অথচ তার পিছনে মা নেই, এটা হতে পারে না। মা তো বলেইছিল, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লালির এমন বিয়ে দেবে, যাতে ও সুখী হয়। তাই বোধ হয় মা তাড়াতাড়ি নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরছে। কে বলতে পারে মা-ই টোটাকে বারণ করে দেয়নি? বলেনি, টুম্পাইকে এখন কিছু জানাস না। পরক্ষণেই মনে হল, না, না। মা এমন কাজ করতেই পারে না।

এখনই আমায় কিছু করতে হবে। শোকের বাড়ি আমার [illegible] গেল। দেবলীনাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি ঠিক জানো, বিয়েটা কাল?

—কেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম—না, এমনিই জানতে চাইছি।

—তাই তো লালি বলে গেল। আমার খারাপ লাগছে কেন জানেন? ওর সঙ্গে একটা ছেলের প্রেম ছিল। না কি সেই ছোটবেলা থেকে। প্রায়ই তার কথা আমাকে বলত। সেই ছেলেটা হঠাৎ বিয়ে করে মুম্বই চলে গেছে। লালি সুইসাইড করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু আপনার মায়ের কথা ভেবে না কি করতে পারেনি।

—ছেলেটা কে, তোমায় বলেছে?

দেবলীনা উত্তরটা দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় অর্ক এসে বলল—টুম্পাইদা, বাবা এক বার নিচে আপনাকে ডাকছে। দিগম্বর শাস্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবে। শাস্ত্রীজি এখনই চলে যাবেন।

দেবলীনার উত্তরটা আর শোনা হল না। অর্কের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। সারাটা দিন ধরে যে ধকল যাচ্ছে, আর বোধহয় সহ্য করতে পারব না। এই আমি...মাস কয়েক আগেও ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করতাম। আর এখন মনে হচ্ছে সামান্য ধাক্কায় টলে পড়ে যাব। এখন বুঝতে পারছি, শরীরে শক্তি আসল শক্তি না। মনের জোরটাই আসল। আজ সকাল থেকে মনের জোরটাই আমার হারিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের পার্থক্য নেই। নিচে নেমে ঘরে ঢোকার সময় থমকে দাঁড়ালাম। চেয়ারে বসে আছেন অশীতিপর এক বৃদ্ধা। শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ। বিষ্ণুকাকার সঙ্গে বোধহয় কথা বলছিলেন। পায়ের শব্দে আমার দিকে ঘাড় ঘোরালেন। আর সেই মুহূর্তে আমি সাধুবাবাকে দেখতে পেলাম। আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। সাধুবাবা এখানে? কী করে এলেন? মাথার ভেতরটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল। আমার কি কোনও ভুল হচ্ছে? না, দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাদের তৃতীয় সাক্ষাৎ। ভুল হওয়ার কথা নয়। প্রথম দু'বারের সঙ্গে এ বারের তফাৎ হল, গেরুয়ার বদলে উনি সাদা পোশাকে এসেছেন। উজ্জ্বল দুটি চোখ। আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে। যেন আমার অন্তরাত্মা জরিপ করে নিচ্ছেন। আমি চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

বিষ্টুকাকা বললেন— শাস্ত্রীজি, এই ছেলেটাকেই আজ আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এ আপনার কাছে জ্যেতিষবিদ্যাটা শিখতে চায়।

দিগম্বর শাস্ত্রী এ বার বিষ্টুকাকার দিকে তাকালেন। কোনও কথা না বলে উনি মাথা নাড়াতে লাগলেন। যেন কোনও কিছু চাইছেন না। তার পর মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঘরে অল্প পাওয়ারের হলদেটে আলো জ্বলছে। তারই

মধ্যে দিগম্বর শাস্ত্রীর শরীর ঘিরে আমি অদ্ভুত নীলাভ একটা জ্যোতির্বলয় দেখতে পেলাম। ইনি সেই সাধুবাবা হতে পারেন, বা নাও হতে পারেন। কিন্তু মন বলল, ইনি অবশ্যই অসামান্য শক্তিধর এক পুরুষ।

হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে দিগম্বর শাস্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় ছয় ফুটের ওপর লম্বা। আমার সমান সমান। ধীরে ধীরে আমার দিকে হেঁটে এসে উনি আমার মাথায় হাত রেখে অনুচ্চ গলায় বললেন—বাবা, বাড়ি ফিরে যাও। বাড়িতে তোমাকে খুব দরকার। কথাটা বলেই উনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছন ফিরে আর তাকালেন না বটে, কিন্তু চুম্বকের মতো আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেলেন বাইরের দিকে। ওঁর আগে পিছে ছয় সাতজনের একটা দল। সবাই হাতজোড় করে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। যাতে ওঁর শরীরে স্পর্শ না লাগে। রাস্তায় আগে থেকেই বোধহয় অপেক্ষা করছিল একটা সাইকেল রিকশা। দিগম্বর শাস্ত্রী তাতে উঠে বসলেন। তার পর বিষ্ণুকাকাকে অনুচ্চস্বরে কী যেন বললেন। কেন জানি না, পিছন থেকে আমার মনে হল, আমাকে নিয়ে কিছু বলেছেন। সেটা বুঝতে পেরেই আমি ভিড় ছেড়ে সরে এলাম। উল্টো দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। এই দিগম্বর শাস্ত্রী লোকটা অন্তর্যামী। ভয় হল, বিষপাথরের কথা বোধহয় উনি টের পেয়ে গেছেন। সবাই পারেন না। কিন্তু কেউ কেউ পারেন। জ্যোতিষ বিদ্যার ঊর্ধ্বে উঠে অনেক রহস্য বুঝতে। এই কারণেই বোধহয় আমাকে দেখার পর উনি ঘনঘন মাথা নাড়াচ্ছিলেন।

একটা রিকশা থামিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। শ্মশানঘাট থেকে ফিরে ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিলাম। এখনও সেখানে পড়ে আছে। ক'টা বাজে জানার উপায় নেই। বোধহয় সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। নবদ্বীপে এই সময়টাতেই রাস্তা শুনশান হয়ে যায়। দোকান পাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জেগে আছে শুধু মন্দিরগুলো। সরু আঁকাবাঁকা সব গলি। দশ হাত অন্তর মন্দির। কোথাও হরিনাম চলছে। কোথাও মৃদঙ্গ, করতাল বাজিয়ে গৌরাঙ্গভজন। এই পরিবেশ বাংলার আর কোনও শহরে দেখা যাবে না। রিকশায় যেতে যেতেই মনস্থির করে নিলাম। আপাতত লক্ষ্য গঙ্গার তীর। একটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা বাকি। বিষপাথরটাকে গঙ্গাগর্ভে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। অনেক অনিষ্ট হয়ে গেছে। আর হতে দেওয়া যায় না।

মিনিট পাঁচেক পর রিকশা এসে থামল গঙ্গার ঘাটে। নবদ্বীপের অন্য অঞ্চলের মতো নয়। ঘাটের কাছাকাছি দোকানপাট সব খোলা। আলোয় ঝলমল করছে জায়গাটা। বড় একটা মিষ্টির দোকানে জিলিপি ভাজা হচ্ছে। তার গন্ধ শুঁকে মারাত্মক খিদে পেয়ে গেল। দেবলীনা বলে মেয়েটা তখন কিছু ফল এনে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ওর মুখে লালির বিয়ের কথা শুনে তখন আমার আর কিছু মুখে দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি। মিষ্টির দোকানটার দিকে তাকিয়ে ঠিক করে নিলাম, আগে বিষপাথরটাকে

বিদায় করে আসি। তার পর কিছু খেয়ে নেব।

রিকশায় ওঠার সময় রিকশাওয়ালাকে কিন্তু আমি বলিনি, কোথায় যাব। শুধু উঠে বসেছিলাম। নামার সময় হঠাৎ এই কথাটা মনে হল। লোকটা জানল কী করে আমি গঙ্গার ঘাটে আসতে চেয়েছি? আশ্চর্য! পয়সা দেওয়ার সময় এক বার ভাবলাম, জিজ্ঞেস করি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। ঘাটের দিকে দু'পা এগোতেই পিছন থেকে একটা লোক জিজ্ঞেস করল— স্যার, চাই না কি?

দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম— কী বলুন তো?

—দেশি-বিদেশি, যা চাইবেন পাবেন। দাম একটু বেশি লাগবে।

—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ড্রিঙ্কস।

লোকটার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরচ্ছে। একটু সরে গিয়ে বললাম— না ভাই, আমার দরকার নেই। বলেই ঘাটের দিকে পা বাড়ালাম।

লোকটা কিন্তু পিছু ছাড়ল না। বলল— অপরাধ নেবেন না স্যার। আপনি কি নবদ্বীপে নতুন?

—কেন বলুন তো?

—না, এমনিই জানতে চাইছি। রিকশা করে নামলেন তো, সে জন্য। এই সময়টায় তো গঙ্গার ঘাটে কেউ বেড়াতে আসে না। মাল খাওয়ার জন্যই আসে। নবদ্বীপ শহরের যে জায়গা থেকেই উঠুন না কেন, রিকশাওয়ালারা ঠিক এখানেই নিয়ে আসবে। লোকটার কথা শুনে এ বার বোধগম্য হল, রিকশাওয়ালাও তখন কেন জানতে চায়নি, কোথায় যেতে হবে। সন্ধেবেলায় সব ইয়ং ছেলেদেরই ডেস্টিনেশন গঙ্গার ঘাটের আশপাশ। বিষ্ণুকাকা মাঝে এক দিন আড্ডা মারার সময় বলেছিল বটে, এখানকার ইয়ং ছেলেদের মধ্যে মদ খাওয়ার প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে। সন্ধে হলেই না কি মাতালদের ভিড়ে ভালো ভাবে রাস্তায় হাঁটা যায় না। সামান্য কারণে বচসা বাঁধায়। রোজ রোজ মারপিট। পরে সেটা পলিটিক্যাল কালার নেয়। নবদ্বীপ আর আগের মতো নেই। বিষ্ণুকাকার কথাটা মনে পড়তেই বিরক্তিটা হজম করে ফেললাম। কোনও ঝুটঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। পকেটে এখনও বিষপাথরটা রয়েছে। সেটার কুপ্রভাবে ফালতু ঝামেলায় জড়িয়েও পড়তে পারি। নাছোড়বান্দা লোকটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমি ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৃদু ঠান্ডা বাতাসে মনটা শান্ত হয়ে গেল। ঘাটের কাছাকাছি ছোট কয়েকটা নৌকা বাঁধা রয়েছে। হ্যারিকেনের আলোয় মাঝিরা রান্নাবান্না করছে। উল্টোদিকে, মায়াপুরের ইসকনের মন্দির। অর্ক আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে বলেছিল। কিন্তু যাওয়া হল না। পকেট থেকে বিষপাথরটা বের করে গঙ্গাগর্ভে ছুড়ে দিলাম। যাক্ নিশ্চিন্ত। পতিত

পাবনী গঙ্গা। সব পাপ আর অভিশাপ হজম করে ফেলবে। কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। এই জলধারা ছুঁয়ে গেছে কত জনপদ। এখুনি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ি, সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যেতে পারি আমাদের বড় বাজারের জগন্নাথ ঘাটে। ওখান থেকে আমাদের বাড়ি আর কতটুকই বা। একটু আগে দিগম্বর শাস্ত্রী বললেন— বাড়ি চলে যাও বাবা। বাড়িতে তোমাকে দরকার। বিষ্ণুকাকার বাড়িতে ফেরার আর কোনও প্রয়োজন আছে? এখান থেকেই তো বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়। অর্ককে একটা ফোন করে দিলেই হবে। বিষ্ণুকাকার বাড়িতে আমার সুটকেসটা অবশ্য পড়ে রইল। তার ভেতরে অনেকগুলো টাকা। ওটা পটেলভাইয়ের পাপের টাকা। তার ওপর আমার কোনও লোভ এখন নেই। এখান থেকে রাতের দিকে কোনও ট্রেন আছে কি না জানি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে। না পেলে কোনও প্রাইভেট গাড়ির চেষ্টা করা যেতে পারে। মিষ্টির দোকানটার কাছে ভাড়ার কয়েকটা গাড়ি দেখেছি। কলকাতায় যাওয়ার ভাড়া কত নিতে পারে? পাঁচশো, সাতশো? মওকা বুঝে দু পিঠের ভাড়া চাইলেও চাইতে পারে। পকেট থেকে পার্স বের করে দেখলাম, বেশ কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট আছে। এক বার চেষ্টা করে দেখিই না। ভোরবেলার মধ্যেও যদি কলকাতায় পৌঁছই, তা হলে হয়তো লালির বিয়েটা ভেস্তে দেওয়া যায়। হয়তো কেন? ভেস্তে দিতেই হবে। আমি বেঁচে থাকতে ওর সঙ্গে আর কারও বিয়ে হতে পারে না।

—কী যেন ফেলে দিলেন দাদা? দু'নম্বর কিছু না কি?

প্রশ্নটা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, সেই লোকটা। যে আমার পিছু নিয়েছিল। বিরক্ত হলে চলবে না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। মদ-টদ খেলে মন খুব উদার হয়ে যায় শুনেছি। তাই একটু চিন্তিতস্বরে বললাম— আমার একটা উপকার করবেন ভাই?

—কী চাই বলুন না, বিলিতি?

—না, না। কলকাতায় কীভাবে যাওয়া যায়, বলতে পারেন?

—এখনই যাবেন?

—হ্যাঁ ভাই, এখুনি। বলতে বলতে পার্স থেকে একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিলাম।

ছোঁ মেরে টাকাটা হাতে নিয়ে, পকেটে চালান করার ফাঁকে লোকটা বলল— এ আর কী এমন কঠিন? রাত বারোটায় এই ঘাট থেকে মা সারদা ছাড়বে কলকাতার দিকে। ভোর ভোর পৌঁছে যাবেন।

—মা সারদা মানে?

—আরে আমাদের ঘণ্টাদার বাস। ওতে চলে যান। ভয় নেই স্যার।

সিকিউরিটি থাকে। এখানকার ব্যাপারিরা সব মাল কিনতে যায় হাওড়ার মঙ্গলার হাটে। আপনার লাক ভাল স্যার। আসুন, আপনার সিট আমি বুক করিয়ে দিচ্ছি।

...ভোর পাঁচটায় শেয়ালদার ব্রিজের নিচে বাস থেকে নেমে পড়লাম। এসপ্ল্যানেড অবধি যাওয়ার ধৈর্যও আমার নেই। বাসের একেবারে পিছনের সিটে টিকিট। সারাটা রাস্তা এমন ঝাঁকুনি দিয়েছে, ভালভাবে বসতে পর্যন্ত পারিনি। তার পর ব্যাপারিদের হইচই। মদ্যপান করে আদিরসাত্মক কথাবার্তা। রাত তিনটের সময় বড় জাগুলিয়ায় একটা ধাবায় বাস থেমেছিল। চা খাওয়ার জন্য। তখন এক বার মনে হয়েছিল, আর বাসে উঠবই না। সকাল হলে রানাঘাট থেকে ট্রেনে করে শেয়ালদায় চলে যাব। কিন্তু তখনই বাসের ভেতরে মা সারদাময়ীর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তার পাশে বড় করে লেখা— মনে ভাববি, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন। ওই লেখাটার কথা মনে পড়তেই ফের বাসে উঠে পড়েছিলাম।

অত সকালে কোনও দিন শেয়ালদায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। দেখলাম, দিন আর রাতে কোনও তফাত নেই। দোকানপাট সব খোলা। কলকাতার অনেক আগেই তা হলে শেয়ালদা জেগে ওঠে। আদৌ ঘুমোয় কি? ব্রিজের নিচে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। মহাত্মা গান্ধি রোডের ট্রাম লাইন ধরে সেন্টাল অ্যাভেনিউর ক্রসিঙে পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিলেই, সোজা উত্তরমুখী এগিয়ে, তার পর বিবেকানন্দ রোড ধরে বাড়ি চলে যাওয়া যাবে। ট্যাক্সিতে উঠেই আমি গা এলিয়ে দিলাম। বাড়িতে তো যাচ্ছি, কে কেমন ব্যবহার করবে, কে জানে?

বাসের ঝাঁকুনিতে সারা রাত্তির ঘুম হয়নি। এক বার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। তখন একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। ভোরবেলায় আমি বাড়ির কাছে পৌঁছেছি। দূর থেকে দেখি লোহার গেটের সামনে ভিড়। দেখেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখি, একটা বোম্বাই খাটে করে ডেডবডি বের করে আনা হচ্ছে। সামনের দিকে কাঁধ দিয়েছে বিষ্ণুকাকা আর দাদা। ওদের সামনেই লালি। ওর হাতে একটা বেতের ধামা। আগে আগে গিয়ে ও খই ছড়াচ্ছে। লালির পরনে লাল বেনারসি শাড়ি। মাথায় কনের মুকুট। অদ্ভুত তো। বিয়ের সাজে কেউ শ্মশানযাত্রী হয় না কি? বিষ্ণুকাকাকে দেখে তো চমকে উঠেছিলাম। বিষ্ণুকাকা তো নবদ্বীপে, কলকাতায় এল কী করে? সব থেকে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, দাদা হাসতে হাসতে যাচ্ছে। ডেডবডিটা কার, তা দেখতে পাওয়ার আগেই ঘুম চটকে গেছিল। তার পর থেকে মনটা ভীষণ খিঁচড়ে আছে। ট্রাম লাইন ধরে ট্যাক্সিটা এগিয়ে যাচ্ছে। ভোরের ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে চোখ মুখে। চোখ বুজে এল। বাড়িতে পৌঁছে একচোট ঘুমিয়ে নিলেই শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। কাল রাতে বাসে ওঠার সময় বিষ্ণুকাকার বাড়িতে ফোন করার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু লাইন পাইনি।

বিষ্ণুকাকা কী ভাবল, কে জানে? ফোনটা বোধহয় ঠিক মতো রাখা ছিল না। তা না হলে লাইন না পাওয়ার তো কোনও কারণ নেই। আমিও এমন গাড়ল, মোবাইল ফোনটা পর্যন্ত নবদ্বীপে ফেলে এসেছি। যাক গে, আজ সকালের দিকে যে কোনও সময় অর্ককে ফোন করে দিলেই হবে।

—দাদা কি হাওড়ার দিকে যাবেন?

ট্যাক্সি ড্রাইভার কী জিজ্ঞেস করছে। চোখ খুলে বললাম— কেন বলুন তো?

—কোথায় যাবেন, আপনি কিন্তু এখনও বলেননি।

—ওহ্, বলিনি বুঝি? গণেশ টকিজ।

—ও দিকে কি আজ যাওয়া যাবে? কাল যে মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেছে ওখানে।

—আপনি জানলেন কী করে?

—রাতের দিকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেছিলাম। তখনই দেখি ভিড়ে ভিড়াক্কার। খুব নামকরা একজন খুন হয়েছেন।

নতুন গভর্নমেন্ট আসার পর থেকে ইদানীং আমাদের ও দিকটায় প্রায়ই ঝামেলা হচ্ছে। সে রকমই কিছু হবে বোধহয়। তাই বললাম— পলিটিক্যাল মার্ডার না কি?

—জানি না স্যার। কলকাতায় তো রোজই কিছু না কিছু লেগে রয়েছে। এ রকম একটা করে ঘটনা ঘটবে। আর পেটে লাথ পড়বে আমাদের মতো লোকের। ঘেন্না ধরে গেল মশাই। একটা চাকরি-বাকরি পেলে ট্যাক্সি চালানো ছেড়ে দিতাম।

—কত দূর পড়াশুনো করেছেন?

—এম. কম.। লোকের কাছে বলি না। লজ্জা করে, বুঝলেন। মাঝেমাঝে এমন সব প্যাসেঞ্জার ওঠে, এমন সব ব্যবহার করে, মনে হয়, সব ছেড়েছুড়ে দিই। তার ওপর তো আছে পুলিশের জুলুম।

—ট্যাক্সিটা আপনার নিজের না?

—আপনার মাথা খারাপ স্যার? নিজের ট্যাক্সি হলে তো চালাতামই না। ও ট্যাক্সি মালিকের। দিনের বেলায় তিনি চালান। রাতের বেলায় আমি। স্যার একটা কথা বলব? আপনার কাছে কোনও চাকরি-বাকরির সন্ধান আছে? আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, খুব হাই ফ্যামিলির ছেলে। ইচ্ছে করলে আপনারা পারেন।

শুনে হাসি পেল। আমার নিজেরই কোনও সংস্থান নেই। কাল থেকে কী করব, জানি না। আমি দেব অন্য লোককে চাকরি! কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললাম— না ভাই, আমার সে ক্ষমতা নেই।

গণেশ টকিজের মোড়ে যখন ট্যাক্সিটা দাঁড়াল, তখন প্রায় ছ'টা। আর একটু

পরে এলে ভাল হত। বাবা গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে গেছে। আর [illegible] ছাড়া আমাদের বাড়িতে আর কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। ভালই হল, [illegible]। মাকে দেখে তিনতলায় উঠে গেলেই হবে। ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির দিকে এগোলাম। দিন সাতেক আগে এই সময়টায় কাউকে কিছু না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিলাম। আর সব ঠিক আছে, শুধু বদলে গেছে বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

লোহার গেটটা পেরোতেই বুকটা ধক করে উঠল। ফোয়ারার চার পাশে এত লোক কেন? এত সকালে বউদির বাবা আমাদের বাড়িতে? গিরিজাবাবুই বা কেন? পাথুরেঘাটা, পোস্তা আর দর্জিপাড়ায় আমাদের যেসব জ্ঞাতিরা থাকেন, তাঁরাও এ দিক সে দিক দাঁড়িয়ে। আমি গাড়িবারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই সব মুখগুলো আমার দিকে ঘুরে গেল। আর তখনই সদর দরজার সিঁড়ি থেকে দৌড়ে নেমে এসে লালি বলল— টুম্পাইটা, সেই তো এলে। তবে কেন এত দেরি করলে?

বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে যেন গলার কাছে চলে এল। বুঝেছি, মা। মা বোধহয় আর নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে লালির কাঁধটা চেপে ধরে নিজেকে সামলে নিলাম। তার পর কোনও রকমে জিজ্ঞেস করলাম— মা, মা কেমন আছে লালি? লালির দু'চোখে হঠাৎই জলস্রোত। মুখ-চোখ অসম্ভব ফোলা। বোঝাই যাচ্ছে, খুব কান্নাকাটি করেছে। ওকে দেখেই বুঝে গেলাম, মা আর নেই। সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। ভোরের স্বপ্নটাই তা'লে সত্যি হয়ে গেল। মা বলেছিল, তুই আমার মরা মুখ দেখবি। নবদ্বীপ থেকে অত কষ্ট করে আসা যে আমার বৃথা হয়ে গেল। এই বার বুঝলাম, দিগম্বর শাস্ত্রী আমায় কেন বলেছিলেন, বাড়ি চলে যাও বাবা। তোমায় খুব দরকার। লালি আমার হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। আমাকে বলল— ভেতরে এসো টুম্পাইদা। আগে এক বার ভেতরে এসো। কাল রাত থেকে মা শুধু তোমার কথাই বলছে।

আমার কথা বলছে! তার মানে? তা হলে মায়ের কিছু হয়নি? কথাটা মাথায় ঢোকা মাত্র উঠে দাঁড়ালাম। মুখ দিয়ে একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন বেরল— মা কোথায় লালি? বাড়িতে এত লোক কেন গো? কী হয়েছে?

সে সব পরে শুনো। আগে মায়ের কাছে চলো। কাল রাতে সেই যে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকেছে, আর বেরয়নি।

দোতলায় মায়ের নিজস্ব ঠাকুর ঘর লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। ঠাকুরঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এ কী চেহারা হয়েছে মায়ের! চেনাই যাচ্ছে না। সোনার মতো অমন গায়ের রং, কালি পড়ে গেছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে মা এত বদলে গেল কী করে? ঘরের মধ্যে আরও পাঁচ-ছ'জন মহিলা। আমাদেরই জ্ঞাতি। তাঁদের সঙ্গে কী কথা বলছিল মা আমার দিকে

চোখ পড়তেই বলল— এই তো, খোকা এসে গেছে। তোদের বললাম না, টুম্পাই আসবেই। রাধেশ্যাম জিউকে অত করে ডাকছি। সাড়া না দিয়ে পারে?

তার পর আমার দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল— আয় বাবা, আমার কাছে এসে বোস। তোর চেহারাটা এত দরকচা মেরে গেল কী করে রে?

আগের মতো এত স্নেহপ্রবণ হয়ে মা কথাগুলো বলল, আমি আর পারলাম না। হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম। ইচ্ছে হল, দরজার পাল্লায় মাথা ঠুকে নিজেকে কষ্ট দিই। কথাটা মনে হতেই সত্যি সত্যিই দরজায় মাথা ঠুকতে লাগলাম। আসলে এখন আমি আর নিজের বশে নেই। গত সাত দিনে আমি কি নিজেই কম বদলেছি? আগের আমি আর এখনকার আমি-র মধ্যে অনেক তফাত।

লালি পিছন থেকে আমাকে টানছে— কী হচ্ছে কী টুম্পাইদা। কী ছেলেমানুষি করছ? প্লিজ, মায়ের কাছে গিয়ে একটু বোসো। কিন্তু ও পারবে কেন? দরজায় মাথা ঠুকতেই লাগলাম। একটা সময় বোধশক্তি হারিয়ে গেল। তখন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে লালি মায়ের সামনে বসিয়ে দিতেই মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম— আমি আর পারছি না মা। আমায় তুমি মাফ করো। আমি আর কোনও দিন তোমাদের অবাধ্য হব না।

মা বলল— ছাড় হতভাগা। সারাজীবন যার অবাধ্য হয়েছিস, সেই মানুষটাই তো চলে গেল। তোর হয়ে আমি আর কার সঙ্গে ঝগড়া করব রে খোকা?

কথাগুলো বলতে বলতেই দাঁতে দাঁত লেগে গেল মা'র। কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ল।

...কাল রাতে নবদ্বীপে রাস্তায় ছিলাম বলে টিভি দেখার সুযোগ হয়নি। রাত দশটার নিউজে না কি বাবার মৃত্যুর খবরটা বলেছিল। দোকান বন্ধ করে বাবা যখন বাড়ির দিকে আসছিল, তখন পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে কে যেন গুলি করে। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার পরই বাবা মারা যায়। আজ সকালে ট্যাক্সি ড্রাইভারটা আমাকে বাবার মৃত্যু সংবাদই দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি। আজ শ্মশানঘাটে সি পি নিজে এসেছিলেন। আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, পুলিশের ধারণা এটা ইয়াকুবের দলের লোকেদের কাজ। সেই ইয়াকুব, যার লোকেদের আমি পিটিয়েছিলাম। আমাকে না পেয়ে বদলা নিল বাবার ওপর। সি পি যা-ই বলুন, আমার ধারণা কিন্তু অন্য। এই মার্ডারের পিছনে আমি পটেলভাইয়ের হাত দেখতে পাচ্ছি। সি পি অবশ্য বললেন, পটেলভাই এখন দিল্লির তিহার জেলে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে না কি বেরবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

দাদাটা কেমন যেন হয়ে গেছে। এমনিতেই নরম প্রকৃতির লোক। বাবার মুখে আগুন দেওয়ার সময় খুব কাঁদছিল। আমাকে এক বার বললও— আমি পারব না

ভাই। এই কাজটা তুই কর। কিন্তু দাদা বর্তমান থাকতে আমি ওই কাজটা করি কী করে? শ্মশান থেকে ফিরে আসার পর সব ব্যাপারেই দাদা আমায় দেখিয়ে দিচ্ছে। বাবার শ্রাদ্ধটা যাতে ভাল করে হয়, তার দায়িত্বটা পুরো আমার। এই দায়িত্বটা মা আমাকে দিয়ে বলেছে— দেখিস, যেন তোর বাবা স্বর্গে গিয়ে শান্তি পায়।

বাবার মৃত্যুতে মা যতটা ভেঙে পড়বে ভেবেছিলাম, ততটা ভেঙে পড়েনি। আজ কথায় কথায় এক বার মা আমায় বললও, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য না কি বহু বছর আগে দাদুকে বলে গেছিলেন, মায়ের বৈধব্যযোগ আছে। মা সেই মতো মনকে প্রস্তুত করেই রেখেছিল। আমি ঠিক করেছি, শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরব। গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেব। তার পর ঘুরে আসব হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা বৃন্দাবন আর মথুরায়। বৃন্দাবনে আমাদের নিজেদেরই বাড়ি আছে। মাসখানেক ওখানে কাটিয়ে আসব। মা বলেছে, লালিকেও সঙ্গে নেবে। ওর বি. এ. পরীক্ষা তত দিনে শেষ হয়ে যাবে।

রাতে ফল টল খেয়ে ঘরে বসে টিভি দেখছি, এমন সময় লালি উঠে এল। ওর পরনে হালকা হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি। বোধহয় খানিক আগেই চান-টান করেছে। খুব পবিত্র লাগছে ওকে দেখে। আড় চোখে ওর দিকে এক বার তাকিয়েই টিভির পর্দায় মন দিলাম। কিছু একটা বলবে বলেই লালি উঠে এসেছে। না হলে আসত না। আমার আন্দাজই ঠিক। এক বার বারান্দায় ঘুরে এসে লালি বলল— একা একা বড়লোক হওয়ার শখ মিটেছে, না এখনও আছে?

আমি পাল্টা বললাম— সমীর বড়ালকে বিয়ে করার ইচ্ছেটা আছে, না চলে গেছে?

—মোটেই সমীর বড়ালকে আমি বিয়ে করতে চাইনি।

—তার মানে? দেবলীনা আমাকে মিথ্যে বলেছে? আজই তো তোমার বিয়ে ঠিক ছিল।

—দেবলীনার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হল?

—যেখানেই হোক না কেন? কথাটা মিথ্যে কি না বলো।

হি হি করে হাসতে শুরু করল লালি। তার পর নিজেকে সামলে বলল— তাই বুঝি সাত তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ থেকে চলে এলে? দেবলীনারা বিষ্ণুমামার বাড়িতে যাবে শুনেই আমার মাথায় প্ল্যানটা খেলে গেছিল। এ ছাড়া তো তোমাকে ফিরিয়ে আনার কোনও উপায় ছিল না। আমি মাকে বলেইছিলাম, দেখো মা, তোমার ছেলে কেমন সুড়সুড় করে চলে আসবে। একটু আগে তোমার বউদির সামনে মা কী বলল, জানো?

—কী বলল?

—পাগলটাকে আঁচলের তলায় বেঁধে রাখ তো মা। অশৌচটা কাটলেই তোদের চার হাত এক করে দেব।

কথাগুলো বলে ফের হি হি করে হাসতে লাগল লালি। এত সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে যে, আমি তাকিয়েই রইলাম। আমরা সবাই বদলে গেলাম, লালিটা কিন্তু বদলাল না।